কিশোর রহস্য উপন্যাস

হেমেন্দ্রকুমার রায়

কিশোর রহস্য উপন্যাস

হেমেন্দ্রকুমার রায়

কিশোর রহস্য উপন্যাস

কিশোর রহস্য উপন্যাস

হেমেন্দ্রকুমার রায়

শিশু সাহিত্য সংসদ

Kishore Rahasya Upanyas
(Five Detective Novels)
by Hemendrakumar Roy

ISBN : 978-81-3955-282-7

© লেখক
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : অলয় ঘোষাল
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১৭

প্রকাশক : দেবজ্যোতি দত্ত, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা. লি.
৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯
মুদ্রক : এ. পি. প্রিন্টার্স, ৮/১, গুরুদাস দত্ত গার্ডেন লেন, কলকাতা-৭০০ ০৬৭

সূচি

ফিরোজা মুকুট রহস্য

ছত্রপতির ছোরা

পদ্মরাগ বুদ্ধ

কে ?

হত্যা-হাহাকারে

ফিরোজা মুকুট রহস্য

প্রথম পরিচ্ছেদ

ছন্নছাড়া পথিক

জানলার কাছে দাঁড়িয়েছিলুম। রাস্তার দিকে মুখ বাড়িয়ে বললুম, 'জয়ন্ত, পথ দিয়ে একটা পাগল যাচ্ছে। ওর আত্মীয়স্বজন কীরকম লোক জানি না, এমন মানুষকেও একলা পথে বেরোতে দেয়!'

জয়ন্ত উঠে এসে পিছন থেকে আমার কাঁধের উপরে মুখ বাড়িয়ে দেখলে।

বর্ষাকাল। উপরি উপরি কয়েক দিন ধরে প্রবল ধারাপাতের পর কাল থেকে বৃষ্টি থেমেছে বটে, কিন্তু আকাশ এখনও মেঘের চাদর মুড়ি দিয়ে আছে। হু-হু করে বইছে কনকনে হাওয়া। রাজপথের উপরে পুরু কর্দমের প্রলেপ। দিনের বেলাতেই সাঁঝের ছায়ার ইঙ্গিত। যেকোনো মুহূর্তে আবার বৃষ্টির পালা শুরু হয়ে যেতে পারে, এই ভয়ে রাজপথ জনশূন্য। দেখা যাচ্ছে কেবল পাগলের মতো দেখতে একটিমাত্র মানুষকে।

লোকটির বয়স হবে বোধ হয় বছর পঞ্চাশ। হোমরাচোমরা লম্বা-চওড়া চেহারা, সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, মনে জাগায় সম্ভ্রম। সাজপোশাকও জমকালো। কিন্তু লোকটির চেহারার সঙ্গে তার চালচলন মোটেই খাপ খাচ্ছিল না। সে বেগে ছুটতে ছুটতে মাঝে মাঝে লাফিয়ে উঠছে। থেকে থেকে দুই হাত ছুড়ছে এবং বিকৃত মুখভঙ্গি করছে।

আমি বললুম, 'ব্যাপার কী বল দেখি? ও ঘন ঘন মুখ তুলে বাড়িগুলোর নম্বর দেখছে কেন?'

জয়ন্ত বললে, 'আমার বিশ্বাস ও আমাদেরই বাড়ি খুঁজছে।'

-'হ্যাঁ। বোধ হয় ও কোনো বিপদে পড়েছে, আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে আসছে। ওই দেখো, যা ভেবেছি তাই!'

মূর্তিটা আমাদের বাড়ির সামনে এসেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে খুব জোরে জোরে কড়ানাড়া দিতে লাগল।

আমাদের বেয়ারা মধু যখন তাকে উপরে নিয়ে এল, তখনও সে হাঁপাতে হাঁপাতে বিকৃত মুখভঙ্গি করতে লাগল বটে, কিন্তু তার স্তম্ভিত চোখ দু-টির ভিতরে এমন মর্মস্পর্শী যাতনা ও নিরাশার ভাব দেখলুম যে, আমরা আর হাসতে পারলুম না, মন ভরে উঠল সকরুণ সমবেদনায়।

খানিকক্ষণ সে কোনো কথাই কইতে পারলে না, পাগলের মতো দুই হাতে মাথার চুল ধরে টানাটানি করতে লাগল, তারপর হঠাৎ দেওয়ালের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে এত জোরে মাথা ঠুকলে যে, আমরা দু-জনেই তাড়াতাড়ি তাকে ধরে ঘরের মাঝখানে টেনে আনলুম।

জয়ন্ত তাকে একখানা ইজিচেয়ারের উপরে বসিয়ে, নিজেও তার পাশে আসন গ্রহণ করলে। তারপর শান্ত, মিষ্ট স্বরে বললে, 'আপনি আমাদের কাছে নিজের বিপদের কথা বলতে এসেছেন, তাই নয় কি? বেশ, আগে একটু বিশ্রাম করুন, তারপর আমরা আপনার কথা শুনব।'

লোকটি প্রথমে জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলতে লাগল। তারপর নিজেকে কতকটা সামলে নিয়ে রুমাল বার করে কপাল মুছতে মুছতে বললে, 'আপনারা নিশ্চয়ই আমাকে পাগল বলে মনে করেছেন?'

জয়ন্ত বললে, 'বিপদে পড়লে মানুষের মাথার ঠিক থাকে না। আপনার বিপদটা কী, শুনতে পাই না?'

-'ভগবান জানেন আমার বিপদ কী ভয়ানক! বিনা মেঘে এমন বজ্রপাত কল্পনাতেও আনা যায় না। আমার মানসম্ভ্রম সব যেতে বসেছে, তার উপরে সংসারেও দারুণ দুর্ঘটনা উপস্থিত। ঘরে-বাইরে আচমকা দুর্ভাগ্যের আক্রমণে আমি যে সত্য সত্যই পাগল হয়ে যাইনি, এইটেই হচ্ছে আশ্চর্য! কেবল আমি নই মশাই, আমার দুর্ভাগ্যের অংশ গ্রহণ করতে হবে আর একজন দেশবিখ্যাত ব্যক্তিকেও।'

জয়ন্ত বললে, 'আপনার মনের কথা ধীরে-সুস্থে খুলে বলুন। দেখি, আমরা আপনার কোনো উপায় করতে পারি কি না!'

-'আমার নাম মহিমচন্দ্র রায়চৌধুরী। মহাজনি ব্যবসায়ে আমার কিছু নাম আছে।'

এ নাম দেশের কে না জানে? বিখ্যাত তাঁর ব্যাঙ্ক-দেশ-বিদেশে তার শাখা। তার চেয়ে বড়ো প্রাইভেট ব্যাঙ্ক এদেশে আর নেই। মহিমবাবুর মতো ধনকুবের এমন কী বিপদে পড়েছেন, যার জন্যে তাঁকে উদভ্রান্ত অবস্থায় আমাদের কাছে ছুটে আসতে হয়েছে? আমাদের মন ভরে উঠল বিস্ময়ে এবং কৌতূহলে।

এতক্ষণ পরে যথাসম্ভব প্রকৃতিস্থ হয়ে মহিমবাবু বললেন, 'মশাই, আমার মামলা এখন পুলিশের হাতে গিয়েছে। পুলিশ কী করবে না করবে জানি না, কিন্তু আপনার উপরে বিশ্বাস আমার অটল। পথের মাঝখানে আমার মোটরও আবার কল বিগড়ে বাদ সাধলে। তাই আমি পথ দিয়ে ছুটতে ছুটতে আপনার কাছে এসেছি। এইবার শুনুন আমার বিপদের কথা।'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মহিমবাবুর কাহিনি

'আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, ব্যাঙ্ক কেবল টাকা জমা রাখে না, লেনদেনের কারবারও চালায়। অনেক বড়ো বড়ো পরিবার আমাদের কাছে গহনা, মূল্যবান জিনিসপত্র বা জমি বন্ধক রাখেন, বিনিময়ে আমারাও টাকা ধার দিই।

'কাল সকালে এমন এক ব্যক্তি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন, যাঁকে দেখে আমি অভাবিত বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। কেবল বাংলাদেশের নয়, গোটা ভারতবর্ষের লোক তাঁর নাম জানে। এমনকী ইউরোপ-আমেরিকাতেও তাঁর নাম অপরিচিত নয়। তাঁর অন্য কোনো পরিচয় আমি দিতে পারব না, কেবল এইটুকু জেনে রাখুন, তিনি একজন মহামান্য মহারাজা।

'আমার বাড়িতে তাঁর পদার্পণে আমি সম্মানিত হয়েছি-তাঁকে এইরকম কোনো অভিনন্দন দিতে উদ্যত হলুম, কিন্তু তার আগেই তিনি একেবারে কাজের কথা পেড়ে বসলেন। বললেন, মহিমবাবু, শুনেছি আপনারা টাকা ধার দেন?

'বললুম, আজ্ঞে হ্যাঁ, যদি ভালো সিকিউরিটি থাকে।

-'আজকেই আমার ত্রিশ লক্ষ টাকার নিতান্ত দরকার। আমার কাছে অবশ্য এই টাকার পরিমাণ তুচ্ছ, আমি অনায়াসেই বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে এই টাকাটা সংগ্রহ করতে পারি, কিন্তু আমি কারুর কাছে বাধ্যবাধকতা স্বীকার করতে প্রস্তুত নই।

-'কতদিনের জন্যে আপনি টাকা চান?

-'এক হপ্তার জন্যে। এক সপ্তাহ পরে সমস্ত টাকা নিশ্চয়ই আমি সুদে-আসলে ফিরিয়ে দেব।

-'কিন্তু আমি মহাজন। কীসের বিনিময়ে আমি ত্রিশ লক্ষ টাকা দেব, সেটাও আমার জানা দরকার।

-'নিশ্চয়ই, সেজন্যে আমি প্রস্তুত হয়ে এসেছি।

'মহারাজা সঙ্গে করে এনেছিলেন একটি চৌকো মরক্কো কেস। তিনি তার ডালা খুলে আমাকে দেখালেন।

'ভিতরে নরম মখমলের বিছানায় বসানো আছে এক অপূর্ব ও বিচিত্র রত্নমুকুট। নিরেট সোনা দিয়ে তৈরি এবং তার উপরে আছে মস্ত মস্ত ফিকে নীল চল্লিশখানা ফিরোজা। তার সোনার কাজও অসাধারণ। এই রত্নমুকুটের কথা আমিও শুনেছি, মহারাজের নামের মতো তার খ্যাতিও ফেরে লোকের মুখে মুখে।

'মহারাজা বললেন, আমি যে টাকা চাই, তার চেয়ে মুকুটের দাম দুই গুণ বেশি। এইটেই আমি আপনার কাছে বন্ধক রাখতে চাই।

'মুকুট হাতে করে আমি বসে রইলুম কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মতো।

'মহারাজা শুধোলেন, এর মূল্য সম্বন্ধে আপনার কোনো সন্দেহ আছে?

-'বিন্দুমাত্র না। আমি ভাবছি-

-'এমন অমূল্য জিনিস কেন আমি এখানে রেখে যেতে চাই? হ্যাঁ, আমিও রেখে যেতুম না, যদি এক সপ্তাহ পরে এটা ফিরিয়ে নিয়ে যাবার শক্তি আমার না থাকত। এখন আপনার মত কী?

-'আমি রাজি।

-'কিন্তু দেখবেন, একথা নিয়ে যেন বাজারে আলোচনা না হয়। খুব সাবধানে মুকুটটিকে রাখবেন। এটি আমার পৈতৃক সম্পত্তি। এই দুর্লভ জিনিস হারালে আমার রাজ্যে টিটিকার পড়ে যাবে। এতে যে ফিরোজাগুলি আছে, তার মতো আর একখানি পাথর সারা পৃথিবী খুঁজলেও পাওয়া যাবে না।

'সেইদিনই মহারাজার টাকার ব্যবস্থা করে দিলুম। কিন্তু তারপরে পড়ে গেলুম দারুণ দুশ্চিন্তায়। বার বার মনে হতে লাগল, এত বড়ো ঝক্কি ঘাড়ে নিয়ে বড়ো ভালো কাজ করা হল না। এ লেনদেনের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক না রাখাই উচিত ছিল। ফিরোজা রত্নমুকুট যদি হারায়, তাহলে কেবল আমার সমস্ত সুনাম নষ্ট হবে না, সেই সঙ্গে হবে আমার সর্বনাশও।

'মুকুটটিকে আমার আপিসে রাখাও যুক্তিযুক্ত মনে করলুম না। ব্যাঙ্কে তো আজকাল আকচার চুরি-ডাকাতি হচ্ছে, কেউ যদি সন্ধান পায়, আমার উপরেও শনির দৃষ্টি পড়তে কতক্ষণ? মুকুট সঙ্গে নিয়ে আমি ভয়ে ভয়ে আমার বালিগঞ্জের বাড়িতে ফিরে এলাম এবং যতক্ষণ না আমার উপরের ঘরের আলমারির ভিতরে সেটি রেখে দিলুম, ততক্ষণ নিশ্চিন্ত হতে পারলুম না।

'জয়ন্তবাবু, এইবারে আগে আমার সংসারের কথা কিছু শুনুন।

'আমার চারকবাকররা শোয় বাড়ির বাইরে। ভিতরে থাকে তিন জন দাসী, তারা পুরোনো লোক, সকল সন্দেহের অতীত। আর একটি নূতন দাসী এসেছে, নাম তার ননিবালা, বয়স অল্প। আজ মাসকয় কাজ করছে। কিন্তু তারও আচরণ ভালো।

'আমার নিজের পরিবার বড়ো নয়। আমি বিপত্নীক। আমার একটিমাত্র ছেলে, নাম সুবিমল। বয়সে যুবক। তার জন্যেই আমার যত দুর্ভাবনা। সে হচ্ছে বিলাসী, চঞ্চলমতি, আমোদপ্রিয়, অমিতব্যয়ী। সে আমার কারবারের উপযোগী নয়, তার হাতে বেশি টাকা দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি না। তার স্বভাবের জন্যে লোকে দায়ী করে আমাকেই। বলে, আমিই আদর দিয়ে দিয়ে তার মাথা খেয়েছি। হয়তো কথাটা নিতান্ত মিথ্যা নয়। একে সে আমার একমাত্র সন্তান, তার উপরে অল্পবয়সেই মাতৃহারা। তার মুখ ম্রিয়মাণ দেখলে আমার বুক ফেটে যায়।

'সুবিমলের বন্ধুরা সব সম্ভ্রান্ত পরিবারের নিষ্কর্মা ছেলে। সেও তাদের মতো আমোদপ্রমোদ করতে আর দু-হাতে টাকা ওড়াতে চায়। তাদের এক ক্লাব আছে, সেখানে তাসের জুয়া চলে। ক্লাবে আর ঘোড়দৌড়ের মাঠে

সুবিমল যে কত টাকা নষ্ট করেছে তার কোনো হিসাব নেই। আমি তাকে মোটা মাসোহারা দিই, তাতেও তার খরচ কুলোয় না। প্রতি মাসেই আমার কাছ থেকে সে অতিরিক্ত টাকা আদায় করে।

'মাঝে মাঝে তার সুবুদ্ধি হয়, ওইসব বিপদজনক বন্ধুর সম্পর্ক ছাড়বার চেষ্টা করে। কিন্তু সে চেষ্টা তার সফল হয় না আর একজনের জন্যে। নাম তার কুমার মহেন্দ্র নারায়ণ, আমরা কুমার বাহাদুর বলে ডাকি। সে রাজবংশের ছেলে, সুবিমলের চেয়ে বয়সে বড়ো। অনেক দেশে বেড়িয়েছে, অনেকরকম লোকের সঙ্গে মিশেছে, কথা কয় চমৎকার, দেখতেও পরমসুন্দর। সুবিমলের উপরে তার প্রবল প্রভাব, তার কথায় সে ওঠে-বসে। কিন্তু তার মতামত স্বাস্থ্যকর নয়, তার ভাবভঙ্গিও আমার ভালো লাগে না। সে আমার বাড়িতে যখন-তখন আসে। আমাদের অমলাও তাকে পছন্দ করে না। অমলার বয়স বেশি না হলেও লোকের চরিত্র বোঝে।

'এইবারে অমলার পরিচয়ও দিই। সে আমার এক পরলোকগত বাল্যবন্ধুর মেয়ে, আমাদেরই স্বজাতি। তার বয়স যখন আট-নয় বৎসর, সেই সময়ে তার পিতা তাকে একান্ত অসহায় অবস্থায় রেখে হঠাৎ মারা পড়েন। আমাকেই অমলার ভার গ্রহণ করতে হয়। সেই থেকেই এ বাড়িতে সে আমার নিজের মেয়ের মতো লালিতপালিত হয়েছে। আমার এই অন্ধকার বাড়িকে সে আলো করে আছে সোনালি রোদের মতো। একটি শান্ত, নম্র, স্নেহময়ী তরুণী, সে না থাকলে অচল হয়ে পড়ে আমার জীবন।

'অমলা আমার সব কথা রাখে, কেবল একটি ছাড়া। সুবিমল দুই-দুই বার তাকে বিবাহ করতে চেয়েছিল, তাকে সে সত্যসত্যই ভালোবাসে। কিন্তু অমলা রাজি হয়নি। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, একমাত্র সেই-ই সুবিমলকে বিপথ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারে, একমাত্র অমলাই পারে তার জীবনকে নূতনভাবে গড়ে তুলতে। কিন্তু এখন আমার সকল আশা বিফল হয়েছে-আর তা হবার নয়, হবার নয়।'

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মহিমবাবুর কাহিনির জের

'রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর সুবিমল ও অমলার সঙ্গে গল্প করছিলুম। তাদের ফিরোজা মুকুটের কথা বললুম। পানের ডিবে দিয়ে যাবার জন্যে সেই সময়ে ননিবালা একবার ঘরের ভিতরে এসেছিল।

'সুবিমল ও অমলা দুই জনেই মুকুটটা দেখবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করলে। কিন্তু আমি রাজি হলুম না।

'সুবিমল সুধোলে, মুকুটটা তুমি কোথায় রেখেছ?

-'আমার শোবার ঘরের আলমারিতে।

-'ভগবান করুন আজ রাত্রে বাড়িতে যেন চোর না আসে।

-'আলমারি চাবি বন্ধ।

-'যেকোনো পুরোনো চাবি দিয়ে ও আলমারি খোলা যায়। ছেলেবেলায় আমি নিজেই খুলেছি।

-'কিন্তু ঘরের ভিতরে থাকব আমি।

-'হ্যাঁ, ঘুমিয়ে।

'শয়ন করবার জন্যে উপরে উঠলুম। সঙ্গে সঙ্গে এল সুবিমল। মুখ তার গম্ভীর। আমার শোবার ঘরে ঢুকে বললে, বাবা, আমাকে দু-হাজার টাকা দিতে পারবে?

'আমি বললুম, অসম্ভব! তোমাকে যথেষ্ট টাকা দেওয়া হয়েছে।

-'জানি বাবা, এজন্যে আমার কোনো অভিযোগ নেই। কিন্তু দু-হাজার টাকা আদায় আমার নিতান্তই দরকার। টাকা না পেলে ক্লাবে আমি আর মুখ দেখাতে পারব না।

-'তোমার পক্ষে সেটা হবে শাপে বর।

-'কিন্তু সবাই বলবে আমি জুয়াচোর। সে অপমান আমি সইতে পারব না। যেমন করে পারি এ ঋণ আমাকে শোধ করতেই হবে।

'আমি ক্রুদ্ধ স্বরে বললুম, এই মাসেই আরও দুই বার তুমি আমার কাছ থেকে উপরি টাকা আদায় করেছ। আমার কাছ থেকে আর একটা কানাকড়িরও প্রত্যাশা কোরো না।

'সে আর কিছু বললে না, মাথা হেঁট করে বাইরে বেরিয়ে গেল।

'সে রাত্রে আমি অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করলুম। নীচেকার সব দরজা ভালো করে বন্ধ আছে কি না দেখবার জন্যে আবার একতলায় নামলুম। সিঁড়ি দিয়ে নেমে বৈঠকখানায় ঢুকতে দেখি, অমলা ওদিককার একটা দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে।

'সে বললে, কাকাবাবু, আপনি কি আজ রাত্রে ননিবালাকে বাইরে যাবার ছুটি দিয়েছিলেন?

'বললুম, না।

-'এইমাত্র সে বাইরে থেকে ফিরে এল। এ সব ভালো কথা নয়।

-'বেশ, কাল সকালে আমি নিজেই তাকে সাবধান করে দেব। বাড়ির দরজা বন্ধ আছে তো?

-'হ্যাঁ কাকাবাবু।

'আমার ঘুম খুব গাঢ় হয় না। বিশেষত কাল রাত্রে আমার মনটা উদ্বিগ্ন ছিল বলে ভালো করে ঘুম হয়নি। গভীর রাত্রে হঠাৎ কী একটা শব্দে আমি জেগে উঠলুম। কান পেতে শুনতে লাগলুম। মনে হল, বাড়ির কোথায় কে যেন একটা দরজা বন্ধ করে দিলে। তারপর সভয়ে শুনলুম, পাশের ঘরে কে যেন সন্তর্পণে পা ফেলে চলে বেড়াচ্ছে। এইখানে বলে রাখা উচিত, ঘুমোবার আগে শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করার অভ্যাস আমার ছিল না।

'তখনি খাট থেকে নেমে পড়লুম। দরজার পাল্লা একটু ফাঁক করে দেখলুম, পাশের ঘরে আলো জ্বলছে এবং সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে সুবিমল, তার গায়ে গেঞ্জি, পায়ে জুতো নেই, আর হাতে রয়েছে সেই ফিরোজা মুকুট। সে মুকুটটা সজোরে মুচড়ে বা নুইয়ে ফেলবার চেষ্টা করছিল।

'একলাফে পাশের ঘরে গিয়ে রাগে কাঁপতে কাঁপতে আমি চেঁচিয়ে উঠলুম, সুবিমল! চোর, দুরাত্মা!

'আমার চিৎকার শুনে সে চমকে উঠল, তার হাত থেকে খসে মুকুটটা মাটির উপরে পড়ে গেল সশব্দে। তাড়াতাড়ি আমি সেটাকে তুলে নিয়ে দেখলুম, তিন খণ্ড ফিরোজা অদৃশ্য। -তার একটা প্রান্ত ভাঙা।

'বিবর্ণ মুখে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সুবিমল। আমি ক্রুদ্ধ স্বরে বললুম, বদমাইস, তুই এটা ভেঙে ফেলেছিস! আমার মানসম্ভ্রম ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছিস! কোথায় গেল আর তিনখানা পাথর?

'সে বললে, চুরি গেছে।

'তাকে ধাক্কা মেরে বললুম, চুরি করেছিস তুই!

-'না।

-'তুই কেবল চোর নোস, মিথ্যেবাদীও! আমি স্বচক্ষে দেখলুম আরও পাথর চুরি করবার জন্যে তুই মুকুটটা নিয়ে ধস্তাধস্তি করছিস!

'সে বললে, বাবা তুমি আমাকে যথেষ্ট গালাগাল দিয়েছ। এরপরে এ বিষয় নিয়ে আমি আর কোনো কথাই বলব না। কাল সকালেই আমি তোমার বাড়ি ছেড়ে চলে যাব, নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করব।

-'হ্যাঁ, কাল সকালে তোকে এ বাড়ি থেকে যেতে হবে বটে, কিন্তু যেতে হবে পুলিশের সঙ্গে।

'এইবারে ক্রোধারক্ত মুখে সে বললে, উত্তম। তবে তাই হোক।

'ইতিমধ্যে আমার চিৎকার শুনে গোটা বাড়ি জেগে উঠেছে। সর্বপ্রথমে সেখানে ছুটে এল অমলা। সুবিমলের মুখ ও আমার হাতের মুকুট দেখে তার আর কিছুই বুঝতে বাকি রইল না, একটা আর্তনাদ করে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

'সকালে পুলিশ এল। সুবিমল বললে, বাবা তাহলে তুমি আমাকেই চোর সাব্যস্ত করলে?

-'তা ছাড়া আর উপায় নেই। আমি নিজের চোখকে অবিশ্বাস করতে পারি না।

-'তাহলে অন্তত পাঁচ মিনিটের জন্যে আমাকে একবার বাড়ির বাইরে যেতে দাও।

-'বুঝেছি, তুমি সরে পড়তে চাও? তা হয় না। কেবল এক শর্তে তোমাকে আমি ক্ষমা করতে পারি। পাথর তিনখানা যদি ফিরিয়ে দাও।

'সে বলতে বলতে চলে গেল, তোমার ক্ষমা যে চায়, তাকে তুমি ক্ষমা কোরো। আমি ক্ষমাপ্রার্থী নই।

'সুবিমলকে আমি পুলিশের হাতে সমর্পণ করেছি। পুলিশ কিন্তু তার কাপড়চোপড় খুঁজেও এবং সারা বাড়ি খানাতল্লাস করেও পাথর তিনখানা উদ্ধার করতে পারেনি। সুবিমলও স্বীকার করেনি কোনো কথা, একেবারেই যেন বোবা হয়ে গিয়েছে।

'এই আমার দুর্ভাগ্যের কাহিনি। ভগবান, আমি এখন কী করব? এক রাত্রেই আমি আমার সম্মান, আমার বন্ধকি রত্ন, আমার সন্তানকে হারালুম। আমি এখন কী করব?'

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অমলা দেবী

জয়ন্ত খানিকক্ষণ বসে রইল স্তব্ধভাবে। তারপর শুধোলে, 'মহিমবাবু, আপনার বাড়িতে কি বেশি লোকের আনাগোনা আছে?'

-'মাঝে মাঝে দু-একজন আত্মীয়কুটুম্ব খবরাখবর নিতে আসেন। বাইরের লোকের মধ্যে নিয়মিত আনাগোনা করেন কুমার বাহাদুর।'

-'আপনি কি সামাজিকতা রক্ষার জন্যে নানা জায়গায় আসা-যাওয়া করেন?'

-'সুবিমল করে। আমি আর অমলা বাড়িতেই থাকি। সামাজিকতার জন্যে আমাদের মাথাব্যথা নেই।'

-'এরকম তরুণীর কথা কম শোনা যায়। আপনার কথা শুনে বোঝা যায়, মুকুটের ব্যাপারের জন্যে অমলা দেবী অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছেন।'

-'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার চেয়েও।'

-'সুবিমলবাবু যে অপরাধী সে বিষয়ে আপনাদের কোনো সন্দেহ নেই?'

-'কী করে থাকবে? আমি যে নিজের চোখে দেখেছি!'

-'যে শব্দ শুনে আপনার ঘুম ভেঙে যায়, সে সম্বন্ধে পুলিশের মত কী?'

-'তাদের মতে সুবিমল ঘর থেকে বেরিয়ে দুম করে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল।'

-'বাজে কথা। চোর কখনো পাড়া জাগিয়ে চুরি করে না। শব্দ হয়েছে অন্য কারণে। এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।'

-'কারণটা কী?'

-'আমি তা জানি না। মহিমবাবু, মামলাটা আপনি সহজ মনে করছেন, কিন্তু আমার মতে এটা হচ্ছে জটিল মামলা। আপনি অনুমান করেছেন, আপনার ছেলে নিজের ঘরের দরজা সশব্দে ভেজিয়ে আপনার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছেন। তাহলে তিনি মুকুটটা কখন চুরি করলেন? আর এই অল্প সময়ের মধ্যে পাথর তিনখানা লুকিয়েই বা রাখলেন কোথায়? না মহিমবাবু, এই ঘটনার মধ্যে আছে অজানা কোনো রহস্য।'

-'কী রহস্য?'

-'সেইটেই এখন আবিষ্কার করতে হবে। আপাতত আপনার ঠিকানা রেখে আপনি বাড়ি ফিরে যান। একটু পরেই আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে হাজির হব।'

বড়ো রাস্তা থেকে একটু তফাতে মহিমবাবুর মস্ত বাড়ি। সামনে খানিকটা খোলা জমি। ডান দিকে একটি ছোটো কাঁচা রাস্তা। বাড়ির দুটো ফটক-একটি বড়ো, একটি ছোটো। বড়ো ফটকটি বাড়ির সামনের দিকে এবং দ্বিতীয়টিকে বলা চলে খিড়কির ফটক, তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এলে ব্যবহার করতে হয় কাঁচা রাস্তাটি।

বড়ো ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন স্বয়ং মহিমবাবু।

জয়ন্ত বললে, 'মানিক, তুমি খানিকক্ষণ মহিমবাবুর সঙ্গে আলাপ করো, আমি আগে বাড়ির চারিদিকটা ঘুরে দেখে আসি।'

মহিমবাবু আমাকে নিয়ে গেলেন তাঁর বৈঠকখানায়। তাঁর মুখে দুশ্চিন্তার চিহ্ন, কথাবার্তা বড়ো একটা হল না।

মিনিট কয়েক পরেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করলেন একটি তরুণী। সুদর্শনা, সুগঠনা কিন্তু তাঁর চোখের ভাব আর্ত, মুখ একেবারে পাণ্ডুর। দেহখানি দেখলেও বোধ হয়, দুঃখের ভার সইতে না পেরে এখনি তা ভেঙে পড়বে। আন্দাজে বুঝলুম, ইনিই হচ্ছেন অমলা দেবী।

অমলা আমার দিকে ফিরেও তাকালেন না, একেবারে মহিমবাবুর কাছে গিয়ে তাঁর একখানি হাত ধরে বললেন, 'কাকাবাবু, সুবিমলদাকে তুমি ছেড়ে দিতে বলেছ তো?'

মহিমবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'না মা, ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত না দেখলে চলবে না।'

-'না কাকাবাবু। আমি বলছি তিনি নির্দোষ।'

-'তাহলে অপরাধী কে?'

-'আমি জানি না। কিন্তু সুবিমলদা পুলিশের হাতে, একথা যে কল্পনা করা যায় না কাকাবাবু।'

-'সুবিমলকে তুমি ভালোবাসো, তাই আমার অবস্থা তুমি বুঝতে পারছ না। কেবল পুলিশ নয়, আমি আর এক ভদ্রলোককেও মামলাটা তদারক করবার জন্যে নিয়ে এসেছি।'

আমার দিকে ফিরে অমলা শুধোলেন, 'এই ভদ্রলোক?'

-'না, ওর বন্ধু। আমি তাঁকে কাঁচা রাস্তার ভিতরে ঢুকতে দেখেছি।'

ভুরু কুঁচকে অমলা বললেন, 'কাঁচা রাস্তায়? সেখানে পাবার কী আছে? . . . ওই যে, আর এক ভদ্রলোক আসছেন। কাকাবাবু, উনিই কি তিনি?'

-'হ্যাঁ মা।'

জয়ন্ত ঘরে ঢুকে পাপোশের উপরে পা ঘষে জুতোর কাদা তুলে ফেলতে লাগল।

অমলা তার কাছে গিয়ে বললেন, 'আমার সুবিমলদা নিশ্চয়ই এ কাজ করেননি, কী বলেন?'

জয়ন্ত হাসিমুখে বললে, 'আপনার কথা সত্য হলে সুখী হব। আপনিই বুঝি অমলা দেবী? আপনাকে দু-একটা প্রশ্ন করব?'

-'নিশ্চয়ই!'

-'গেল রাত্রে আপনি কোনো শব্দ শোনেননি?'

-'কিছু না। কাকাবাবুর গলা শুনে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলুম।'

-'কাল রাত্রে বাড়ির সব দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল?'

-'হ্যাঁ।'

-'আজ সকালেও কোনো দরজা খোলা ছিল না?'

-'না।'

-'আপনাদের নতুন দাসী রাত্রে বাড়ির বাইরে গিয়েছিল?'

-'হ্যাঁ। কাকাবাবু আমাদের কাছে যখন মুকুটের কথা বলছিলেন, তখন সে ঘরের ভিতরে পানের ডিবে দিতে এসেছিল।'

-'তাহলে আপনার সন্দেহ হচ্ছে, ননিবালা মুকুটের খবর বাইরের আর কারুকে দিতে গিয়েছিল?'

মহিমবাবু অধীর স্বরে বলে উঠলেন, 'এসব প্রশ্নের মানে হয় না। আমি নিজে দেখেছি মুকুট ছিল সুবিমলের হাতে।'

-'একটু অপেক্ষা করুন মহিমবাবু। ওসব কথা পরে হবে। অমলা দেবী, আপনি ননিবালাকে খিড়কির ফটক দিয়ে ফিরে আসতে দেখেছেন?'

-'হ্যাঁ। ফটকের বাইরে ছায়ার মতো একটা লোককেও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি।'

-'সে কে হতে পারে?'

-'এ পাড়ার মুদির ছেলে। নাম কাঙালিচরণ। ননিবালাকে বিয়ে করতে চায়।'

-'সে বোধ হয় ফটকের বাঁ-পাশে দাঁড়িয়েছিল?'

-'হ্যাঁ।'

-'তার একটা পা কাঠের?'

অমলার মুখে ফুটে উঠল ভয় ও বিস্ময়। সে বললে, 'কী আশ্চর্য, আপনি কি মায়াবী? এ কথা কেমন করে জানলেন?'

অমলাকে কোনো উত্তর না দিয়ে জয়ন্ত ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, 'মহিমবাবু, এইবারে আমি আপনার শোবার ঘরটা দেখতে চাই। না, না, আর এক কথা। এই বৈঠকখানায় দেখছি তিনটে দরজা রয়েছে। যে দরজা দিয়ে আমি ঢুকলুম, ওটা দিয়ে বাইরের লোক এখানে আসে। দ্বিতীয় দরজা দিয়ে কোথায় যাওয়া যায়?'

-'বাড়ির ভিতর-মহলে।'

-'আর ওই দরজাটা?'

-'ওটা দিয়ে বেরিয়ে বাগান পেরিয়ে খিড়কির ফটকের দিকে যাওয়া যায়।'

জয়ন্ত সেইদিকে এগিয়ে গেল। পকেট থেকে আতশিকাচ বার করে দরজার চৌকাঠের তলাটা অল্পক্ষণ পরীক্ষা করে বললে, 'এইবার উপরে চলুন।'

মহিমবাবুর শয়নগৃহটি মাঝারি। একখানি খাট, একটি ড্রেসিং টেবিল, একটি আলমারি ও খানদুই চেয়ার ছাড়া সেখানে আর কোনো আসবাব নেই।

জয়ন্ত বললে, 'মুকুট আছে ওই আলমারিতে?'

-'হ্যাঁ।'

মহিমবাবুর কাছ থেকে চাবি নিয়ে আলমারি খুলে জয়ন্ত বললে, 'খোলবার সময়ে কোনো শব্দ হয় না এইজন্যেই আপনার ঘুম ভাঙেনি।'

জয়ন্ত মরক্কো কেসের ভিতর থেকে মুকুটটি বার করে বিছানার উপরে স্থাপন করলে। সে এক অপরূপ সৌন্দর্যের ঐশ্বর্য, তার দিকে তাকালেও চোখ যেন জুড়িয়ে যায়। কেবল অপূর্ব ফিরোজাগুলিই দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করে না, যে স্বর্ণকার এই মুকুটটি গড়েছে নিশ্চয়ই সে একজন উঁচুদরের শিল্পী।

জয়ন্ত বললে, 'মহিমবাবু, মুকুটের এই প্রান্তটা একটুখানি ভেঙে গেছে। আপনি আরও একটু ভেঙে ফেলতে পারেন?'

আতঙ্কে শিউরে মহিমবাবু বলে উঠলেন, 'সর্বনাশ, বলেন কী মশাই? সে আমি প্রাণ থাকতেও পারব না।'

-'বেশ, আপনি না পারেন, আমি পারি কি না দেখা যাক,' বলেই সে মুকুটটা তুলে নিয়ে দুই হাত দিয়ে তার আর একটা প্রান্ত ভাঙবার চেষ্টা করলে। তারপর বললে, 'লোকে বলে আমি নাকি মহা বলবান ব্যক্তি, মুকুটের এই প্রান্তটা আমি একটু দুমড়াতে পেরেছি, প্রাণপণ শক্তি প্রয়োগ করলে ভেঙে ফেলতেও পারি। কিন্তু কোনো একজন সাধারণ মানুষের সে ক্ষমতা হবে না। আর এক কথা। মুকুটটা এইভাবে এখনি যদি ভেঙে ফেলা যায়, তাহলে ঠিক পিস্তল ছোড়ার মতো একটা আওয়াজ হবে। মহিমবাবু, পাশের ঘরে আপনি

সুবিমলবাবুকে মুকুট নিয়ে ধস্তাধস্তি করতে দেখেছেন, অথচ এরকম কোনো আওয়াজ শোনেননি, এ বড়ো আশ্চর্য কথা।'

মহিমবাবু বললেন, 'কী জানি মশাই, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

-'আপনারা এখানে বসুন। এখন আমি একলা আর একবার বাড়ির বাইরে যেতে চাই।' এই বলে জয়ন্ত প্রস্থান করলে।

এবং প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে ফিরে এসে বললে, 'মহিমবাবু, এখানে যা-যা দেখবার সব আমি দেখে নিয়েছি। এইবারে বাড়ি ফিরতে চাই।'

-'কিন্তু আমার রত্ন তিনখানা কোথায়?'

-'তা আমি বলতে পারব না।'

হাত কচলাতে কচলাতে মহিমবাবু বললেন, 'বেশ বুঝতে পারছি, আমার ভাঙা কপাল আর জোড়া লাগবে না।'

অমলা কাকুতি ভরা কণ্ঠে বললে, 'আমার সুবিমলদাকে রক্ষা করুন।'

-'রক্ষাকর্তা ভগবান, আমি নই। মহিমবাবু, আমি পেশাদার গোয়েন্দা নই, কাজ করি শখের খাতিরে। কিন্তু আমি পারিশ্রমিক নেব না বটে, তবে চোরাই পাথর তিনখানা ফিরে পেতে হলে আপনাকে কিছু অর্থ ব্যয় করতে হবে।'

মহিমবাবু উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'ভগবানকে ধন্যবাদ। তাহলে সেগুলো ফিরে পাবার সম্ভাবনা আছে? বলুন বলুন, আমাকে কত টাকা দিতে হবে?'

-'আন্দাজে তাও আজ বলতে পারছি না। কাল সকালে দশটার সময়ে দয়া করে একবার আমার বাড়িতে যাবেন। আশা করি সেই সময়ে আপনাকে আলোকিত করতে পারব। এসো মানিক।'

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ভবঘুরে

বেশ বুঝলুম, জয়ন্ত একটা কিছু সাব্যস্ত করে ফেলেছে। আমি কিন্তু এখনও অন্ধের মতো গোলকধাঁধার মধ্যে পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছি। বাড়িতে ফেরবার মুখে জয়ন্তকে বারকয়েক জাগ্রত করবার চেষ্টা করে দেখলুম, যদি সে পথ নির্দেশ করতে পারে। কিন্তু আমার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হল। সে শিলামূর্তির মতো মৌন।

বাড়িতে এসে জয়ন্ত নিজের ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে। আধ ঘণ্টা পরে সে যখন আবার বেরিয়ে এল তখন একেবারে বদলে গেছে তার চেহারা। চুলগুলো উশকোখুশকো, রুক্ষ; বাঁ-গালে একটা আব; কানে গোঁজা একটা বিড়ি; গায়ে আধময়লা মেরজাই; পরনে রঙিন ছিটের লুঙ্গি; পায়ে বাটা কোম্পানির ছেঁড়া ও কাদামাখা রবারের জুতো। পয়লা নম্বরের ভবঘুরের মূর্তি! অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলুম।

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, 'এইরকম লোকের মুখে কীরকম গান মানায় বলো তো? এ গানটা কি চলবে?' বলেই গুনগুন করে প্রথম দুই লাইন গাইলে-

'ও আমার, কমলালেবু প্রাণ!
সিলেটে জন্ম তোমার,
বেলেঘাটায় স্থান।'

শুধোলুম, 'এই বেশে কোথায় যাচ্ছ হে? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

-'ভবঘুরেরা যেখানে যায়। রাস্তায়। মধু, ও মধুসূদন!' ডাক শুনে মধুর আবির্ভাব।

-'সারাদিনটাই হয়তো পথে পথে টোটো করে ঘুরে মরতে হবে, কিন্তু উদরদেশ তো ততক্ষণ শূন্য থাকতে রাজি হবে না। চটপট খান কয় শসার আর চিকেন স্যান্ডউইচ বানিয়ে কাগজে মুড়ে দিয়ে যাও।'

জয়ন্ত বেরিয়ে গেল এবং ফিরে এল বেলা পাঁচটার সময়ে-হাতে তার ঝুলছে দড়ি দিয়ে বাঁধা একজোড়া পুরোনো লপেটা জুতো। মুখে তার হাসিখুশি।

আমি তখন চা পান করতে বসেছি। জয়ন্তও আমার সঙ্গে যোগ দিলে। বললে, 'আবার বেরিয়ে পড়বার জন্যে এখানে এসেছি। এক পেয়ালা চা খেয়েই উঠব।'

-'আবার যাবে কোথায়?'

-'বালিগঞ্জের এখানে-সেখানে। আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো না। ফিরতে রাত হতে পারে।'

-'খবর আশাপ্রদ তো?'

-'মন্দ নয়, মন্দ নয়। অভিযোগ করবার কিছুই নেই। দুপুরে মহিমবাবুদের পাড়াতেও গিয়েছিলুম, কিন্তু তাঁর বাড়ির ভিতরে ঢুকিনি। ভারি মনের মতো মামলা হে, কাজ করে খুশি আছি। কিন্তু যাক, এখন আমার গালগল্প করবার সময় নেই। এখনি আবার সম্ভ্রান্ত সমাজে প্রবেশ করবার জন্যে বেশ পরিবর্তন করতে হবে।'

জয়ন্তের হাসিমুখ, নৃত্যশীল চোখ ও স্ফূর্তিভরা হাবভাব দেখে বেশ বোঝা গেল, মামলাটার সুরাহা হতে আর দেরি নেই। সে স্নান করে জামাকাপড় বদলে আবার বেরিয়ে গেল ভদ্রবেশে। তারপর মধ্যরাত্রি পর্যন্ত অপেক্ষা করেও যখন তার কোনো সাড়া পেলুম না, তখন আমি শয়ন করতে গেলুম। এমনি তার স্বভাব, কখনো কখনো সে দিনের পর দিন অনুপস্থিত থাকে, সুতরাং তার জন্যে আমার কোনোই দুর্ভাবনা হল না।

কত রাত্রে সে ফিরে এসেছে জানি না, কিন্তু সকাল বেলায় চায়ের আসরে এসে দেখি, টেবিলের সামনে পেয়ালা হাতে করে বসে রয়েছে জয়ন্ত, একেবারে ফিটফাট, তাজা চেহারা।

জয়ন্ত বললে, 'এইবারে খবরের কাগজ পড়ে শোনাও।'

কাগজ পড়তে পড়তে বাজল বেলা দশটা।

জয়ন্ত বললে, 'মহিমবাবুর আসবার সময় হয়েছে।'

বললুম, 'সদর দরজার সামনে একখানা মোটর দাঁড়ানোর শব্দ হল।'

অবিলম্বে মহিমবাবুর প্রবেশ। এক রাত্রেই তাঁর মূর্তির পরিবর্তন দেখে আমি চমকিত হলুম। তাঁর মাথার চুলে যেন আরও বেশি পাক ধরেছে; চোখ, গাল বসা বসা, দেহ একেবারে যেন ভেঙে পড়তে চায়। তাড়াতাড়ি তাঁর দিকে একখানা চেয়ার এগিয়ে দিলাম, অমনি পরিশ্রান্তের মতো তিনি ধপাস করে বসে পড়লেন।

থেমে থেমে ভগ্নস্বরে তিনি বললেন, 'কী পাপ করেছি যে এত দায়ে ঠেকছি? দু-দিন আগেও আমার সুখের সীমা ছিল না, আর আজ আমি দুনিয়ায় একা, আমার সম্মান পর্যন্ত নেই। এক দুর্ভাগ্যের পর আসছে আর এক দুর্ভাগ্য। জানেন জয়ন্তবাবু, অমলা আমাকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছে?'

-'চলে গিয়েছে?'

-'হ্যাঁ। আজ সকালে উঠে দেখি, ঘর তার খালি, বিছানাতেও সে শোয়নি। টেবিলের উপরে রয়েছে তার হাতে লেখা একখানা চিঠি। কাল রাত্রে তাকে বলেছিলুম, সে যদি আমার ছেলেকে বিবাহ করত, তাহলে এমন দুর্ঘটনা ঘটত না। এ কথা রাগ করে বলিনি, মনের দুঃখে বলেছিলুম। হয়তো বলা আমার উচিত হয়নি, কিন্তু কথাটা তার প্রাণে গিয়ে বেজেছে। কারণ চিঠিতে সে লিখেছে: পূজনীয় কাকাবাবু, আমার মনে হচ্ছে, এই দুর্ঘটনার জন্যে আমিই দায়ী, আপনাদের কথা শুনলে কারুকে আজ দুর্বহ দুর্ভাগ্যের ভার সামলাতে হত না। এরপরেও কোন মুখ নিয়ে আর আপনাদের আশ্রয়ে বাস করি? তাই চিরদিনের জন্যে আমি বিদায় গ্রহণ করলুম। আমার ভবিষ্যতের জন্যে ভাববেন না, কারণ সে সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত হয়েছি। আর এক নিবেদন। আমার জন্যে খোঁজাখুঁজি করবেন না, কেননা সেটা হবে ব্যর্থ। কিন্তু মরি আর বাঁচি, আমাকে একান্ত

আপনারই বলে জানবেন। ইতি প্রণেতা অমলা। -এ চিঠির অর্থ কী জয়ন্তবাবু? অমলা কি আত্মহত্যা করতে চায়?'

-'না, না মহিমবাবু, অমলা দেবী মোটেই আত্মহত্যা করবেন না। সমস্যার এর চেয়ে ভালো সমাধান আর হতে পারে না। আমার মনে হচ্ছে, আপনার বিপদের মেঘ এইবারে কেটে যাবে।'

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অসম্ভব কথা

জয়ন্তের কথা শুনেই মহিমবাবু চেয়ারের উপরে সোজা হয়ে উঠে বসে বললেন, 'বিপদের মেঘ কেটে যাবে? আপনি নিশ্চয়ই সব জানতে পেরেছেন? কোথায় মুকুটের সেই ভাঙা অংশ?'

-'তার জন্যে আপনি কত টাকা ব্যয় করতে পারেন?'

-'আগে মান, তারপর টাকা। তার বিনিময়ে আমার সমস্ত সম্পত্তি দিতে পারি।'

-'অতটা বেশি অগ্রসর হবার দরকার নেই মহিমবাবু। প্রত্যেকখানা পাথরের জন্য দশ হাজার টাকা দিলেই চলবে।'

-'দশ হাজার কেন, আমি বিশ হাজার করে টাকা দিতে প্রস্তুত।'

-'বাড়াবাড়ি করে লাভ নেই। আপনার কাছে কলম আর চেক বই আছে? বেশ, তিনখানা পাথরের জন্যে দিন ত্রিশ হাজার টাকা।'

হতভম্বের মতো মহিমবাবু কথামতো কাজ করলেন। জয়ন্ত দেরাজ খুলে বার করলে একখানা তিনকোণা সোনার উপরে বসানো তিনখানি ফিরোজা।

বিপুল উল্লাসে চিৎকার করে দুই হাতে জিনিসটাকে চেপে ধরে মহিমবাবু বলে উঠলেন, 'হারানিধি আপনি খুঁজে পেয়েছেন! আমি বেঁচে গেলুম। আমি বেঁচে গেলুম!'

জয়ন্ত গম্ভীর স্বরে বললে, 'আপনার আরও কিছু কর্তব্য আছে।'

-'আরও কিছু কর্তব্য? বুঝেছি, আপনি পুরস্কার চান।' পকেট থেকে চেকবই ও কলম বার করে মহিমবাবু বললেন, 'বলুন কত হাজার টাকা চান? আপনি যা চান তাই দেব!'

-'এক টাকাও চাই না।'

-'তবে কী কর্তব্যের কথা বলছেন?'

-'আপনার কর্তব্য হচ্ছে, সুবিমলবাবুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা।'

-'আমি ক্ষমা প্রার্থনা করব! কেন?'

-'সুবিমলবাবুর মতো পুত্র যেকোনো পিতার মুখোজ্জ্বল করতে পারে।'

-'আপনি কী বলছেন!'

-'ঠিক কথাই বলছি।'

-'তবে কি-তবে কি পাথর তিনখানা সে চুরি করেনি?'

-'না, তিনি নিরপরাধ।'

-'বলেন কী! এ বিষয়ে আপনি কি নিশ্চিত?'

-'একেবারে নিশ্চিত।'

-'তাহলে এখনি আমি থানায় গিয়ে এ সুসংবাদটা তাকে দিয়ে আসছি।'

-'এ সংবাদ তাঁর জানতে বাকি নেই। কাল আমি নিজেই তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলুম। তিনি যখন কিছুতেই আসল ব্যাপার ভাঙতে রাজি হলেন না, তখন আমি যা অনুমান করেছিলুম, সেটা তাঁকে খুলে বললুম।

তারপর তাঁকে স্বীকার করতে হল যে, আমার অনুমানই সত্য।'

-'সবই যে অদ্ভুত রহস্য বলে মনে হচ্ছে। ভগবানের দোহাই, সব কথা খুলে বলুন।'

-'হ্যাঁ, বলব বই কী! পায়ে পায়ে কেমন করে আমি অগ্রসর হয়েছি, তাও আপনাকে বলব। কিন্তু তার আগে আর একটা কথা শুনুন। এই চুরির সঙ্গে অমলা দেবী আর কুমার বাহাদুরের যোগাযোগ আছে।'

-'অমন কথা মুখেও আনবেন না। আমার অমলা? অসম্ভব!'

-'দুঃখের বিষয়, অসম্ভবই হয়েছে সম্ভবপর। এই কুমার বাহাদুর হচ্ছে এক নিঃস্ব বড়ো ঘরের ছেলে, সর্বহারা জুয়াড়ি, তার না আছে হৃদয়, না আছে বিবেকবুদ্ধি। তার চরিত্র যে কতখানি জঘন্য, আপনি বা সুবিমলবাবু কেউই তা জানেন না। অমলা দেবী তো সংসারে অনভিজ্ঞ তরুণী, তিনি তার স্বরূপ বুঝবেন কেমন করে? তিনি তার সুন্দর মুখ দেখে ভুলেছিলেন, বিশ্বাস করেছিলেন তার প্রত্যেকটি মিথ্যাকথা। সে নিশ্চয়ই তাঁকে বিবাহ করবে বলে, অঙ্গীকার করেছিল। দু-জনের মধ্যে দেখাশোনা হত প্রায় প্রত্যহই।'

মহিমবাবু জোরে মাথা নেড়ে বললেন, 'এসব কথা আমি বিশ্বাস করতে পারব না, পারব না!'

সপ্তম পরিচ্ছেদ

জয়ন্তের কথা

'শুনুন মহিমবাবু। আমি মামলাটাকে যে ভাবে খাড়া করেছি তার মধ্যে যে ভুলচুক কিছু নেই, এমন কথা জোর করে বলতে পারি না। খানিক খানিক অস্পষ্টতা থাকবেই। অমলা দেবীকে পেলে সে অস্পষ্টতা দূর করা যেত, কিন্তু তিনি এখন যবনিকার অন্তরালে।

'ঘটনার দিন রাত্রে আপনি নীচে নেমে দেখেছিলেন, খিড়কির ফটকের দিকে যাবার জন্যে বৈঠকখানায় যে দরজাটা আছে, অমলা সেটা বন্ধ করে দিচ্ছেন। আসলে বাইরে সেখানে ছিল কুমার বাহাদুর, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে কথা কইছিলেন অমলা। তিনি কথাপ্রসঙ্গে নিশ্চয়ই তাকে বলেছিলেন ফিরোজা মুকুটের কথা। শুনেই কুমার বাহাদুরের মনে জাগ্রত হয় দুর্দান্ত লোভ। সে ঠিক কী প্রস্তাব করে, বলতে পারব না। খুব সম্ভব মুকুটটা সে খালি একবার দেখতে চেয়েছিল। অমলা যে আপনাকে ভালোবাসেন, তাতে আর সন্দেহ নেই। প্রথমটা নিশ্চয়ই তিনি এই বিপদজনক প্রস্তাবে রাজি হননি। কিন্তু কুমার বাহাদুর শেষটা তাঁকে বুঝিয়ে দেয় যে, মুকুটটা কেবল একবার চোখে দেখলে কারুর কোনো ক্ষতিই হবে না। সে মুকুটটা দেখবার জন্যে গভীর রাত্রে আবার সেখানে আসবে। জেদাজেদিতে পড়ে অমলাকে শেষটা সম্মতি দিতে হয়।

'ঠিক সেই সময়ে হয় আপনার আবির্ভাব। অমলা তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দেন। আপনার কাছে ননিবালার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। সে অভিযোগ মিথ্যা নয়।

'টাকার জন্যে আপনার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে সে রাত্রে সুবিমলবাবুর মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। তার উপরে ক্লাবের দেনার জন্যেও তাঁর মনে ছিল দুশ্চিন্তা। তাঁর ঘুম হয়নি, মধ্য রাত্রেও জেগে ছিলেন। হঠাৎ ঘরের বাইরে শুনতে পান কার অস্পষ্ট পায়ের শব্দ। কৌতূহলী হয়ে উঠে দরজা একুট ফাঁক করে সবিস্ময়ে দেখতে পান, অমলা চোরের মতো সন্তর্পণে আপনার শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

'রাত্রেও সেখানে আলো জ্বালা থাকে। ব্যাপারটা কী জানবার জন্যে সুবিমলবাবু নিজের ঘরের অন্ধকারে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং একটু পরেই স্তম্ভিত নেত্রে দেখলেন, আপনার ঘর থেকে অমলা আবার বেরিয়ে আসছেন-হাতে তাঁর ফিরোজা মুকুট!

'অমলা নীচে নেমে গেলেন, পিছনে পিছনে নামলেন আতঙ্কগ্রস্ত সুবিমলবাবুও। বৈঠকখানার দরজার কাছে পর্দার আড়াল থেকে দেখা গেল, খিড়কির ফটকের দিকে যাবার দরজাটা খুলে অমলা মুকুটটা সমর্পণ

করলেন বাইরের কোনো লোকের হাতে। সে মুকুটটা হস্তগত করেই সরে পড়ল। এর জন্যে অমলা প্রস্তুত ছিলেন না, ভয় পেয়ে উপরে পালিয়ে এলেন।

'অমলাকে ভালোবাসেন সুবিমলবাবু। তাকে বিবাহ করতে চান। পাছে অমলার নামে কলঙ্ক রটে, সেই ভয়ে এতক্ষণ তিনি কোনো গোলমাল করতে পারেননি, কিন্তু এখন তাঁর হুঁশ হল, মুকুটটা যদি খোয়া যায়, তাহলে তাঁর পিতার কত বড়ো বিপদের সম্ভাবনা। তিনি তখনি পাগলের মতো ছুটে ওদিককার দরজা খুলে ফেলে বাইরে গিয়ে পড়লেন। তারপর খিড়কির ফটক থেকে বেরিয়ে কাঁচা রাস্তা ধরে ছুটতে লাগলেন।

'চোর তখনও বেশি দূরে যেতে পারেনি। গ্যাসের আলোতে সুবিমলবাবু তাকে চিনতে পারলেন। তারপর মুকুট নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া আরম্ভ হল-একদিকে সুবিমলবাবু আর একদিকে কুমার বাহাদুর। টানাটানি করতে করতে সুবিমলবাবু প্রচণ্ড এক ঘুসি মারেন কুমার বাহাদুরকে-তার চোখের উপরটা কেটে গিয়ে রক্ত পড়তে থাকে। মুকুটটা অত্যন্ত কঠিন, একজনের সাধারণ শক্তি তাকে ভাঙতে পারে না, কিন্তু দুই জনের সম্মিলিত শক্তিতে হঠাৎ সেটা ভেঙে গেল।

'মুকুটটা নিয়ে ফিরে এলেন সুবিমলবাবু। সে সময়ে তিনি উত্তেজিত হয়েছিলেন, ওদিককার দরজাটা জোরে বন্ধ করে দেন আর সেই শব্দে আপনার নিদ্রাভঙ্গ হয়। শোবার ঘরের কাছে এসে সুবিমলবাবু মুকুটটা দুমড়ে গেছে দেখে যখন আবার সেটা টেনে সোজা করবার চেষ্টায় ছিলেন, সেই সময়ে হয় আপনার আবির্ভাব।'

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পদচিহ্নের ইতিহাস

মহিমবাবু বিস্ফারিত নেত্রে বললেন, 'এও কি সম্ভব?'

জয়ন্ত বললে, 'যখন তাঁর প্রাপ্য সাধুবাদ, তখন সুবিমলবাবুকে দিলেন আপনি গালাগালি আর চোর বদনাম। তাঁর রাগ আর অভিমান হওয়া স্বাভাবিক। তার উপরে তিনি যাকে অত্যন্ত ভালোবাসেন, সেই অমলাকে না জড়িয়ে তাঁর পক্ষে কোনো কথা বলা ছিল অসম্ভব। এই জন্যেই তিনি করেছিলেন মৌনাবলম্বন। যেমন করে হোক অমলাকে তিনি কুৎসিত কলঙ্কের কালিমা থেকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন।'

মহিমবাবু বললেন, 'ও বুঝেছি। তাই সব কথা ফাঁস হয়ে গেছে ভেবে মুকুট দেখেই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। কী নির্বোধ আমি! ধরা পড়বার পর সুবিমল পাঁচ মিনিটের জন্যে বাইরে যেতে চেয়েছিল কেন, তাও বুঝতে পারছি। তিনখানা পাথর পাওয়া যাচ্ছে না শুনে সে চেয়েছিল সেগুলো খুঁজে আনতে। তখন তাকে অবিশ্বাস করে আমি কি অবিচারই করেছি।'

জয়ন্ত বলতে লাগল, 'এত সহজে মামলাটার রহস্য ভেদ করতে পারলুম কেন জানেন? মেঘ আর বৃষ্টির জন্যে। কয়েক দিন ধরে বৃষ্টি হয়েছে, রাস্তায় পাতা কাদার আস্তরণ। তারপর পরশু থেকে বৃষ্টি থেমেছে বটে কিন্তু কাল পর্যন্ত আকাশ ছিল মেঘে আচ্ছন্ন। রোদ ওঠেনি বলে রাস্তার কাদা শুকোয়নি। মানুষের পদচিহ্নগুলো আপনার বাড়ির পাশের কাঁচা রাস্তার উপরে লিখে রেখেছিল বিচিত্র ইতিহাস।

'কাল সকালে ঘটনাস্থলে গিয়ে আমি সর্বাগ্রে সেই ইতিহাস পাঠ করবার চেষ্টা করেছি। কাঁচা রাস্তাটা দিয়ে বেশি লোক চলাচল নেই। বৃষ্টির ধারায় আগেকার সব পদচিহ্নই ধুয়ে মুছে গিয়েছে। সুতরাং ঘটনার রাত্রে ওখানে কারা চলাফেরা করেছিল, সেটা জানতে কিছুই বেগ পেতে হল না।

'প্রথমেই দেখলাম, খিড়কির ফটকের সামনে রয়েছে ছোটো ছোটো খালি পায়ের দাগ, কোনো বালক বা নারী সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। তার সামনেই পেলুম একখানা পা ও একটা গোল দাগ-কোনো একঠেঙো লোক কাঠের পা পরে সেখানে এসেছিল। পরে জানা গেল, আপনাদের দাসী ননিবালা তার একঠেঙো হবু-বরের সঙ্গে সেইখানে দাঁড়িয়ে বাক্যালাপ করেছিল।

'তারপর দেখলাম, কোনো মানুষের দুই সার শৌখিন জুতোর দাগ বাহির থেকে বাড়ির দিকে চলে গিয়েছে। সেই সঙ্গে পেলুম আরও দুই সার খালি পায়ের চিহ্ন। দাগের গভীরতা ও ব্যবধান দেখে বুঝতে দেরি লাগল না যে, কেউ খালি পায়ে ছুটতে ছুটতে বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে আবার ফিরে এসেছে ছুটতে ছুটতেই। মনটা খুশি হয়ে উঠল, কারণ আগেই আপনার মুখে শুনেছিলুম যে, সুবিমলবাবুকে আপনি নগ্নপদে মুকুট নিয়ে টানাটানি করতে দেখেছিলেন।

'একজায়গায় দেখলাম, কাদার উপরে বিষম ধস্তাধস্তির চিহ্ন- সেখানেও খালি পায়ের আর শৌখিন জুতোর দাগ। সেখানে যে রক্তপাত হয়েছে, তাও বোঝা গেল। তারপর জুতোর দাগ চলে গিয়েছে গলির বাইরের দিকে, আর খালি পা ফিরে এসেছে বাড়ির দিকে। ধরে নিলাম, সে বাড়িরই লোক।

'আপনার মনে আছে, বৈঠকখানায় ঢুকে খিড়কির ফটকের দিকে যাবার দরজার তালাটা আমি পরীক্ষা করেছিলাম? একজন লোক যে কাদামাখা খালি পা নিয়ে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করেছে, সেখানে ছিল তার স্পষ্ট চিহ্ন।

'তখন আসল ব্যাপারটা কতক কতক আন্দাজ করতে পারলুম। কোনো শৌখিন জুতোপরা লোক মুকুট হস্তগত করে প্রস্থান করছিল। সুবিমলবাবু দেখতে পেয়ে তার অনুসরণ করেন, তার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে মুকুট ছিনিয়ে নিয়ে আবার বাড়ির ভিতরে ফিরে আসেন।

'চোরকে নিশ্চয় বাড়ির কোনো লোক সাহায্য করেছিল। বাড়ির ভিতরে ছিল কেবল দাসীরা আর অমলা। কিন্তু দাসীদের মুখ চেয়ে সুবিমলবাবু নিশ্চয়ই অপরাধের বোঝা নিজের মাথায় তুলে নেবেন না। বাকি রইলেন কেবল অমলা। সুবিমলবাবু তাঁকে ভালোবাসেন। তাঁর মানরক্ষার জন্যে তিনি সব করতে পারেন। অতএব, প্রথমে অসম্ভব মনে হলেও আমি সন্দেহ করলুম অমলাকেই। তার উপরে রাত্রে আপনি তাঁকে বৈঠকখানায় বাগানে যাবার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছেন এবং মুকুট দেখেই তিনি ভয়ে আর্তনাদ করে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। এখন শৌখিন জুতোপরা লোকটা কে হতে পারে? এ বাড়িতে কুমার বাহাদুর হামেশাই আনাগোনা করে। তার নাম আগেই শুনেছিলুম, সে হচ্ছে অত্যন্ত কুবিখ্যাত ব্যক্তি। ভবঘুরে সেজে তার চাকরের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেললুম। শুনলুম তার মনিব আগের রাতে আহত অবস্থায় বাড়ি ফিরেছে। নিজের ছেঁড়া জুতো দেখিয়ে, আট আনা পয়সা দাম দিয়ে তার কাছ থেকে কুমার বাহাদুরের একজোড়া পুরোনো ফেলে দেওয়া লপেটা কিনে আনলুম। তারপর আপনার বাড়ির পাশের কাঁচা রাস্তায় এসে সেই শৌখিন জুতোর দাগের সঙ্গে লপেটা জোড়া মিলিয়ে দেখলুম। অবিকল মিলে গেল। আর কিছু বুঝতে বাকি রইল না।

'তারপর পোশাক বদলে কুমার বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করলুম। আমি জানি, এই কেলেঙ্কারি আপনি চাপা দিতে চান, তাই পুলিসের সাহায্য গ্রহণ করলুম না।

'সে প্রথমটা সবই উড়িয়ে দিতে চাইলে। তারপর আমি যখন তার বিরুদ্ধে যেসব প্রমাণ ছিল, একে একে সেগুলো উল্লেখ করলাম, সে মারমুখো হয়ে লাঠি নিয়ে তেড়ে এল। আমিও বার করলুম আমার রিভলভার। তখন সে কতকটা শান্ত হল।

'আমি বললুম, পাথর তিনখানা ফিরিয়ে দাও। আমরা ত্রিশ হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত আছি।

'সে বললে, হায় হায়, আমি যে মোটে পাঁচ হাজার টাকায় তিনখানা পাথরই বেচে ফেলেছি!

'তারপর তার কাছ থেকে সেই চোরাই মালের কারবারির ঠিকানা আদায় করলুম। তাকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ত্রিশ হাজার টাকার বিনিময়ে আপনার রত্ন উদ্ধার করে এনেছি।'

মহিমবাবু উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন, 'ধন্যবাদ জয়ন্তবাবু, অসংখ্য ধন্যবাদ! আপনার ঋণ আমি জীবনে শোধ করতে পারব না। আপনার ক্ষমতা জাদুকরের মতো।'

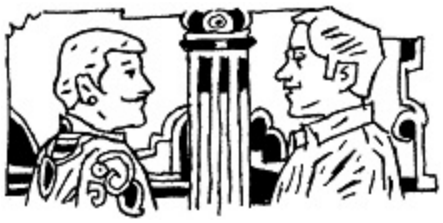

গল্পটি জনৈক সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য লেখকের আখ্যান অবলম্বনে রচিত। ইতি-গ্রন্থকার।

ছত্রপতির ছোরা

এক

সুন্দরবাবুর শাস্তিভোগ

'আজ সাত দিন আপনার দেখা নেই। আজ সাত দিন চায়ের আসরে আপনার আসন খালি পড়ে আছে। সুন্দরবাবু এজন্যে আপনাকে শাস্তি নিতে হবে।'

-'কী শাস্তি দিতে চাও জয়ন্ত?'

-'সুকঠোর শাস্তি! আজ একাসনে বসে গলাঃধকরণ করতে হবে সাত পেয়ালা চা, সাতখানা টোস্ট আর সাতটা এগপোচ।'

-'ওঃ ! তাহলে তো সুন্দরবাবু আনন্দের সপ্তমস্বর্গে আরোহণ করবেন! ভারি শাস্তি দিতে চাও তো জয়ন্ত!' মানিক বললে হাসতে হাসতে।

সুন্দরবাবু বললেন, 'মানিকের ছেঁড়া কথায় কান পেতো না জয়ন্ত! তোমার শাস্তি যে অত্যন্ত কঠোর শাস্তি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাস্তি। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখো, দস্তুরমতো ম্লানমুখে আর দুঃখিত ভাবেই ওই শাস্তি আমি গ্রহণ করব। আনন্দিত হব কী, মুখ টিপে একটুখানি হাসব না পর্যন্ত।'

জয়ন্ত বললে, 'বেশ, তাহলে চেয়ারে বসে পড়ুন। শাস্তির জন্যে প্রস্তুত হন।'

-'হুম! আমি প্রস্তুত।'

-'এতদিন আসেননি কেন?'

-'পরে বলব। আগে শাস্তি দাও। সাত পেয়ালা চা, সাতখানা টোস্ট, সাতটা এগপোচ। ঃউ, কল্পনাতীত শাস্তি!'

মিনিট সাতেকের মধ্যে সাত-সাতখানা করে টোস্ট আর এগপোচ, বদন-বিবরের মধ্যে নস্যাৎ করে দিয়ে সুন্দরবাবু বললেন, 'এইবারে তোমাদের সঙ্গে কথা কইতে কইতে সপ্তপেয়ালা চায়ের সদব্যবহার করব। কী জানতে চাও জয়ন্ত?'

-'এতদিন কী করছিলেন?'

-'তদন্ত।'

-'নতুন মামলা বুঝি?'

-'হুঁ। এমন মামলা যে সামলানো দায়।'

-'কীরকম?'

-'খুনের মামলা কিন্তু একেবারে সূত্রহীন-অর্থাৎ খুনি কুত্রাপি সূত্র-টুত্র কিছুই রেখে যায়নি। অগাধ জলে সাঁতার কাটতে কাটতে হাঁপিয়ে উঠেছি ভায়া!'

-'মামলাটার বিবরণ শুনতে পাই না?'

- 'শুনবে বই কী, শোনাবার জন্যেই তো আমার শুভাগমন। আচ্ছা, একটু সবুর করো। আর মোটে দু-পেয়ালা চা বাকি আছে। রোসো, এক-এক চুমুকে সেটুকু সাবাড় করে দিই। হুম, এখন তোমার মত কী মানিক? আমি কি রীতিমতো হর্ষহীন বিমর্ষ মুখে জয়ন্তের দেওয়া কঠোর শাস্তি ভোগ করলুম না? আমি কি একবারও হেসেছি-একবারও আনন্দ প্রকাশ করেছি? অতএব সাবধান, ভবিষ্যতে আর কখনো আমার নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়ো না।'

মানিক বললে, 'আজ একটা ব্যাপার আপনি প্রমাণ করলেন বটে।'

-'কী'?

-'পুলিশ কেবল জবরদস্তি করতেই জানে না, খাসা অভিনয় করতেও জানে।'

-'অভিনয়?'

-'হ্যাঁ, প্রথম শ্রেণির অভিনয়। আপনি ইচ্ছা করলে শিশির ভাদুড়ির অন্নও মারতে পারেন।'

-'জয়ন্ত, তোমার স্যাঙাতটি হচ্ছে অতিশয় হাড়-ঢ্যাঁটা। ও আমাকে আবার নতুন দিক দিয়ে আক্রমণ করতে চায়। এবার কিন্তু আমি ক্রুদ্ধ হবার চেষ্টা করব।'

মানিক কৃত্রিম অনুনয়ের স্বরে বললেন, 'দোহাই সুন্দরবাবু, আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক-আপনি দয়া করে একটিবার ক্রুদ্ধ হন!'

সুন্দরবাবু থতোমতো খেয়ে বললেন, 'মানে?'

-'মানে হচ্ছে এই। আপনি ক্রুদ্ধ হলেই আপনাকে নিয়ে বেশি মজা করা যায়।'

-'আমাকে নিয়ে মজা?'

-'হ্যাঁ দাদা!'

-'আমাকে নিয়ে মজা করতে চাও?'

-'তা ছাড়া আর কী?'

-'তাহলে আমি কিছুতেই ক্রুদ্ধ হব না।'

-'তবে হাস্য করুন।'

-'না। আমি আর ক্ষুব্ধ কি ক্রুদ্ধও হব না, হাস্যও করব না।'

-'তবে মুখটি বুজে চুপটি করে বসে থাকুন।'

-'না, আমি মুখটি বুজে চুপটি করে বসেও থাকব না। আমি এখন জয়ন্তের কাছে আমার মামলার কথা বলব।'

মানিক নাচার ভাবে বললে, 'তথাস্তু।'

দুই

হত্যানাট্যের পাত্র-পাত্রী

সুন্দরবাবু বললেন, 'জয়ন্ত তুমি বসন্তপুরের স্বর্গীয় জমিদার রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের নাম শুনেছ?'

-'শুনেছি। তিনি দানশীল ব্যক্তি ছিলেন।'

-'হ্যাঁ তাঁর দুই পুত্র-হীরেন্দ্রনারায়ণ, দীনেন্দ্রনারায়ণ। এক কন্যা, সৌদামিনী দেবী। জ্যেষ্ঠ পুত্র হীরেন্দ্র চিরকুমার। কনিষ্ঠ দীনেন্দ্র পিতার জীবদ্দশাতেই বিপত্নীক হয়ে এক পুত্র রেখে মারা পড়েন, ছেলেটির নাম

দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ। রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ নানাদিক দিয়ে গুণী হয়েও, অত্যন্ত একরোখা ও কোপনস্বভাব ছিলেন, ছেলেদের সঙ্গে তাঁর বনিবনাও হত না। ব্যাপার ক্রমে এমন চরমে ওঠে যে, হীরেন্দ্র আর দীনেন্দ্র পিতৃগৃহ ত্যাগ করে চলে যান। রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ উইল করে সমস্ত সম্পত্তি দান করেন কন্যা সৌদামিনী দেবীকে। সৌদামিনীর বিবাহ হয়। রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে মারা পড়েন। তারপর জননী হবার আগেই বৎসর ঘুরতে-না-ঘুরতেই সৌদামিনী হন বিধবা।'

জয়ন্ত বললে, 'এ যে দেখছি দুর্ভাগ্যের ইতিহাস।'

-'হ্যাঁ, এর সমাপ্তিও বিয়োগান্ত। কলকাতার উপকণ্ঠে রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের একখানা অট্টালিকা আছে। বিধবা হবার পর থেকে সৌদামিনী সেইখানেই বাস করে আসছেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হীরেন্দ্র তাঁর কাছ থেকে মাসিক হাজার টাকা করে সাহায্য পেতেন। তিনি মাঝে মাঝে ভগ্নীর সঙ্গে দেখা করেও যেতেন। কনিষ্ঠ দীনেন্দ্রের পুত্র দ্বিজেন্দ্র পিতার মৃত্যুর পর পিতামহের বাড়িতেই বাস করেন, বলা বাহুল্য যে সৌদামিনীর ইচ্ছানুসারেই। সৌদামিনীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে এই ভ্রাতুস্পুত্রই। এখন আমার সঙ্গে ব্যাপারটার সম্পর্ক কী শোনো। আজ আট দিন হল, সৌদামিনী দেবী হঠাৎ মারা পড়েছেন। স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, অপঘাত মৃত্যু।'

-'হত্যাকাণ্ড?'

-'হ্যাঁ! একদিন সকালে দাসী ঘরে ঢুকে দেখে, বিছানার উপরে পড়ে রয়েছে সৌদামিনীর মৃতদেহ-বক্ষে তাঁর অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন। হত্যাকারী যে কে, ধরবার কোনো উপায়ই নেই। ঘটনাস্থলে গিয়ে তন্নতন্ন করে খুঁজেও আমি একটিমাত্র সূত্র আবিষ্কার করতে পারিনি। কেবল এইটুকু আন্দাজ করতে পেরেছি, হত্যাকারী বাড়ির বাইরে থেকে আসেনি।'

-'এমন আন্দাজের কারণ?'

'সৌদামিনীর শয়নগৃহের প্রত্যেক জানালা ছিল ভিতর থেকে বন্ধ। ঘরের দরজা রাত্রে অর্গলবদ্ধ থাকত না বটে, কিন্তু সেই দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকতে হলে আরও দু-টি এমন ঘরের ভিতর দিয়ে আসতে হয়, যার প্রত্যেকটিতেই থাকে অন্য অন্য লোক।'

-'আপনি কি সন্দেহ করেন, বাড়ির কোনো লোকই হত্যাকাণ্ডের জন্যে দায়ী?'

-'বাড়ির সব লোককেই প্রশ্ন করে বুঝেছি, তারা প্রত্যেকেই সন্দেহের অতীত।'

-'বাড়ির লোকদের কথা বলুন।'

-'প্রচুর সম্পত্তির মালিক হয়েও সৌদামিনী একান্ত সাধারণভাবেই জীবনযাপন করতেন। প্রকাণ্ড অট্টালিকার মধ্যে বাসিন্দা আছে মাত্র গুটিকয়। তিন-মহলা বাড়ি। প্রথম দুটো মহল একরকম তালাবন্ধ থাকে বললেই চলে। একটিমাত্র মহলই ব্যবহার করতেন সৌদামিনী। যে ঘরের ভিতর দিয়ে সৌদামিনীর ঘরে ঢোকা যায়, সেখানে থাকে তাঁর নিজস্ব পুরাতন দাসী। বয়স পঞ্চান্ন, নাম উমাতারা। সে সাধারণ দাসী নয়, গরিব কায়স্থের মেয়ে, বিধবা। ঘটনার দিন সে পাড়ার এক বিয়েবাড়িতে থিয়েটার দেখতে গিয়েছিল। রাত একটার সময়ে ফিরে আসে। সৌদামিনী দেবী তখন জীবিত ছিলেন কি না সে বলতে পারে না, কারণ নিজের ঘরে ফিরে এসেই সে শুয়ে আর ঘুমিয়ে পড়ে। সেই-ই সকালে উঠে প্রথমে সৌদামিনীকে মৃত অবস্থায় দেখতে পায়।

'তার ঘরের দরজা দিয়েই আসা যায়, পবিত্রবাবুর ঘরে। তার বয়স পঞ্চাশ বৎসর-এই পরিবারে কাজ করছেন দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর। এখন নায়েবের পদে মোতায়েন। একরকম ঘরেরই লোক আর অত্যন্ত বিশ্বাসী। নিঃসন্তান। সহধর্ম্মিণী সুরবালার সঙ্গে এই বাড়িতেই বাস করেন। কথায়-বার্তায় হাবভাব ব্যবহারে অতিশয় অমায়িক। তিনিও পাড়ার ওই বাড়িতে গিয়ে খানিকক্ষণ থিয়েটার দেখে রাত এগারোটার সময় বাড়িতে ফিরে আসেন। সুরবালার বয়স বিয়াল্লিশ। তিনি হাঁপানি রোগে প্রায় শয্যাশায়িনী। ঘটনার দিন বাড়িতেই ছিলেন না, পিত্রালয়ে গিয়েছিলেন।

'এই ঘরের পাশেই একখানা ছোট্ট ঘর। সেখানে থাকে এক প্রৌঢ়া ব্রাহ্মণী। বিধবা। রান্নাবান্নার ভার তার উপরেই। নাম বিন্দুবালা। সঙ্গে থাকে তার অবিবাহিতা কন্যা সিন্ধুবালা। বয়স পনেরো। রান্নাঘরের কাজে মাকে সাহায্য করে।

'মহলের একদিকে তিনখানা ঘর নিয়ে বাস করে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ। বয়স পঁচিশ। সুশিক্ষিত। কলেজের পড়া সাঙ্গ করেছে। কাব্যব্যাধিগ্রস্ত, মাসিকপত্রে কবিতা লেখে। খবর নিয়ে জেনেছি সচ্চরিত্র। স্বভাব কিঞ্চিৎ রোমান্টিক। মাসে দু-শো টাকা হাত খরচা পায়। পান সিগারেট পর্যন্ত খায় না।

'বাকি রইল আর একজনের কথা। নাম তার মানসী। বয়স বিশ বৎসর। পরমা সুন্দরী। সুমধুর প্রকৃতি। সুশিক্ষিতা। সৌদামিনীর স্বামীর দূর-সম্পর্কের আত্মীয়া। পিতা-মাতার মৃত্যুর পর সে একান্ত অসহায় হয়ে পড়াতে সৌদামিনী তাকে নিজের কাছে এনে রেখেছেন। আজ দুই বৎসর সে এখানে বাস করছে। উঠতে-বসতে তাকে ছাড়া সৌদামিনীর একদণ্ডও চলে না। আগে নায়েব পবিত্রবাবুই ছিলেন সৌদামিনীর ডান হাতের মতো, মানসী আসবার পর থেকেই তাঁর প্রভুত্ব ধীরে ধীরে কমে এসেছে। পবিত্র বাবুর কথাবার্তা শুনে ধারণা হল, এজন্যে তিনি মনে মনে মানসীর উপরে বিশেষ খুশি নন। তা এটা স্বাভাবিক।

'বাড়ির ভিতরে বাস করে এই কয়জন লোক। আর আছে দু-জন দ্বারবান, তিন জন বেয়ারা, দু-জন মালী, সকলেই পরীক্ষিত, পুরাতন লোক। তারা রাত্রে বাড়ির ভিতরেও থাকে না। তাদের জন্যে বাড়ির বাইরে, বাগানের ভিতর আলাদা ঘর আছে। আর তারা কীসের লোভে নরহত্যা করবে? সৌদামিনীর ঘর থেকে মূল্যবান কোনো জিনিসই চুরি যায়নি। একজন ঠিকে ঝি আছে, বাসন-কোসন মেজে দিয়ে চলে যায়।

'যেসব বাড়ির লোকের কথা বললুম, সৌদামিনীর জীবনের সঙ্গে তাদের প্রত্যেকেরই স্বার্থ জড়িত। সৌদামিনী বেঁচে থাকলেই লাভ। সৌদামিনীর মৃত্যুর পর তাদের চাকরি যাবার সম্ভাবনা। সম্পত্তি পেয়ে দ্বিজেন কী করবে না করবে, কে বলতে পারে? মানসী চাকরি করে না বটে, কিন্তু সৌদামিনীর মৃত্যুর পর আবার তার অবস্থা হয়েছে অসহায়। সে দ্বিজেনের কেউ নয়। দ্বিজেন তার ভার গ্রহণ করবে কি না সন্দেহ!'

মানিক বললে, 'কিন্তু সৌদামিনীর মৃত্যুতে দ্বিজেন কি লাভবান হবে না?'

-'মানিক, অপরাধীদের নিয়ে মাথার চুল পাকিয়ে ফেললুম, দুষ্ট লোক কি আমার চোখে ধুলো দিতে পারে? অপরাধীদের টাইপই আলাদা। দ্বিজেনের সম্বন্ধে নানা জনের কাছ থেকে খবরাখবর নিয়ে আমি তার কোনো দোষই আবিষ্কার করতে পারিনি। বিশেষ দ্বিজেনের মুখের উপরেই আছে তার মনের উজ্জ্বল পরিচয়। এমন শিশুর মতো সরল পবিত্র মুখ সচরাচর চোখে পড়ে না।'

জয়ন্ত শুধোলে, 'সৌদামিনীর দাদা হীরেন্দ্রনারায়ণ কীরকম লোক?'

-'খোঁজ নিয়েছি। সুবিধের লোক নয়, মাতাল, জুয়াড়ি। একা থাকে, অথচ হাজার টাকা মাসোহারা পেয়েও নিজের খরচ কুলোতে পারে না। সৌদামিনীর মৃত্যুর হপ্তা খানেক আগেও সে বোনের কাছে আরও টাকা চাইতে এসেছিল, কিন্তু টাকা পায়নি। তাই নিয়ে ভাই-বোনের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। হীরেন রাগ করে চলে যায়। কিন্তু তবু তাকে সন্দেহ করবার উপায় নেই।'

-'কেন?'

-'প্রথমত, খুনি বাইরে থেকে এসেছে এমন কোনো প্রমাণ নেই। দ্বিতীয়ত, ভগ্নীহত্যা করে হীরেন নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মারতে যাবে কেন? সৌদামিনীর মৃত্যুর সঙ্গেসঙ্গেই তার হাজার টাকা মাসোহারা বন্ধ হবার সম্ভাবনা।'

-'এখন সৌদামিনী সম্বন্ধে আরও কিছু বলতে পারেন?'

-'পারি। মৃত্যুকালে সৌদামিনীর বয়স হয়েছিল পঁয়ষট্টি। একহারা, শুকনো চেহারা, কিন্তু খুব শক্ত। আরও পনেরো-বিশ বছর অনায়াসে যমকে কলা দেখাতে পারতেন। বাপের মতন তিনিও ছিলেন বিষম একরোখা, কোপন-প্রকৃতি। ভালো-মন্দ যা-কিছু স্থির করতেন, তার আর নড়চড় হবার জো ছিল না। বাড়ির লোকের কারু তুচ্ছ ত্রুটি-বিচ্যুতিও সহ্য করতে পারতেন না, একেবারে আগুন হয়ে উঠতেন। তার উপরে ছিলেন

বেজায় রাশভারী মানুষ, মানসী আর পবিত্রবাবু ছাড়া আর কেউ সহজে তাঁর কাছে ঘেঁষতে সাহস করত না। বাড়ির প্রত্যেকেই তাঁকে ভয় করত, কেউ ভালোবাসত বলে মনে হয় না।'

-'এতদিনে নিশ্চয়ই শবব্যবচ্ছেদ হয়েছে?'

-'তা হয়েছে বই কী!'

-'হত্যাকারী কীরকম অস্ত্র ব্যবহার করেছে?'

-'ডাক্তারের মতে ছোরা। কিন্তু ঘটনাস্থলে ছোরা-টোরা কিছুই পাওয়া যায়নি।'

-'পদচিহ্ন, আঙুলের ছাপ?'

-'কিছু না, কিছু না।'

-'ডাক্তারের মতে সৌদামিনী মারা পড়েছেন কখন?'

-'আন্দাজ রাত এগারোটা কি বারোটা।'

জয়ন্ত কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তারপর বললে, 'সুন্দরবাবু, মামলাটা বেশ অসাধারণ। বুড়ি মেরে অকারণে কেউ খুনের দায়ে পড়তে চায় কেন?'

-'হুম, আমারও তো ওই প্রশ্ন!'

-'কিন্তু বুড়িকে নিশ্চয়ই কেউ অকারণে খুন করেনি। তলে তলে মস্ত একটা রহস্য আছে। আমি এইরকম রহস্যময় মামলাই পছন্দ করি।'

সুন্দরবাবু জোরে মস্তকান্দোলন করে বললেন, 'আমি কিন্তু মোটেই পছন্দ করি না। সূত্রহীন মামলা ঘাড়ে পড়লে পুলিশকে কেবল নাকানি-চোবানি খেয়ে মরতে হয়।'

-'সূত্রহীন মামলা প্রমাণিত করে অপরাধীর চাতুর্য। কিন্তু কে বললে এ মামলাটা সূত্রহীন?'

-'সূত্র আছে কুত্র, দেখিয়ে দাও দেখি?'

-'সূত্র আছে রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের বাড়ির ভিতরে।'

-'কী ছাই বল! আজ ক-দিন ধরে বাড়ির ভিতরটা কি আমি খুঁজতে বাকি রেখেছি? সেখানে সূত্রের নামগন্ধও নেই।'

-'তাহলে হত্যাকারী বাইরের লোক।'

-'অসম্ভব।'

-'দেখা যাক। আপনি এক কাজ করতে পারেন?'

-'বলো।'

-'বললেন, নরেন্দ্রনারায়ণের বাড়ির দুটো মহলে কেউ বাস করে না। আমি আর মানিক ওই দুটো মহলের কোনো একটায় হপ্তা খানেক থাকতে পারি, এমন ব্যবস্থা কি হয় না?'

-'খুব সহজেই হয়। ধরতে গেলে দ্বিজেনই এখন বাড়ির মালিক। আমি প্রস্তাব করলে নিশ্চয়ই সে নারাজ হবে না।'

-'তবে তাই করুন।'

-'ওখানে গিয়ে থাকলেই কি সূত্র বেরিয়ে পড়বে মাটি ফুঁড়ে?'

-'মাটি ফুঁড়ে না বেরোক, মানুষের মন ফুঁড়ে বেরিয়ে পড়তে পারে তো? অপরাধী যদি বাড়ির ভিতরে থাকে তাহলে আমি তাকে নিশ্চয়ই আবিষ্কার করতে পারব।'

তিন

দ্বিজেন্দ্রনারায়ণের প্রবেশ

কলকাতার উপকণ্ঠ বটে, কিন্তু জায়গাটার মধ্যে আছে পল্লিগ্রামের ছাপ।

মাঠের পর মাঠ সবুজ, মাঝে মাঝে তাল-নারিকেলকুঞ্জ, বড়ো বড়ো বনস্পতির ভিড়। একদিকে কালীঘাট থেকে এগিয়ে এসেছে আদিগঙ্গার একটি শীর্ণ ধারা, তার ঝিরঝিরে জলে ঝিকমিক করছে সূর্যকরচূর্ণ। অনেক দূরে দূরে দেখা যায় এক-একখানা বাড়ি। তারা মনের ভিতরে মনুষ্য-বসতির স্মৃতি জাগায় বটে, কিন্তু নষ্ট করে দিতে পারে না নিরালা শ্যামল পল্লিশ্রী।

জয়ন্ত বললে, 'দেখো মানিক, দিনের বেলায় এমন জায়গায় ওই ছাড়া ছাড়া বাড়িগুলিকে দেখতে খুব শান্ত, খুব সুন্দর। কবি আর শিল্পীরা নাকি ওইরকম সব বাড়িতেই বাস করতে ভালোবাসেন। কিন্তু এমনি নিরালা, নির্জন অন্ধকার গভীর রাত্রে ওই বাড়িগুলো শহরের যেকোনো বাড়ির চেয়ে ভয়াবহ আর বিপদজনক হয়ে উঠতে পারে।'

-'এ কথা কেন বলছ?'

-'এইরকম সব বাড়িতেই বিয়োগান্ত নাট্যাভিনয়ের সুযোগ আর সুবিধা থাকে বেশি। এসব জায়গায় অপরাধীরা যথেষ্ট অসংকোচে কাজ করতে পারে। তাই এমন সব বাড়ি দেখলে আমার মনে কবিত্ব জাগে না, জাগে আতঙ্ক।'

মানিক হেসে বললে, 'অপরাধ-তত্ত্ব ঘেঁটে তোমার মনের গড়ন বদলে যাচ্ছে।'

-'হয়তো তাই মানিক, হয়তো তাই।'

একখানা প্রকাণ্ড দ্বিতল অট্টালিকা, তার চারিধারে বাগান। ফটক দিয়ে জয়ন্তদের মোটর বাগানের ভিতরে প্রবেশ করলে।

সুন্দরবাবু বললেন, 'এই হচ্ছে নরেন্দ্রনারায়ণের শহরতলির প্রাসাদ।

মানিক বললে, 'একসময়ে হয়তো এটা প্রাসাদই ছিল, কিন্তু এখন ওর মধ্যে প্রাসাদত্ব কিছুই নজরে পড়ে না। কত বৎসর সংস্কার হয়নি কে জানে! বাগানেও নেই বাগানত্ব।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুঁ, সৌদামিনী দেবী ওসব বিষয়ে অত্যন্ত উদাসীন। কেবল যে মহলে নিজে বাস করতেন, একটু-আধটু নজর দিতেন তার দিকেই। ওই যে আমাদের মোটরের শব্দ পেয়ে দ্বিজেন নিজেই নেমে এসেছে।'

গাড়ি এসে থামল গাড়িবারান্দার তলায়। একটি তরুণ যুবক এসে নমস্কার করে বললে, 'সুন্দরবাবু, এঁরাই কি দয়া করে আমাদের এখানে অতিথি হবেন?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, এঁদেরই নাম জয়ন্তবাবু আর মানিকবাবু, জয়ন্ত, ইনি হচ্ছেন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায়।'

দ্বিজেন বললে, 'দুনিয়ায় ভালো-মন্দ কিছুই ব্যর্থ হয় না। আমার দুর্ভাগ্যের জন্যেই এঁদের মতো বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ হবার সৌভাগ্য অর্জন করলাম।'

জয়ন্ত বললে, 'কিন্তু আমি হয়তো আবার এখানকার কারুর না কারুর দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে দাঁড়াব!'

দ্বিজেনের মুখের উপর ঘনিয়ে উঠল একটা ছায়া। তাড়াতাড়ি সে হাসবার চেষ্টা করলে, কিন্তু হাসিটা ভালো করে জমল না।

সুন্দরবাবু শুধোলেন, 'দ্বিজেনবাবু, আমার বন্ধুরা ঠাঁই পাবেন কোন মহলে?'

দ্বিজেন বললে, 'সদর মহলে। ঠাকুরদাদার আমলে এখানে অনেক অতিথি-অভ্যাগতদের আগমন হত। অনেকেই পাঁচ-দশ দিন থেকে যেতেন, তাঁদের জন্যে যে ঘরগুলো নির্দিষ্ট ছিল, তারই দু-খানা ঘর ওঁদের জন্যে প্রস্তুত করে রেখেছি। একেবারে সেইখানেই চলুন।'

গোড়া থেকেই জয়ন্ত লক্ষ করছিল দ্বিজেনের চেহারা, ভাবভঙ্গি ও সাজসজ্জা। সুন্দর সুমিষ্ট মুখশ্রী, ছিপছিপে সুগঠিত দেহ, পরিচ্ছন্ন সাজসজ্জায় শৌখিনতা নেই, আছে সুরুচির পরিচয়। মৌখিকভাবে শিশুসুলভ

সরলতা থাকলেও চিন্তাশীলতার অভাব নেই। কণ্ঠস্বর মার্জিত। অপরাধীদের মধ্যে এ শ্রেণির লোক দেখা যায় না।

কিন্তু সেইসঙ্গে আর একটা বিশেষত্ব আকৃষ্ট করলে জয়ন্তের দৃষ্টিকে। দ্বিজেনের ভাবভঙ্গি কেমন সংকুচিত এবং তার চক্ষে কেমন একটা সন্দেহের ছাপ। জয়ন্তের মনে বারংবার প্রশ্ন জাগতে লাগল-কেন, কেন, কেন?

দ্বিজেনের সঙ্গে তারা বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলে। কার্পেট পাতা প্রশস্ত সোপান শ্রেণি-তার পাশের দেওয়াল বড়ো বড়ো তৈলচিত্রে অলংকৃত। বড়ো বড়ো হলঘর, দামি দামি ছবি, মস্ত মস্ত আয়না, পাথরের বা পিতলের বা ব্রোঞ্জের মূর্তি, সোফা, কৌচ, গদিমোড়া চেয়ার, নানা আকারের টেবিল ও বিজলিবাতির ঝাড় প্রভৃতির দ্বারা সুসজ্জিত। ঐশ্বর্যের কোনো মালমশলার অভাব নেই, কিন্তু অনাদরে ও মার্জনার অভাবে সমস্তই যেন একান্ত শ্রীহীন বলে মনে হয়। যেখানে রয়েছে এমন সব মূল্যবান আসবাব, তাদেরই উপরে এবং আশেপাশে চোখে পড়ে কালি-ঝুলি-ধূলি, মাকড়সার জাল এবং আরও যত কিছু মালিন্য ও কলঙ্ক।

সুন্দরবাবু বললেন, 'সৌদামিনী দেবী পিতার সম্পত্তির মালিক হয়েও তার সদব্যবহার করেননি কেন?'

দ্বিজেন বললে, 'বিধবা হবার পর থেকেই আমার পিসিমা সংসারের উপরে সমস্ত আস্থাই যেন হারিয়ে ফেলেছিলেন।'

-'কিন্তু আপনি আছেন তো?'

-'পিসিমা বলতেন, আমি বেঁচে থাকতে কেউ যেন আমার বাবার শখের জিনিসে হাত না দেয়! তাঁর হুকুমের বিরুদ্ধে যাবার সাহস ছিল না।'

-'অথচ আপনিই তাঁর উত্তরাধিকারী!'

দ্বিজেন শুষ্ক মৃদু স্বরে ধীরে ধীরে বললে, 'না, আমি তাঁর উত্তরাধিকারী নই।'

সচমকে ফিরে দাঁড়িয়ে সুন্দরবাবু সবিস্ময়ে বললেন, 'সেকী!'

-'আমি আগে তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ছিলুম বটে, কিন্তু এখন আর নই।'

-'আপনার কথার অর্থ আমি বুঝতে পারছি না।'

দ্বিজেন ম্লান হাসি হেসে বললে, 'মৃত্যুর তিন দিন আগে পিসিমা এক নতুন উইল করে সমস্ত সম্পত্তি জ্যাঠামশাইকে দিয়ে গিয়েছেন।'

-'হীরেন্দ্রনারায়ণ রায়কে?

-'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

-'এ কথা এতদিন আমাকে বলেননি কেন?'

-'আমি নিজেই সঠিক খবর জানতুম না। দিন-তিনেকের জন্যে আমি কলকাতার বাইরে গিয়েছিলুম-নতুন উইল হয় সেই সময়ে আমার অজ্ঞাতসারেই। তারপর কাল আমাদের অ্যাটর্নিবাবু হরিদাস চৌধুরীর মুখে এই খবরটা জানতে পেরেছি।'

-'তাহলে সৌদামিনী দেবী যখন মারা পড়েন, তখনও আপনি এ খবর জানতেন না?'

-'না।'

সুন্দরবাবু নিজের মনে মনেই কী যেন ভেবে মাথা নাড়লেন। তারপর বললেন, 'আপনার জ্যাঠামশাই নতুন উইলের কথা নিশ্চয়ই জানতে পেরেছেন?'

-'না।'

-'কেন?'

-'শুনেছেন তো পিসিমার সঙ্গে জ্যাঠামশাইয়ের টাকা নিয়ে মনান্তর হয়েছিল? তার দুই-একদিন পরেই জ্যাঠামশাই কারুকে কিছু না জানিয়েই কলকাতার বাইরে কোথায় গিয়েছেন; কবে ফিরবেন তা কেউ বলতে পারছে না। কাজেই নতুন উইল বা পিসিমার মৃত্যুর খবর তাঁর কানে গিয়ে পৌঁছোয়নি।'

-'আপনাদের অ্যাটর্নির ঠিকানা কী?'

দ্বিজেন ঠিকানা দিলে।

ঠিকানাটা টুকে নিয়ে সুন্দরবাবু বললেন, 'আজ আসি জয়ন্ত! একটা জরুরি তদন্ত আছে! কাল আবার আসব।'

চার

কায়ার ছায়া

দু-খানি পাশাপাশি মাঝারি আকারের ঘর জয়ন্ত ও মানিকের জন্যে নির্বাচিত হয়েছিল। প্রত্যেক ঘরের দু-দিকেই বারান্দা-একটি ভিতরকার আঙিনার দিকে, আর একটি বাইরেকার বাগানের দিকে।

দ্বিজেন বললে, 'এ ঘর দু-খানার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা দেখে আপনারা অবাক হবেন না। এ দু-খানা আপনাদের বাসোপযোগী করে তোলবার ভার নিয়েছিলেন নায়েবমশাই নিজেই। আপনারা আসছেন শুনে তিনি অত্যন্ত খুশি হয়েছেন।'

জয়ন্ত শুধোলে, 'কেন?'

-'নায়েব মশাইয়ের মতে সরকারি পুলিশ কোনোই কর্মের নয়। আপনারা একটু চেষ্টা করলেই নাকি খুনির ধরা পড়তে বিলম্ব হবে না।'

-'আপনিও কি এ কথা বিশ্বাস করেন?'

-'করি।'

-'আপনার বিশ্বাস হয়তো ভ্রান্ত।'

-'না জয়ন্তবাবু, আপনার অদ্ভুত শক্তির কথা কে না জানে? অসাধারণ আপনার প্রতিভা! কিন্তু সে কথা এখন থাক। আপনাদের ঘর পছন্দ হয়েছে তো?'

-'হয়েছে।'

ঠিক এই সময়েই ঘরের ভিতর আর এক ব্যক্তির আবির্ভাব। হৃষ্টপুষ্ট দোহারা চেহারা। শ্যামবর্ণ। মিষ্ট স্মিত মুখ। সমুজ্জ্বল দৃষ্টি। নিরহংকার ভাবভঙ্গি। বয়স প্রৌঢ়ত্ব ও বৃদ্ধত্বের সীমারেখায় এসে উপস্থিত হয়েছে বটে কিন্তু মাথার চুলে ও দাড়ি-গোঁফে দেখা দেয়নি এখনও শুভ্রতার চিহ্ন।

তিনি ঘরে ঢুকেই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'স্বাগত জয়ন্তবাবু! স্বাগত মানিকবাবু! আমাদের কী সৌভাগ্য! নমস্কার, নমস্কার!'

জয়ন্ত প্রতি নমস্কার করে বললে, 'আসুন পবিত্রবাবু!'

ভদ্রলোক বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, 'আপনি আমাকে চিনলেন, আর আমার নাম জানলেন কেমন করে?'

-'মন্ত্রবলে নয়। কিন্তু বুঝতে পারছি আপনি আমাদের উপস্থিতির খবর পেয়েছেন এইমাত্র।'

-'কী আশ্চর্য! সত্যিই তাই!'

-'আরও বুঝতে পারছি, খবর পেয়েই দুধের বাটি রেখে তাড়াতাড়ি এখানে ছুটে এসেছেন।'

দুই চক্ষু সভয়ে বিস্ফারিত করে পবিত্রবাবু বললেন, 'অপরং বা কিং ভবিষ্যতি! মশাই, আপনি জাদুকর!'

জয়ন্ত সবিনয়ে বললে, 'না মশাই, আমি একান্ত সাধারণ ব্যক্তি।'

-'না, না, আপনি অসাধারণ মানুষ, তৃতীয় নেত্রের অধিকারী!'

-'চোখ আমার দু-টির বেশি নয়, তবে দুটো চোখকেই সর্বদা আমি সজাগ রাখি বটে। শুনুন তবে। আমি জানি এ বাড়িতে দু-জন মাত্র ভদ্রলোক থাকেন-দ্বিজেনবাবু আর আপনি। কাজেই আপনিই যে পবিত্রবাবু, সেটা বোঝা একটুও কঠিন নয়।'

-'ঠিক, ঠিক! কিন্তু-'

-'আগে শুনুন। আমাদের দেখবার জন্যে আপনি আগ্রহান্বিত ছিলেন-নয়?'

-'আজ্ঞে হ্যাঁ, অত্যন্ত। ধরতে গেলে আমি আপনার পথ চেয়েই বসে ছিলুম।'

-'কে আপনাকে খবর দিলে যে আমরা এসেছি?'

-'বেয়ারা।'

-'তখন আপনি দুগ্ধপান করছিলেন?'

-'আজ্ঞে হ্যাঁ। সকালে আমি চায়ের বদলে একটু গরম দুধ খাই। কিন্তু কী আশ্চর্য, আপনি-'

-'কিছুই আশ্চর্য নয়, আপনার গোঁফের ডগায় এখনও দুধের দাগ লেগে রয়েছে। এখানে আসবার আগ্রহ আপনার এত বেশি যে, আপনি মুখ ধোবার বা দাগ মোছবার সময় পর্যন্ত পাননি। খুব তাড়াতাড়ি-প্রায় ছুটেই-আপনি এসেছেন, কারণ ঘরে ঢোকবার সময়ে আপনার শ্বাস-প্রশ্বাস ছিল দ্রুত। তাড়াতাড়ি-প্রায় দুটো মহল পার হতে হয়েছে, এই বয়সে একটু হাঁপাবেন বই কী!'

চমৎকৃতভাবে পবিত্রবাবু বললেন, 'রহস্যটা আপনি খুব সোজা করে আনলেন বটে, কিন্তু তবু বলব, অদ্ভুত! এক মুহূর্তে এত বেশি দেখা আর ভাবা সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব। দেখছ তো দ্বিজেন, কত সহজে ইনি কত অজানা কথা জানতে পারেন? আপনার আগমনে আমরা ধন্য হলুম, ধন্য হলুম!'

-'ক্ষান্ত হোন পবিত্রবাবু, এত বেশি প্রশংসাবাণে বিদ্ধ করলে আমরা অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়ব।'

-'আপনাদের জন্যে চা আর জলখাবার আনতে বলে দিই?'

-'না, ধন্যবাদ। ছোটো হাজারি বাড়িতেই সেরে এসেছি।'

-'দুপুরে কীরকম খাবার খাবেন?'

-'আপনাদের যা খুশি। আমাদের সেটা খাই না, ওটা খাই না বলার অভ্যাস নেই। যা পাই তাই খাই।'

-'বেশ, তাহলে আগে আপনাদের ভোজনের ব্যবস্থাটাই করে আসি। তারপর আপনার সঙ্গে প্রাণ খুলে ভালো করে আলাপ করব।' পবিত্রবাবু যেমন দ্রুতপদে এসেছিলেন, চলে গেলেন তেমনি দ্রুতপদেই।

জয়ন্ত একটা গোল টেবিলের সামনে বসে পড়ে সামনের আসনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে গম্ভীর স্বরে বললে, 'বসুন দ্বিজেনবাবু, আপনার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে।'

জয়ন্তের কণ্ঠস্বর শুনে দ্বিজেন একটু বিস্মিতভাবে তাকালে তার মুখের পানে। তারপর টেবিলের ওধারের নির্দেশিত চেয়ারে গিয়ে উপবেশন করলে বিনা বাক্যব্যয়ে।

দ্বিজেনের মুখের উপরে স্থির দৃষ্টি রেখে জয়ন্ত বললে, 'সুন্দরবাবুর কাছে আপনি বললেন, সৌদামিনী দেবী যে নতুন উইল করেছেন, তিনি মারা যাবার পরেও তার সঠিক খবর আপনার জানা ছিল না।'

-'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

-'সঠিক খবর মানে নিশ্চিত খবর তো?'

-'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

-'কিন্তু অনিশ্চিত-অর্থাৎ ভাসা ভাসা কোনো খবর কি আপনি পেয়েছিলেন?'

দ্বিজেন প্রথমটা ইতস্তত করে তারপর বললে, 'নিশ্চিত বা অনিশ্চিত কোনো খবরই পাইনি। তবে নতুন উইল যে হতে পারে এটুকু আন্দাজ করেছিলুম।'

-'কেন? স্পষ্টাস্পষ্টি বলুন, কেন?'

অতিশয় অসহায়ের মতো দ্বিজেন নতমুখে স্তব্ধ হয়ে রইল।

জয়ন্ত বললে, 'দ্বিজেনবাবু, কিছু লুকোবার চেষ্টা করলে আপনি নিজেই বিপদে পড়বেন, এটা বলে রাখা উচিত মনে করছি। একটু চেষ্টা করলেই অন্য উপায়ে আপনার গুপ্তকথা নিশ্চয়ই আমি জানতে পারব।'

আবার কিছুক্ষণের স্তব্ধতা। তারপর নিতান্ত নাচারের মতো দ্বিজেন বললে, 'ব্যাপারটা একেবারেই ঘরোয়া। এর সঙ্গে হত্যাকাণ্ডের কোনো সম্পর্কই আপনি আবিষ্কার করতে পারবেন না।'

-'তবু আমি শুনতে চাই।'

দ্বিজেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'বেশ, শুনুন। সুন্দরবাবুর মুখে মানসীর পরিচয় আপনি নিশ্চয়ই পেয়েছেন?'

-'হ্যাঁ। শুনেছি তিনি সুরূপা আর সুশিক্ষিতা।'

-'কিন্তু ও তো তার বাইরের পরিচয়। মানসীর মনের পরিচয় পেলে আপনি তাকে দেবী বলে শ্রদ্ধা না করে পারবেন না।'

-'বেশ, মানলুম।'

-'মানসী আজ দুই বৎসর আমাদের এখানে বাস করছে। পিসিমাকে দেখাশোনা করবার সমস্ত ভারই থাকত তার উপরে। কিন্তু সত্যকথা বলতে কী, বাড়ির সবাই জানে পিসিমার প্রকৃতি ছিল রুক্ষ, মুখ ছিল অতিশয় তিক্ত। অনাথা মানসীকে কেবল আশ্রয় দিয়েই তিনি তাঁর উচ্চমনের পরিচয় দেননি, মানসীর ভবিষ্যতের সম্বলের জন্যে পুরাতন উইলে পঞ্চাশ হাজার টাকাও ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু তবু তাঁর কটু কথায় রূঢ় ব্যবহারে মানসীকে বড়োই মানসিক অশান্তি ভোগ করতে হত-এমনকী প্রায়ই সে গোপনে না কেঁদেও থাকতে পারত না। এ বাড়িতে তার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করবার লোকও আর কেউ ছিল না। দু-দিনের মধ্যেই সে পিসিমার পক্ষে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে, এজন্যে সবাই তাকে হিংসা করত। নায়েবমশাইয়ের মতো অমায়িক লোকও নিজের প্রভুত্ব ক্ষুণ্ণ হওয়াতে তার প্রতি বিশেষ সদয় ছিলেন না। সে সহানুভূতি পেত কেবল আমার কাছ থেকেই। সে নিজের মন খোলবার আর সান্ত্বনার কথা শোনবার সুযোগলাভ করত।

'আমারও অবস্থা কল্পনা করতে পারছেন তো? ছেলেবেলাতেই হারিয়েছি পিতা-মাতাকে। সংসারে আত্মীয় বলে জেনেছি কেবল পিসিমাকেই। কিন্তু তিনি আমাকে ভালোবাসতেন তাঁর নিজের প্রকৃতি অনুসারেই-যা নয় মোহনীয়, নয় সহনীয়। কখনো শুনিনি তাঁর মুখ থেকে আদরের কথা। আমিও সন্তর্পণে তাঁর কাছ থেকে থাকতাম দূরে দূরে। এ সংসারে আমার মনের মানুষ বলতে কেউ ছিল না-আমি সাবালক হয়ে উঠেছি দাসদাসী-কর্ম্মচারীদের প্রতিবেশ প্রভাবের মধ্যেই। আমার অভাব-অভিযোগ শুনতেন কেবল নায়েবমশাই। তাঁর স্ত্রী সুরবালা দেবীও আমাকে ভালোবাসেন, যত্ন করেন। ছেলেবেলায় তাঁর কোলে চড়েছি বলেও স্মরণ হয়। কিন্তু তাঁরাও কেউ আমার আত্মীয় নন।

'অনাথা মানসী আর অনাদৃত আমি-আমরা দু-জনেই যে পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হব, এটা খুবই স্বাভাবিক। আমাদের দু-জনের মন বুঝতুম কেবল আমরা দু-জনেই। নিজেদের সুখ-দুঃখ, ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্খা নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করতুম সুবিধা পেলেই। ক্রমে আমাদের সম্পর্ক এতটা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল যে আমরা স্থির করলুম, পরস্পরের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হব। জয়ন্তবাবু, এইখান থেকেই আমাদের দুর্ভাগ্যের সূত্রপাত।

'পিসিমার কাছে যেদিন আমাদের মনের ইচ্ছা প্রকাশ করলুম, তিনি বিষম রাগে একেবারে আগুন হয়ে উঠলেন। চিৎকার করে বললেন, এ বিবাহ হতে পারে না, হতে পারে না, হতে পারে না!

'আমি যত বোঝাই, তিনি তত বেঁকে দাঁড়ান। এইটেই ছিল তাঁর চিরকেলে স্বভাব-তাঁর সংকল্প থেকে কেউ তাঁকে টলাতে পারত না। কেবল তাঁর কেন, আমাদের বংশের প্রত্যেকেই নাকি প্রকাশ করেছেন ওইরকম স্বভাব। হয়তো ওটা আমাদেরই রক্তের গুণ বা দোষ। কাজেই আমিও বংশ ছাড়া নই। পিসিমা যত বেঁকে দাঁড়ান, আমার সংকল্প তত দৃঢ় হয়ে ওঠে।

'পিসিমার আপত্তির প্রধান কারণ মানসী অনাথা, গরিব, বংশগৌরব থেকে বঞ্চিত-রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের পৌত্রের সঙ্গে তার বিবাহ অসম্ভব। সেই সেকেলে যুক্তি-খাপ খায় না যা নব্যযুগের সাম্যবাদের সঙ্গে। আমি বললুম, ও যুক্তি আমি মানি না, মানসী ছাড়া আর কারুকে বিবাহ করব না!

'পিসিমা বললেন, তাহলে তোমাকে আমি সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করব। আমি বললুম, তাই সই। তার কয়েকদিন পরেই পিসিমার মৃত্যু।

'জয়ন্তবাবু, আপনি জানতে চেয়েছেন, আমাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে যে নতুন উইল হবার সম্ভাবনা আছে, এটা আমি আন্দাজ করতে পেরেছিলুম কি না? তা পেরেছিলুম বই কী! পিসিমা ছিলেন ভীষণ একগুঁয়ে মানুষ; যা ধরতেন, তা আর ছাড়তেন না। আপনি আর কিছু জানতে চান?'

জয়ন্ত ভাবতে ভাবতে বললে, 'আপাতত আর কিছু জানতে চাই না। হ্যাঁ, একটা কথা। মানসী দেবী কি পর্দানশিন মহিলা?'

-'মানে?'

-'তিনি কি আমার সঙ্গে দেখা আর বাক্যালাপ করতে পারবেন?'

-'অনায়াসে। কিন্তু মানসীর সঙ্গে আপনার কী দরকার?'

-'এ প্রশ্নের উত্তর আপনার কাছে না দিলেও চলবে।'

-'সে বেচারির সঙ্গে হত্যাকাণ্ডের কোনোই সম্পর্ক নেই।'

জয়ন্ত বিরক্ত স্বরে বললে, 'সে বিচার করব আমি। জানেন দ্বিজেনবাবু, গোয়েন্দার প্রথম কর্তব্য হচ্ছে, সকলকেই সন্দেহ করা। আপনাদের দাস-দাসী দ্বারবানরা পর্যন্ত সন্দেহ থেকে মুক্ত নয়।'

দ্বিজেন চেয়ার ত্যাগ করে বললে, 'বেশ, আপনার যা ইচ্ছা। মানসীকে কি এখনি পাঠিয়ে দেব এখানে?'

-'না। আজ আপনার মুখে যা শুনলুম আগে তাই পরিপাক করি। মানসী দেবীর সঙ্গে আলাপ করব কাল সকালে।'

দ্বিজেন নমস্কার করে চলে গেল। তার মুখে দুশ্চিন্তার চিহ্ন।

মানিক বললে, 'ভাই জয়ন্ত, এতদিনেও সুন্দরবাবু যা করতে পারেননি, তুমি একবেলাতেই তা পেরেছ।'

-'কীরকম?'

-'অন্ধকার ভেদ করে বেশ খানিকটা এগিয়ে যেতে পেরেছ।'

-'পেরেছি কি? আমার তো তা মনে হয় না। এই তো সবে গৌরচন্দ্রিকা, আসল উপন্যাস এখনও শুরুই হয়নি।'

'কিন্তু তুমি একটা মস্ত আবিষ্কার করেছ।'

-'কী আবিষ্কার?'

-'এতদিন হত্যাকাণ্ডটা ছিল উদ্দেশ্যহীন। এইবারে উদ্দেশ্যের কিছু কিছু আভাস পাওয়া যাচ্ছে।'

-'যথা?'

-'ঠিক স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারব না। তবে সন্দেহ হচ্ছে যেন, ওই নতুন উইলের সঙ্গে এই হত্যাকাণ্ডের একটা যোগাযোগ আছে।'

-'হয়তো আছে। হয়তো নেই। আমার পরিকল্পনা এখনও কোনো নির্দিষ্ট আকার পায়নি।'

-'মানুষ হিসাবে দ্বিজেন সম্বন্ধে কোনো ধারণা করতে পারলে?'

-'এক আঁচড়েই মানুষ চেনা যায় না ভাই! মোটামুটি দ্বিজেনকে আমার ভালোই লাগল। সরল, উদার, ভদ্র। যে স্বীকারোক্তি করলে তার মধ্যে কোনো মারপ্যাঁচ নেই। কিন্তু আমি এখন ভাবছি আর একটা কথা। ওই জানলাটার পর্দার ওপাশে দাঁড়িয়ে গোপনে কে এতক্ষণ আমাদের কথোপকথন শ্রবণ করছিল?'

মানিক সবিস্ময়ে বলে উঠল, 'তাই নাকি? পুরুষ, না স্ত্রীলোক?'

-'তা বোঝা গেল না। পর্দাটা পুরু আর গাঢ় রঙের। কিন্তু বাইরের আলো আর জানলার পর্দার মাঝখানে আমি কোনো মানুষের স্পষ্ট ছায়া দেখেছি। দ্বিজেনের প্রস্থানের সঙ্গেসঙ্গেই ছায়াটাও সরে গেল। কার কায়া থেকে এই ছায়ার জন্ম? আমি জানতে চাই, আমি জানতে চাই!'

পাঁচ

ছত্রপতির ছোরা

পরদিন। প্রভাতী চায়ের আসর। জয়ন্ত আছে, মানিক আছে, আর আছেন সুন্দরবাবু আর পবিত্রবাবু। দ্বিজেনও হয়তো সেখানে হাজির থাকত, কিন্তু বাড়ির বাইরে গিয়েছে কোনো জরুরি কাজে।

কথায় কথায় পবিত্রবাবু বললেন, 'জয়ন্তবাবু, আপনি রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের লাইব্রেরি দেখেছেন?'

-'না।'

-'আপনি বই পড়তে ভালোবাসেন?'

-'অত্যন্ত।'

-'রাজার লাইব্রেরিতে অনেক দামি দামি কেতাব আছে। মস্ত লাইব্রেরি। দেখবেন তো চলুন।'

-'চলুন।'

সুন্দরবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'ধেৎ, লাইব্রেরি দেখে লাভ? এখন কেউ যদি খুনিকে দেখাতে পারে তবেই আমি খুশি হই।'

পবিত্রবাবু হেসে বললেন, 'খুনিকে দেখাবার ভার তো আপনাদেরই উপরে!'

লাইব্রেরিঘরটা প্রকাণ্ড। তার চারিদিকেরই দেওয়ালের অনেকখানি পর্যন্ত ঢেকে দাঁড় করানো আছে সারি সারি আলমারি এবং আলমারির থাকগুলো রোগা আর মোটা কেতাবে কেতাবে ঠাসা।

জয়ন্ত বইগুলো পরীক্ষা করতে করতে বললে, 'দেখছি এখানে কোনো হালের বই নেই।'

পবিত্রবাবু বললেন, 'রাজার মৃত্যুর সঙ্গেসঙ্গেই লাইব্রেরির জন্যে বই কেনা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সে তো আজকের কথা নয়, আমিই তখন এ বাড়িতে আসিনি।'

ঘরের মাঝখানে রয়েছে লম্বা একটা কাচের ডালাওয়ালা কাষ্ঠাধার। সেইদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে জয়ন্ত শুধোলে, 'ওটা কী?'

-'শোকেস।'

-'কী আছে ওর মধ্যে?'

-'সেকেলে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করার শখ ছিল রাজার। ওর মধ্যে সেইগুলোই সাজানো আছে।'

-'বড়ো চিত্তাকর্ষক সংগ্রহ তো!' জয়ন্ত কৌতূহলী হয়ে কাষ্ঠাধারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর হেঁট হয়ে পরীক্ষা করতে লাগল।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের হরেকরকম অস্ত্র, ধনুক, তির, তরবারি, ছোরা-ছুরি, খড়্গ, কুঠার ও বর্ষা প্রভৃতি আরও কত কী! প্রত্যেক অস্ত্রের গায়ে বেরঙা গোলাপি ফিতার সঙ্গে সংলগ্ন এক-একখানা কার্ড-তার উপরে দুই-এক লাইনে লেখা অস্ত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

জয়ন্ত লক্ষ করলে, একজায়গায় ফিতায় সংলগ্ন কার্ডের উপরে লেখা রয়েছে-'ছত্রপতির ছোরা', কিন্তু তার সঙ্গে কোনো অস্ত্র নেই। সে পবিত্রবাবুর দৃষ্টি সেইদিকে আকৃষ্ট করলে।

যেন আকাশ থেকে পড়লেন পবিত্রবাবু। বিস্ফারিত চক্ষে সবিস্ময়ে বললেন, 'একী ব্যাপার! বাড়িতে হত্যাকাণ্ডের আগের দিনেও যে ছোরাখানাকে দেখেছি যথাস্থানে! কোথায় গেল সেখানা? কে চুরি করলে?'

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, 'ছত্রপতির ছোরা ব্যাপারটা কী?'

-'ছত্রপতি শিবাজী নাকি ছোরাখানা ব্যবহার করতেন। তাই ওই নাম।'

এতক্ষণে সুন্দরবাবু জাগ্রত হয়ে উঠলেন। বললেন, 'হুম, হুম! বড়োই সন্দেহজনক, বড়োই সন্দেহজনক! আপনি ঠিক বলছেন, হত্যাকাণ্ডের আগের দিনেও ছোরাখানা, এইখানেই ছিল?'

পবিত্রবাবু বললেন, 'তাতে আর কোনো সন্দেহই নেই। আমার বেশ মনে আছে। সৌদামিনী দেবীর হুকুম ছিল, তাঁর পিতার বহু যত্নে সংগ্রহ করা বইগুলি যেন কীটপতঙ্গের অত্যাচারে নষ্ট না হয়ে যায়, বেয়ারাদের

সাহায্যে আমি যেন হপ্তায় একবার করে লাইব্রেরিঘর পরিষ্কার করি। দেখছেন না, এ-মহলের অন্যান্য ঘরের মতো এ ঘরখানাও দুর্দশাগ্রস্ত নয়?'

-'হুম! তোমার মত কী জয়ন্ত?'

-'আমারও ওই মত। ছোরা চুরি যাওয়া সন্দেহজনক।'

-'সৌদামিনী দেবী মারাও পড়েছেন ছোরার আঘাতেই!'

-'হ্যাঁ, সুন্দরবাবু। বাইরের কোনো চোর এ ছোরা চুরি করেনি।'

পবিত্রবাবু সভয়ে বলে উঠলেন, 'আপনারা কী বলছেন, আমি বুঝতে পারছি না। এ বাড়িতে সৌদামিনী দেবীকে হত্যা করতে পারে কে? আর কেনই-বা করবে? আমরা যে সকলেই তাঁরই আশ্রিত! যে ডালে বসে সে ডাল কেউ কাটে? না জয়ন্তবাবু, আমাকে ক্ষমা করবেন-আমার মাথা ঘুরছে, আমার পা অবশ হয়ে আসছে, আমি আর দাঁড়াতে পারছি না, আমি চললুম-আমি চললুম!' মাতালের মতো টলতে টলতে তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

জয়ন্ত করুণভাবে দুই বার মাথা নাড়লে। সুন্দরবাবুর মুখও অত্যন্ত গভীর।

মানিক বললে, 'এতদিন পরে পাওয়া গেল একটা নিরেট প্রমাণ। অপরাধী তাহলে এই বাড়ির ভিতরেই আছে। চলো জয়ন্ত, আমাদের ঘরে গিয়ে বসি।'

ঘরে ফিরে এসে তিন জনেই খানিকক্ষণ বসে রইল বোবার মতো।

সর্বপ্রথমে কথা কইলেন সুন্দরবাবু। বললেন, 'আমার কী বিশ্বাস জানো জয়ন্ত?'

-'বলুন।'

-'আসল হত্যাকারী বাড়ির লোক না হতেও পারে।'

-'এমন কথা কেন বলছেন?'

-'আসল হত্যাকারী হয়তো বাইরে থেকেই এসেছে, কিন্তু তাকে সাহায্য করেছে বাড়ির কোনো লোক।'

-'বুঝেছি। আপনি বোধ হয় আসল হত্যাকারী বলে সন্দেহ করছেন হীরেন্দ্রনারায়ণকেই?'

-'তা ছাড়া আর কে? সে লোক ভালো নয়। হত্যাকাণ্ডের সাত দিন আগে টাকার জন্যে সে সৌদামিনী দেবীর সঙ্গে ঝগড়া করেছিল। সে নিরুদ্দেশ হয়ে আছে। আমার তো তার উপরেই সন্দেহ হয়। বাড়ির কোনো লোক যে কারণেই হোক তাকে সাহায্য করেছে। রাত্রে গোপনে দরজা খুলে দিয়েছে। অস্ত্র পাওয়া যাবে কোন ঘরে হীরেন তা জানত। ছত্রপতির ছোরার দ্বারা কাজ হাসিল করে এখন সে গা-ঢাকা দিয়ে আছে।'

মানিক বললে, 'সুন্দরবাবুর অনুমান সঠিক হলে বলতে হবে যে, হীরেন নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মেরেছে। সে তখনও আন্দাজ করতে পারেনি যে, সৌদামিনী দেবী তাকেই দান করেছেন সমস্ত সম্পত্তি।'

জয়ন্ত বললে, 'সুন্দরবাবুর অনুমান নিতান্ত অসংগত নয়।'

সুন্দরবাবু উৎসাহিত হয়ে গাত্রোত্থান করে বললেন, 'তাহলে এখন আমি উঠলুম ভাই। দেখা যাক, এই নতুন সূত্রটা ধরে কতদূর অগ্রসর হতে পারি।'

জয়ন্ত বললে, 'আর আমরাও দেখি বাড়ির ভিতরে হীরেনের কোনো সহকারীকে আবিষ্কার করিতে পারি কি না।'

সুন্দরবাবুর প্রস্থান। জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ। সে বললে, 'বাবুজি, দিদিমণি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান!'

-'কে দিদিমণি? মানসী দেবী?'

-'আজ্ঞে।'

-'তাঁকে আসতে বলো।'

ভৃত্যের প্রস্থান। অনতিবিলম্বে মানসীর প্রবেশ।

রূপসী বটে। চোখ-ভুরু-নাক যেন সুপটু শিল্পীর লিখন। রং যেন গোলাপি স্বপ্ন। দেহের গঠন শ্রেষ্ঠ ভাস্করের আদর্শ। কে বলবে একে দরিদ্র, অনাথা, বংশগৌরবহীনা? ভাবভঙ্গির ভিতর থেকে ফুটে উঠছে পরম আভিজাত্য! মহিমময়ী!

জয়ন্ত অতটা আশা করেনি। তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'দয়া করে আসন গ্রহণ করুন।'

মানসী বললে, 'আমাকে এখানে আসতে বলেছেন?'

জয়ন্ত বাধো বাধো গলায় বললে, 'ঠিক আপনাকে এখানে আসতে বলিনি। আমরাই আপনার কাছে যেতে পারতুম। জানেন তো অপ্রীতিকর কর্তব্যপালন করবার জন্যে আমরা এখানে এসেছি? আপনার কাছ থেকে কেবল দু-চারটে কথা জানতে চাই।'

মানসী ম্লান হেসে বললে, 'আপনি না ডাকলেও আমাকে কিন্তু আজ আপনার কাছে আসতেই হত।'

জয়ন্ত বিস্মিত কণ্ঠে বললে, 'কেন?'

-'সেকথা পরে বলব। আমি আগে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই।'

ছয়

রুমাল, সায়া, রক্ত

জয়ন্ত বললে, 'মানসী দেবী, হত্যার রাত্রের কথা আপনি যা জানেন, বলুন।'

মানসী বললে, 'আমি যেটুকু জানি সুন্দরবাবুকে সব খুলে বলেছি। আপনি কি তা শোনেননি?'

-'শুনেছি। কিন্তু পরের মুখে শোনা আর নিজের কানে শোনা এক কথা নয়।'

-'বেশ, শুনুন। সৌদামিনী দেবী অন্যান্য দিনের মতন সেদিনও রাত নয়টার সময়ে ঘুমোতে যান। তাঁর পাশের ঘরে থাকে উমাতারা, আর তারপরের ঘরখানিতে থাকেন পবিত্রবাবু, আর তাঁর স্ত্রী সুরবালা দেবী। কিন্তু সেদিন প্রথম রাত্রে দু-খানা ঘরই খালি ছিল। এ পাড়ার কোনো বিয়েবাড়িতে থিয়েটার ছিল, পবিত্রবাবু আর উমাতারা তাই দেখতে গিয়েছিলেন আর সুরবালা দেবী গিয়েছিলেন বাপের বাড়িতে।

'মাঝে মাঝে আমাকে অনিদ্রা রোগে ধরে। সে রাত্রেও কিছুতেই আমার ঘুম আসছিল না। রাত প্রায় এগারোটা পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে ছটফট করবার পর উঠে পড়লুম। ভাবলুম, ও-মহলের লাইব্রেরিতে গিয়ে খানিকক্ষণ পড়াশোনা করে আসি। ঘুম না হলে আমি প্রায়ই তাই করতুম-এটা ছিল আমার অনিদ্রা রোগের চিকিৎসার মতো। ঘর থেকে বেরিয়ে ও-মহলের দিকে অগ্রসর হতে হতে দেখি, সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছেন পবিত্রবাবু।

'জিজ্ঞাসা করলাম, থিয়েটার ভেঙে গেল? তিনি বললেন, রাত একটার আগে ভাঙবে বলে তো মনে হয় না। আমার ভালো লাগল না তাই চলে এলুম, উমাতারা শেষ পর্যন্ত না দেখে ছাড়বে না। তুমি যে এখনও ঘুমোওনি? আমি বললুম, অনিদ্রাকে তাড়াবার জন্যে লাইব্রেরিতে যাচ্ছি। তিনি আমার অভ্যাস জানতেন। একটু হেসে নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন।

'লাইব্রেরিতে ছিলাম ঘণ্টা খানেক। চিকিৎসা ব্যর্থ হল না, ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল। ফিরলুম নিজের ঘরের দিকে। আসতে আসতে দূর থেকেই মনে হল, এ-মহলের বারান্দা দিয়ে ছায়ামূর্তির মতো কী যেন একটা স্যাঁৎ করে চলে গেল। কিন্তু কাছে এসে কারুকেই দেখতে পেলুম না। ভাবলুম আমারই চোখের ভ্রম।

'দ্বিজেনবাবুর ঘরের কাছ পর্যন্ত আসতেই ঘরের ভিতর থেকে তিনি বললেন, কে যায়? আমি সাড়া দিলাম। তিনি বললেন, এত রাতে তুমি বাইরে! বললাম, অনিদ্রা ব্যাধির ওষুধ খোঁজবার জন্যে লাইব্রেরিতে গিয়েছিলাম। তিনি হেসে উঠে বললেন, ওষুধ পেলে? আমি বললাম, পেয়েছি। আমার ঘুম এসেছে। তিনি বললেন, তাহলে তাড়াতাড়ি ঘরে যাও। আর পারো তো ঘুমকে বলে দিয়ো সে যেন আমার কাছেও আসে।

কারণ আমারও তোমার দশা। তারপর আমি ঘরে এসেই ঘুমিয়ে পড়লুম। সে রাত্রের আর কোনো কথাই আমি জানি না।'

জয়ন্ত খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'সৌদামিনী দেবীর সঙ্গে আপনার কীরকম সম্পর্ক?'

-'সম্পর্ক একটা ছিল, তবে নামমাত্র। কিন্তু তাঁর পক্ষে যতটা সম্ভবপর, তিনি আমাকে ভালোবাসতেন। অবশ্য তার কারণও ছিল। আমার মতন একটি লোক না হলে তাঁর চলত না। আমার আগেও আরও কয়েকজনকে তিনি সঙ্গিনীরূপে থাকবার জন্যে নিযুক্ত করেছিলেন বটে, কিন্তু তারা কেউ তাঁকে দু-তিন মাসের বেশি সহ্য করতে পারেনি। আমি যে তা পেরেছি তার প্রধান কারণ হচ্ছে, সহ্য করা ছাড়া আমার আর অন্য উপায় ছিল না, আমি অনাথা। তবু তিনি যে একসময়ে আমার জন্যে পঞ্চাশ হাজার টাকার ব্যবস্থা করেছিলেন, তা থেকেই প্রমাণিত হয় মনে মনে তিনি অসাড় ছিলেন না। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যক্রমে পরে তাঁর দান থেকে আমি হয়েছি বঞ্চিত। তার কারণও আপনি দ্বিজেনবাবুর মুখেই শুনেছেন।'

-'দেখুন মানসী দেবী, আমরা এমন প্রমাণ পেয়েছি যার উপরে নির্ভর করে বলা চলে যে, হত্যাকারী বা তার সহকারী আছে এই বাড়ির ভিতরেই। এ সম্বন্ধে আপনার কোনো মতামত আছে?'

মানসীর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। থেমে থেমে বললে, 'আমার মতামত? আমার কী মতামত থাকতে পারে? এসব আমার ধারণাতেও আসে না। এ বাড়িতে এমন ভয়ানক মানুষ কেউ আছে বলে আমি বিশ্বাসই করি না।'

জয়ন্ত বললে, 'দ্বিজেনবাবু কীরকম লোক?'

মানসীর দুই ভুরু সংকুচিত হল-কেঁপে উঠল তার ওষ্ঠাধর। অভিভূত কণ্ঠে সে বললে, 'আপনারা কি তাকেই সন্দেহ করেন?'

-'যদি বলি করি?'

-'তাহলে মস্ত ভ্রম করবেন।'

-'কেন?'

-'দ্বিজেনবাবু হচ্ছেন দেবতা।'

-'হ্যাঁ, আপনার কাছে।'

-'না, যাকে জিজ্ঞাসা করবেন সেই-ই ওই কথা বলবে। প্রাণীহত্যার বিরোধী বলে তিনি আমিষ পর্যন্ত খেতে পারেন না। তিনি করবেন নরহত্যা। এমন কথা শুনলেও পাপ হয়। আপনার আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে?'

-'না। কিন্তু বললেন যে, আমি না ডাকলেও আপনাকে আজ আমার কাছে আসতে হত। কেন?'

-'আজ এমন একটা ব্যাপার হয়েছে যার কোনো অর্থই আমি খুঁজে পাচ্ছি না।'

-'ব্যাপারটা কী?'

-'আমার ঘরে একটা দেওয়াল আলমারি আছে। তার ভিতরে আটপৌরে কাপড়চোপড় রাখি। আজ সকালে খানকয় কাপড়ের ভিতর থেকে এই রুমালখানা পেয়েছি।' মানসী একখানা রুমাল বার করে এগিয়ে ধরলে।

জয়ন্ত রুমালখানা নিয়ে তার উপরে চোখ বুলিয়েই সোজা হয়ে উঠে বসল। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ পরীক্ষা করে বললে, 'মানিক, অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক রুমাল!'

মানিক হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করলে রুমালখানা। বললে, 'এর উপরে যে রক্তের দাগ আছে!'

-'হুঁ, কয়েকটা রক্তের ছোপ আর একটা আঙুলের ছাপ।'

মানসী চিন্তিতভাবে বললে, 'এখন বলুন জয়ন্তবাবু, আমার জামাকাপড়ের আলমারিতে ওই রক্তমাখা রুমালখানা কোত্থেকে এল? ও রুমাল তো আমার নয়!'

-'রুমালের কোনে ওই ধোপার চিহ্ন?'

-'ও চিহ্ন আমাদেরই ধোপার।'

-'তাহলে এখানা বাড়ির কোনো লোকেরই সম্পত্তি। কিন্তু এর মালিক যে কে, সেটা বিশেষ করে বোঝবার উপায়ই নেই। এরকম সাধারণ রুমাল রাম-শ্যাম সবাই ব্যবহার করে।'

মানিক বললে, 'কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, রাম-শ্যামের রুমাল নিজে মানসী দেবীর আলমারির ভিতরে বেড়াতে আসেনি, কে ওখানা রাখতে পারে ওখানে?'

জয়ন্ত বললে, 'তারপরের প্রশ্ন, কেনই বা ওখানে রাখবে?'

মানিক বললে, 'আরও একটা প্রশ্ন, রুমালখানা রক্তাক্ত কেন?'

জয়ন্ত বললে, 'আচ্ছা, পরে এসব প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করলেও চলবে। আপাতত এই অদ্ভুত আবিষ্কারের জন্যে মানসী দেবীকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। কে বলতে পারে ভবিষ্যতে এই রুমালখানাই আমাদের মামলার একটা প্রধান সূত্র হয়ে উঠবে না?'

মানসী সভয়ে বলে উঠল, 'আপনি কী বলছেন! আপনি কি বলতে চান সৌদামিনী দেবীর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে এই রুমালের কোনো সম্পর্ক আছে?'

-'থাকা অসম্ভব নয়।'

-'কেউ কি আমাকে বিপদে ফেলবার জন্যে ওখানা আমার আলমারির ভিতরে রেখে গিয়েছে?'

-'তাও অসম্ভব নয়।'

-'তবে আমি কী করব?'

-'আপনি কিছুই করবেন না, একেবারে চুপ মেরে যান। রুমালখানা কখনো যে চোখেও দেখেছেন সে কথা পর্যন্ত ভুলে যান।'

-'আর কারুকে ওর কথা বলব না?'

-'কারুকে না, কারুকে না। এমনকী দ্বিজেনবাবুকেও না।'

-'তাঁর কোনো বিপদ হবে না তো?'

-'মনে তো হয় না। আমি লক্ষ করে দেখেছি তিনি ব্যবহার করেন রঙিন রুমাল।'

-'হ্যাঁ জয়ন্তবাবু; তিনি বরাবরই রঙিন রুমাল ব্যবহার করে থাকেন।'

-'তাহলে এইখানেই সাঙ্গ হোক রুমাল পর্ব। এইবারে মানসী দেবী, ভালো করে মনে করে দেখুন দেখি হত্যাকাণ্ডের পর আপনার ঘরে কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে কি না?'

-'না।'

-'মনে করে দেখুন, মনে করে দেখুন। ঘটনা যতই তুচ্ছ হোক আমার কাজে লাগতে পারে।'

অল্পক্ষণ নীরবে ভাবতে ভাবতে মানসীর দুই চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বললে, 'আপনার কথায় আর একটা ছোটো ব্যাপার মনে পড়ছে। হত্যাকাণ্ডের পরের দিন সকাল বেলায় ওই জামাকাপড়ের আলমারির ঠিক তলাতেই মেঝের উপরে দেখেছিলুম তিন ফোঁটা রক্ত!'

-'তিন ফোঁটা রক্ত?'

-'হ্যাঁ, ঠিক তিন ফোঁটা।'

-'তারপর?'

-'কিন্তু সেজন্যে আমি বিস্মিত হইনি। আমার বিশ্বাস, কোনো আহত ইঁদুর কি বিড়ালের গা থেকেই সেই রক্তবিন্দুর সৃষ্টি হয়েছিল। তাই আমি জল ঢেলে দাগগুলো তুলে ফেলেছিলুম। ওই তিন ফোঁটা রক্তের কথা নিশ্চয়ই আপনার কাজে লাগবে না জয়ন্তবাবু!'

-'নিশ্চয়ই লাগবে! তিন ফোঁটা কেন, মাত্র এক ফোঁটা রক্তই আমার কাছে মহামূল্যবান! আলমারির ভিতরে রক্তাক্ত রুমাল, আলমারির বাইরে তিন ফোঁটা রক্ত! এই দুই রক্তচিহ্নের মধ্যে কি যোগাযোগ নেই? থাকা উচিত, থাকা উচিত!'

মানসী অস্বস্তি ভরা কণ্ঠে বললে, 'আপনার সব কথাই হেঁয়ালি বলে মনে হচ্ছে!'

-'হোক। তা নিয়ে আপনি একটুও মাথা ঘামাবেন না মানসী দেবী। আপনি কেবল মাথা ঘামিয়ে দেখুন, আর কোনো তুচ্ছ ঘটনার কথা আমাকে বলতে পারেন কি না!'

-'উঁহু, আর কিছুই ঘটেনি।'

-'ভাবুন, ভাবুন, ভাবুন!'

-'না জয়ন্তবাবু। . . . হ্যাঁ, একটা ব্যাপার . . . না, না, সেটা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপার।'

-'তবু আমি শুনতে চাই।'

-'আমার একটা সায়া খুঁজে পাচ্ছি না।'

-'সায়াটা কোথায় রেখেছিলেন?'

-'ঘরের আলনায়।'

-'কবে রেখেছিলেন?'

-'হত্যাকাণ্ডের দিনে। বৈকালে।'

-'কবে খুঁজেছিলেন?'

-'হত্যাকাণ্ডের পরের দিনেই।'

-'সকালে না বিকালে?'

-'সকালে।'

-'তাহলে হত্যাকাণ্ডের দিন বৈকাল থেকে রাত্রের মধ্যেই সায়াটা আপনার ঘর থেকে স্থানান্তরিত হয়েছে?'

-'আপনি দেখিয়ে দিলেন বলেই তাইতো এখন মনে হচ্ছে! বাড়িতে যে ভীষণ ঘটনা ঘটেছে, সায়াটার কথা আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলুম।'

-'আর কোনো তুচ্ছ ঘটনার কথা আপনার মনে পড়ছে?'

মিনিট তিন ভেবে-চিন্তে মানসী নিশ্চিন্তভাবে বললে, 'না, আর কিছুই ঘটেনি।'

-'বেশ, আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই। নমস্কার।'

মানসী চলে গেলে পর জয়ন্ত চুপ করে বসে বসে কী ভাবলে। তারপর বললে, 'মানসী দেবীর ঘরে যেসব ছোটো ছোটো তুচ্ছ ঘটনা ঘটেছে, স্থানকালপাত্র হিসাবে সেগুলো কতখানি বিস্ময়কর, ভালো করে ভেবে দেখো মানিক। ঠিক হত্যাকাণ্ডের সময়ে বা তার কিছু আগে কি কিছু পরে মানসীর ঘর থেকে হারিয়েছে একটা সায়া, ঘরের আলমারির তলায় পাওয়া গিয়েছে রক্তের দাগ আর হয়তো সেই সময়েই আলমারির ভিতরেও ঢুকেছে একখানা রক্তাক্ত রুমাল। আপাতত এগুলো অর্থহীন বলে বোধ হচ্ছে বটে। কিন্তু কিছু কিছু অর্থের সন্ধানও যেন এখনি পাওয়া যায়। মানসীর অজ্ঞাতসারেই খুব সম্ভব হত্যাকাণ্ডের রাত্রেই তার ঘরের ভিতরে একজন বাইরের লোকের আবির্ভাব হয়েছিল। প্রশ্ন-কে সে? শত্রু না মিত্র না হত্যাকারী? যেই-ই হোক, সে চুরি করেছে অসামান্য কিছু নয়-সামান্য একটা সায়া মাত্র। প্রশ্ন-কেন? স্ত্রীলোকের একটা সায়া তার কোন কাজে লাগতে পারে? অথবা সায়াটা বিশেষ করে মানসীর বলেই তার কাছে কি মূল্যবান? সায়াটা গেল কোথায়? অদূর ভবিষ্যতে বিশেষ কোনো কার্যসাধনের জন্যে সায়াটা কি আবার আমাদের দৃষ্টিগোচর হবে? মানসীর ঘরের ওই রক্তের দাগ। প্রশ্ন-কার সে রক্ত? সৌদামিনী দেবীর, না যে ঘরের মধ্যে অনধিকারপ্রবেশ করেছে তার নিজের? যারই হোক, এটা বোঝা যাচ্ছে যে, আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে সে একটা কিছু করছিল। প্রশ্ন-কী করছিল? রক্তাক্ত রুমালখানা স্থাপন করছিল আলমারির ভিতরে? কেন, কেন, কেন? নিজের রক্তাক্ত রুমাল মানসীর আলমারির ভিতরে রাখলে তার কী উপকার বা মানসীর কী অপকার হবার সম্ভাবনা? পাগলাগারদের বাসিন্দার মন বোঝবার চেষ্টার মতো এই শেষ প্রশ্নটার অর্থ অনুধাবন করবার চেষ্টাও হবে সমান দুশ্চেষ্টা!' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে পড়ে হঠাৎ আবার চিৎকার করে জয়ন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল-'হয়েছে, হয়েছে!'

মানিক সবিস্ময়ে বললে, 'খেপে গেলে নাকি? কী হয়েছে হে?'

-'আলমারির ভিতরে সে হস্তচালনা করেছিল মানসীর কোনো অনিষ্টসাধনের জন্যেই!'

-'রক্তাক্ত রুমালখানা ওখানে রাখার কারণ কি তাই?'

-'নিশ্চয়ই নয়! তার রক্তাক্ত রুমাল তো মানসীর বিরুদ্ধে না লেগে তার নিজের বিরুদ্ধেই কাজে লাগবে। রুমালখানা আলমারির ভিতরে পড়ে গিয়েছিল তার অজ্ঞাতসারেই। এ ছাড়া ও রুমালের কোনো মানেই হয় না!'

-'কিন্তু জয়ন্ত, আলমারির মধ্যে মানসীর পক্ষে অনিষ্টকারক কিছু পাওয়া গিয়েছে কি?'

-'কেন যে পাওয়া যায়নি সেইটেই তো বুঝতে পারছি না। কিন্তু বুঝব, বুঝব, শীঘ্র তাও বুঝব! মানিক হে। জল বেশ ফুটে উঠেছে, ভাত সিদ্ধ হতে আর বিলম্ব হবে না!'

সাত

দ্বিজেনের সৌভাগ্য

আসন্ন সন্ধ্যা। বাগানে আলো-আঁধারির খেলা। বড়ো বড়ো গাছের বুকের ভিতর থেকে ভেসে আসছে পাখিদের বেলাশেষের কলরব। আজকে চাঁদের ছুটির দিন। একটু পরেই অমামসী পাতবে অন্ধকারের আসর।

গোল টেবিলের ধারে বসে পবিত্রবাবুর সঙ্গে জয়ন্ত খেলছে দাবা বোড়ে। মানিক হচ্ছে নির্বাক দর্শক। উপর-চাল বলে দেবার উপায় নেই, কারণ তাহলেই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠবে জয়ন্ত।

এক বার, দুই বার, তিন বার জয়ন্ত করলে কিস্তিমাত। বললে, 'আমি একাসনে বসে চব্বিশ ঘণ্টা দাবা খেলতে পারি। কিন্তু আপনার কি আর খেলবার শখ আছে?'

-'আপত্তি নেই।' বললেন পবিত্রবাবু।

আবার ঘুঁটি সাজানো হল। পবিত্রবাবু প্রথম চাল চালতে যাচ্ছেন, এমন সময়ে দ্বিজেনের প্রবেশ।

জয়ন্ত স্মিত মুখে বললে, 'আসুন দ্বিজেনবাবু। বসুন। দাবার ছকের উপরে আমাদের দু-জনের যুদ্ধ দর্শন করুন। . . . কিন্তু না, আপনার মুখের ভাব তো ক্রীড়াকৌতুক দেখবার মতো নয়! হয়েছে কী?'

দ্বিজেন বললে, 'আপনার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে।'

-'গোপনে?'

-'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

-'পবিত্রবাবু তাহলে আজ আর যুদ্ধ নয়, আপাতত সন্ধি! আপনি নাহয় মানিকের সঙ্গে বাগানে গিয়ে বেড়াতে বেড়াতে খানিকটা গল্প করে আসুন।'

মানিক ও পবিত্রবাবুর প্রস্থান।

-'তারপর দ্বিজেনবাবু? এইবারে আপনি নির্ভয়ে কথার ঝুলি ঝাড়তে পারেন।'

-'আজ দু-টি খবর শুনবেন জয়ন্তবাবু। একটি শুভ আর একটি অশুভ।'

বাগানের দিকের বারান্দার উপরে ছিল তিনটে জানলা, একটা দরজা। একটিমাত্র জানলা খোলা ছিল। সেই জানলাটার দিকে তাকিয়ে জয়ন্ত উঠে দাঁড়াল। টেবিলের উপর থেকে একটা পাউডারের কৌটো তুলে নিয়ে বললে, 'একটু সবুর করুন দ্বিজেনবাবু, আমি এক মিনিটের মধ্যেই আসছি।' সে দরজা দিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে গেল।

মিনিট দেড়েক পরে ঘরে এসে আসন গ্রহণ করে জয়ন্ত বললে, 'আগে শুভ খবরটা কী শুনি।'

-'আমিই আবার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছি।'

জয়ন্ত চমৎকৃত হয়ে বললে, 'কেমন করে?'

-'জ্যাঠামশাই মারা গিয়েছেন।'

-'হীরেন্দ্রনারায়ণ রায়?'

-'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

-'হঠাৎ?'

-'হ্যাঁ, হার্টফেল করে।'

-'কোথায়?'

-'এলাহাবাদে।'

-'কিন্তু আইনত সম্পত্তির অধিকারী তিনি। কোনো উইল করে আপনাকে সম্পত্তি দিয়ে গিয়েছেন?'

-'না, তিনি সম্পত্তির অধিকারীই হননি।'

-'কীরকম?'

-'পিসিমার নুতন উইল হবার আগেই তিনি মারা পড়েছেন। কলকাতা থেকে কোনো কাজে তিনি পশ্চিমে যাচ্ছিলেন। ট্রেন যখন এলাহাবাদ স্টেশনে পৌঁছোয়, সেই সময়ে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা পড়েন।

-'এ খবর আপনি কবে পেয়েছেন?'

-'সবে আজকেই।'

-'তাঁর দেহ সনাক্ত করতে দেরি হয়। পুলিশ অনেক সন্ধান নেবার পর জানতে পারে, তিনি আমাদের আত্মীয়।'

-'বুঝলুম। সুসংবাদ বটে কিন্তু তবু আপনার মুখে আনন্দের লক্ষণ নেই কেন? জ্যাঠামশাইকে আপনি কি খুব ভালোবাসতেন?'

-'ভালোবাসার পথ তিনি রাখেননি। আমার কাছে তিনি ছিলেন প্রায় অপরিচিতের মতো। আমি পিসিমার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বলে আমাকে তিনি দারুণ ঘৃণা করতেন। আমার সঙ্গে বাক্যালাপ পর্যন্ত করতেন না। কেবল আমি নই, এ বাড়ির সকলেই ছিল তাঁর চক্ষুশূল। তিনি সম্পত্তির মালিক হলে এখানকার সকলকেই বিদায় নিতে হত। তাঁর মৃত্যুতে আমি আঘাত পাইনি। অবশ্য মৃত্যু মাত্রই দুঃখজনক, কিন্তু আত্মীয়বিয়োগে লোকে যেমন ব্যথা পায়, তাঁর মৃত্যুতে তেমন কোনো ব্যথা আমি অনুভব করিনি।'

-'তবে আপনার মুখ অমন বিরস কেন?'

দ্বিজেন ঘাড় হেঁট করে নীরবে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর মুখ তুলে করুণ স্বরে বললে, 'কিন্তু জয়ন্তবাবু, আমি বোধ হয় সম্পত্তি ভোগ করবার কোনো সুযোগই পাব না।'

জয়ন্ত চমকে উঠে বললে, 'সেকী!'

-'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি হতভাগ্য।'

-'এ আত্মলাঞ্ছনার অর্থ কী?'

-'বলছি। কিন্তু তার আগে জিজ্ঞাসা করি, হত্যাকারীর কোনো সন্ধান আপনি পেয়েছেন কি?'

সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে জয়ন্ত বললে, 'ঃউ, বড্ড গুমোট মনে হচ্ছে! দাঁড়ান, জানলার পর্দাটা খুলে দিয়ে আসি, ঘরের ভিতরে বাইরের বাতাস চলাফেরা করুক।'

পর্দাটা টেনে সরিয়ে দিয়ে সে ফিরে এসে বললে, 'হ্যাঁ, কী বলছেন দ্বিজেনবাবু? খুনির সন্ধান আমরা পেয়েছি কি না? হ্যাঁ, আমরা জানি যে খুনি সে এই বাড়িরই লোক।'

-'অসম্ভব, খুনিকে আপনারা জানেন না!'

-'হঠাৎ অতটা নিশ্চিত হচ্ছেন কেন দ্বিজেনবাবু? খুনির আরও কোনো কীর্তির পরিচয় আমরা পেয়েছি।'

-'কীরকম কীর্তি?'

-'আমরা জানি যে এখানকার হত্যাকাণ্ডের পরের দিন সকালে মানসী দেবীর ঘরের মেঝেতে রক্তের দাগ পাওয়া যায়।'

দ্বিজেন বিকৃত স্বরে বললে, 'হতেই পারে না, হতেই পারে না!'

-'মানসী দেবী নিজেই এ কথা আমাদের কাছে স্বীকার করেছেন।'

-'মানসী মিথ্যেকথা বলেছে।'

-'কেন তিনি মিথ্যেকথা বলবেন?'

-'তা আমি জানি না। কিন্তু সে মিথ্যেকথা বলেছে। বেশ, আপনারা কী জানেন, বা জানেন বলে মনে করেন?'

-'খুনি কোন অস্ত্র ব্যবহার করেছে তাও আমাদের অজানা নেই।'

দ্বিজেন হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞাসা করলে, 'কোন অস্ত্র?'

-'ছত্রপতির ছোরা।'

-'এই নিন ছত্রপতির ছোরা!' দ্বিজেন একখানা কোষবদ্ধ ছোরা টেবিলের উপরে স্থাপন করলে।

আট

হত্যাকারীর স্বীকারোক্তি

জয়ন্ত টেবিলের উপর থেকে ছোরাখানা তুলে নিলে এবং ভাবহীন মৌনমুখে পরীক্ষা করতে লাগল।

খাপ রৌপ্যখচিত চামড়ায় তৈরি। ছোরার হাতল হাতির দাঁতের, তার উপরে মূল্যবান পাথর-বসানো সোনার কাজ। ফলা নীল ইস্পাতের, সাত ইঞ্চি লম্বা। ফলার উপরে শুকনো রক্তের দাগ।

ছোরাখানা আবার কোষবদ্ধ করে টেবিলের উপরে রেখে দিয়ে জয়ন্ত বেশ সহজ স্বরেই জিজ্ঞাসা করলে, 'ছোরাখানা কোথায় পেলেন?'

-'ঠাকুরদাদার লাইব্রেরি থেকে।'

-'এতদিন এখানা কোথায় ছিল?'

-'আমার কাছে।'

-'তারপর?'

-'তারপর আর বিশেষ কিছু বলবার নেই। ওই ছোরা দিয়ে আমি পিসিমাকে খুন করেছি।'

পূর্ণ এক মিনিটকাল ধরে জয়ন্ত নীরবে দ্বিজেনের মুখের পানে তাকিয়ে রইল মর্মভেদী দৃষ্টিতে-যেন সে তার মনের সমস্ত গুপ্তকাহিনি বাইরে আকর্ষণ করে আনতে চায়। তারপর নীরস হাস্য করে বললে, 'কেন এ পাপ করলেন?'

দ্বিজেন উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, 'করব না? কেন করব না? পিসিমা কি আমার মুখ তাকিয়েছিলেন? তিনি আমাকে পথের ভিখারি করতে চেয়েছিলেন বিনা অপরাধে! কেবল আমাকে নয়, মানসীকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করে আবার তা কেড়ে নিতে চেয়েছিলেন। কেন আমি হাত-পা গুটিয়ে এসব অত্যাচার সহ্য করব? কোনো মানুষই তা পারে না। পিসিমা বৃদ্ধা, বিধবা, সন্তানহীনা। পৃথিবীর পক্ষে একেবারে ব্যর্থজীব। তাঁকে ইহলোক থেকে সরিয়ে দিলে পৃথিবীর কোনো অপকারই হবে না। আমাদের তরুণ জীবনকে সার্থক করে তোলবার জন্যে তাঁকে হত্যা করা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। অবশ্য যদি তখন জানতুম যে তার আগেই নতুন উইল হয়ে গেছে, তাহলে বোধ হয় অকারণে হত্যা করে আমার হাত করতুম না কলঙ্কিত। কিন্তু তখন আমি তা জানতুম না-আমি তা জানতুম না!'

জয়ন্ত অবিচলিতভাবে বললে, 'দ্বিজেনবাবু, আপনার কথাগুলি বেশ যুক্তিপূর্ণ।'

-'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি হত্যা করেছি বটে, কিন্তু যুক্তিহীন হত্যা করিনি।'

-'এখন কী করবেন?'

-'আপনাদের কাছে আত্মসমর্পণ করব।'

-'তার কী ফল হবে জানেন?'

-'জানি। ফাঁসি।'

-'ওই কি আপনার কামনা?'

-'দোষ স্বীকারের পর কোন খুনি জীবনের আশা করে?'

-'আপনার মৃত্যুর পর মানসী দেবীর কী অবস্থা হবে সেটাও ভেবে দেখেছেন বোধ হয়?'

অন্তরের মধ্যে যেন চরম আঘাত পেয়ে দ্বিজেন শিউরে উঠল। ভগ্নস্বরে বললে, 'সে কথা ভাবলেও আমি পাগল হয়ে যাব।'

-'মানসী দেবী এ কথা শুনলে কী বলবেন?'

-'আত্মহত্যা করবে।'

-'তবে?'

-'দোহাই জয়ন্তবাবু, এখন আর মানসীর কথা আমাকে মনে করিয়ে দেবেন না। আমি তাকে একেবারে ভুলে যেতে চাই!'

-'ভোলা কি এতই সহজ?'

-'না, সহজ নয়। কিন্তু তা ছাড়া উপায় কী?'

-'কোনো উপায়ই কি নেই?'

-'কোনো উপায় নেই, কোনো উপায় নেই! . . . না, না, এক উপায় আছে বটে! কিন্তু, কিন্তু তা অসম্ভব।'

-'কী অসম্ভব দ্বিজেনবাবু?'

-'আপনি কি আমাকে মুক্তি দিতে রাজি আছেন?'

-'অপরাধ স্বীকারের পরেও আপনি আমার কাছ থেকে মুক্তি প্রার্থনা করছেন!'

-'নিজের জন্যে করছি না, মানসীর জন্যে করছি, আমার মরা-বাঁচার উপরেই তার মরা-বাঁচা নির্ভর করছে জয়ন্তবাবু!'

-'সব বুঝি। কিন্তু কী করে আমি আপনাকে মুক্তি দিতে পারি?'

-'আপনি সরকারি গোয়েন্দা নন। আমি অনুভব করতে পারছি, আমার উপরে আপনার সহানুভূতি আছে।'

-'কিন্তু কী করে আপনাকে মুক্তি দেব তাই বলুন।'

-'আপনি ছাড়া আর কেউ জানে না, আমি খুনি।'

-'তা জানে না বটে। কিন্তু পুলিশকে ওই কথা জানানোই হচ্ছে আমার কর্তব্য।'

-'পুলিশের শক্তিতে আমার আস্থা নেই। আপনি যদি মামলার ভার ত্যাগ করেন, তাহলে আমি নিশ্চয়ই রক্ষা পাব।'

-'কিন্তু অক্ষম বলে আমার দুর্নাম হবে।'

-'যেটুকু দুর্নাম হবে, তার বিনিময়ে আপনি কিছু লাভ করতেও পারেন।'

-'কী লাভ?'

-'অর্থ।'

-'তার মানে?'

-'জয়ন্তবাবু, ভেবে দেখুন। দু-দিন পরেই আমি বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হব। আপনি যদি এই মামলাটা ছেড়ে দেন তাহলে কোনদিক দিয়ে লাভবান হবেন, বুঝতে পারছেন?'

-'আপনি আমাকে ঘুষ দিতে চান!'

-'ঘুষ নয় জয়ন্তবাবু, আমার কৃতজ্ঞতার দান।'

-'উত্তম। কত টাকা আপনি দিতে পারেন?'

-'আপনিই বলুন।'

-'পাঁচ হাজার টাকা?'

-'আরও বাড়িয়ে বলুন।'

-'দশ হাজার টাকা?'

-'তাও উল্লেখযোগ্য হল না।'

-'পনেরো হাজার টাকা?'

-'না।'

-'আমি আপনাকে পঁচিশ হাজার টাকা দিতে পারি-যদিও আমার জীবনের দাম আরও ঢের বেশি হওয়া উচিত।'

-'টাকাটা কবে দেবেন?'

-'তারিখ না দিয়ে আজকেই আমি চেক লিখে দিচ্ছি। সম্পত্তি হাতে এলেই আপনার টাকা পাবেন।'

-'তাই সই। লিখুন চেক।'

দ্বিজেন হেঁট হয়ে চেক লিখতে বসল। জয়ন্ত হাসলে মুখ টেপা হাসি।

-'আপনি আমাকে বাঁচালেন জয়ন্তবাবু। চেকখানা গ্রহণ করুন। এতক্ষণ চোখে অন্ধকার দেখছিলুম।'

-'এইবারে চোখে আলো দেখতে পেয়েছেন শুনে সুখী হলুম। অঃতপর প্রথমেই আপনাকে একটি কাজ করতে হবে।'

-'আজ্ঞা করুন।'

-'ছত্রপতির ছোরাখানা আবার যথাস্থানে রেখে আসুন।'

-'এখনি রেখে আসছি। নমস্কার।'

-'নমস্কার।'

নয়

ঘুষখোর জয়ন্ত

দ্বিজেনের প্রস্থানের পর জয়ন্ত মিনিট পাঁচেক চুপ করে বসে রইল। তারপর উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলে, 'মানিক!'

পাশের ঘর থেকে সাড়া এল, 'আসছি।'

অনতিবিলম্বে মানিকের সঙ্গে সুন্দরবাবুর প্রবেশ।

জয়ন্ত বললে, 'এই যে সুন্দরবাবু। কতক্ষণ?'

'বেশ খানিকক্ষণ। মানিকের মুখে শুনলুম দ্বিজেনের সঙ্গে তোমার নাকি গোপন পরামর্শ চলছিল?'

-'ঠিক পরামর্শ নয় সুন্দরবাবু, খুনি নিজের মুখে দোষ স্বীকার করে গেল।'

সুন্দরবাবু চমকে উঠে বললেন, 'খুনি! কে খুনি?'

-'দ্বিজেন।'

-'দ্বিজেন খুনি!'

-'তাই তো সে বলে গেল।'

-'আর তাকে তুমি ছেড়ে দিলে?'

-'তা দিলুম বই কী!'

-'দিলুম বললেই হল? রোসো, দেখছি তাকে!'

সুন্দরবাবু প্রস্থানোদ্যত।

-'আরে মশাই, শ্রবণ করুন, শনৈঃ পন্থাঃ শনৈঃ কন্থাঃ শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনম! ধীরে দাদা, ধীরে!'

-'না, না, ধীরে-টিরে নয়, আমার এখন বেগে ধাবমান হওয়া উচিত দ্বিজেনের দিকে।'

-'আমি কারুকেই দ্বিজেনকে গ্রেপ্তার করতে দেব না।'

-'দেবে না কীরকম?'

-'সে আমাকে কী দিয়েছে দেখুন।'

-'চেক?'

-'হ্যাঁ, পঁচিশ হাজার টাকার চেক।'

-'হুম, ঘুষ!'

-'ঠিক তাই।'

-'হুম, হুম, হুম! মানিক, তোমার বন্ধুর কী অঃধপতন হয়েছে দেখো।'

মানিকের মুখের উপরে ফুটে উঠল দারুণ অভিযোগের ভাব।

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, 'যা মন্দার বাজার পড়েছে, লোভ সামলাতে পারলুম না ভাই!'

মানিক প্রায় অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, 'জয়ন্ত তোমার মৃত্যুই শ্রেয়।'

সুন্দরবাবু ঝাঁঝালো গলায় বললেন, 'পোড়ার মুখে হাসতে লজ্জা করছে না তোমার?'

-'আগে আমার সব কথা শুনুন। তারপর বিচার করুন আমার হাসা উচিত কি না!'

-'যা বলবার বলো। কিন্তু জেনে রেখো, তোমার সব কথা শোনবার পরও দ্বিজেনকে আমি গ্রেপ্তার না করে ছাড়ব না।'

মানিক বললে, 'আমারও ওই মত।'

জয়ন্ত বললে, 'ছিঃ বন্ধু, তুমিও শত্রু-শিবিরে?'

-'আমি ঘুষখোরের বন্ধু নই।'

জয়ন্ত সশব্দে ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললে, 'বেশ, তাহলে আমার কথাই শোনো।' সে দ্বিজেনের সঙ্গে তার যে কথোপকথন হয়েছিল, গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত বর্ণনা করে গেল। কখনো সবিস্ময়ে, কখনো ক্রুদ্ধ ভাবে, কখনো ঘৃণাভরে সুন্দরবাবু শ্রবণ করলেন তার কথা।

জয়ন্ত বললে, 'এই তো ব্যাপার। এখন আমার কী করা উচিত?'

মানিক বললে, 'গলায় দড়ি দাও।'

-'সুন্দরবাবুর মত কী?'

-'তোমার কী করা উচিত, আমি কী জানি? তবে আমার যা উচিত তাই করতে চললুম।'

-'কোথায় চললেন মশাই?'

-'দ্বিজেনকে গ্রেপ্তার করতে।'

-'যাবেন না, যাবেন না।'

-'আলবত যাব, আলবত যাব!'

-'দ্বিজেনকে গ্রেপ্তার করতে পারবেন না, পারবেন না, পারবেন না।'

-'কেন তুমি ঘুষ খেয়েছ বলে?'

-'না, অন্য কারণে।'

-'কারণটা কী শুনি।'

-'দ্বিজেন হত্যাকারী নয়!'

জয়ন্তের মুখের পানে চেয়ে হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন সুন্দরবাবু। মানিকেরও সেই ভাব।

জয়ন্ত উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের ভিতরে পায়চারি করতে করতে গম্ভীর স্বরে বললে, 'হ্যাঁ, দ্বিজেন হচ্ছে নিরপরাধ। কেউ তাকে গ্রেপ্তার করতে পারবে না।'

সুন্দরবাবু আমতা আমতা করে বললেন, 'তবে কি এতক্ষণ তুমি মশকরা করছিলে? দ্বিজেন অপরাধ স্বীকার করেনি?'

-'দ্বিজেন অপরাধ স্বীকার করেছে।'

-'পাগলের মতো তুমি কী বলছ জয়ন্ত।'

-'মানসী দেবীর আলমারির ভিতরে যে রক্তমাখা রুমালখানা পাওয়া গেছে সেখানা তো এখন আপনার কাছেই আছে?'

-'আছে।'

-'সেখানা সাধারণ সাদা রুমাল। দ্বিজেন ওরকম রুমাল ব্যবহার করে না। আমার দৃঢ়বিশ্বাস সে রুমালখানা খুনিরই সম্পত্তি। দ্বিজেন খুনি হলে মানসীকে বিপদে ফেলবার জন্যে রুমালখানা কখনোই তার আলমারির ভিতরে রেখে আসত না, কারণ মানসীকে সে ভালোবাসে, তাকে বিবাহ করবার জন্যে সে সমস্ত সম্পত্তি থেকে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত হতে বসেছিল। মানসীকে সে বিপদে ফেলতে পারেই না। আর ওই রুমালখানা তার নিজের হলেও ওখানা সে আলমারির ভিতরে রেখে আসত না, কারণ তাহলে তার নিজেরই বিপদের সম্ভাবনা। যেচে বিপদে পড়বে বলে কেন সে নিজের রুমাল মানসীর আলমারির ভিতরে স্থাপন করবে?'

মানিক বললে, 'তোমার তো বিশ্বাস, রুমালখানা তার মালিকের অজ্ঞাতসারেই আলমারির ভিতরে পড়ে গিয়েছে।'

-'হ্যাঁ। কিন্তু রুমালের মালিক হত্যাকাণ্ডের পরে মানসীর আলমারির ভিতরে হাত চালাতে গিয়েছিল কেন, অনুমান করতে পারেন সুন্দরবাবু?'

-'উহুঁ! না, না, আলমারির ভিতর থেকে হয় সে কিছু নিতে, নয় ওখানে কিছু রাখতে গিয়েছিল।'

-'মানসীর আলমারিতে হত্যাকারীর পক্ষে দরকারি কী থাকতে পারে? মানসীর একটা সায়া সেইখানেই হারিয়েছিল বটে, কিন্তু সেটা ছিল আলমারির বাইরে আলনার উপরে। আমার মনে হয় হত্যাকারী কিছু রাখতেই গিয়েছিল।'

-'সেটা কী হতে পারে?'

-'হয়তো ছত্রপতির ছোরা।'

-'আরে, ছোরাখানা তো আছে দ্বিজেনের কাছে।'

-'তা থাকতে পারে।'

-'আর সে নিজের মুখেই তো তোমার কাছে অপরাধ স্বীকার করেও গিয়েছে!'

-'তা করতে পারে।'

-'তবু বলবে সে অপরাধী নয়?'

-'তবু বলব সে অপরাধী নয়। তার মুখ-চোখ, ভাবভঙ্গি, কথার ধরনধারণ-সব প্রকাশ করে দিচ্ছিল, সে অপরাধী নয়। এত অভিজ্ঞতার পরও কি আমার মানুষ চেনবার শক্তি হয়নি? দ্বিজেন মিছেকথা বলছিল।'

-'এমন বিপদজনক মিছে কথা কেউ কখনো বলে জয়ন্ত? এ তো আত্মহত্যার শামিল!'

-'দ্বিজেন কেন যে এমন আশ্চর্য মিছে কথা বলে গেল, তার কারণও আমি আন্দাজ করতে পারছি।'

-'কারণটা কী বলো না!'

-'এখনও বলবার সময় হয়নি।'

-'দ্বিজেন যদি নিরপরাধ হয়, তাহলে এই খুনের জন্যে দায়ী কে হতে পারে? হীরেন্দ্রনারায়ণ? কিন্তু সে তো এখন আমাদের নাগালের বাইরে!'

-'খুনি সম্বন্ধেও কিছু কিছু ধারণা করতে পারছি। কিন্তু ধারণা এখনও প্রকাশ করবার মতো স্পষ্ট হয়নি।'

-'তুমি কি মনে কর, দ্বিজেন তার পিতৃব্যের গৌরবরক্ষার জন্যেই এমন নির্বোধের মতো মিছে কথা বলেছে?'

-'ওসব কথা এখন থাক। আপাতত এক কাজ করতে হবে আপনাকে। এই বাড়ির প্রত্যেক লোকের ডান হাতের আঙ্গুলের ছাপ তুলে নিতে হবে-এমনকী ঝি চাকর দ্বারবান সকলেরই।'

-'আজই?'

-'আজই। তারপর সেগুলো নিয়ে কী করতে হবে, আপনাকে বলা বাহুল্য। কিছু বক্তব্য থাকলে ফোনে জানাবেন। কাল সন্ধ্যার আগে আবার এখানে আপনার দেখা পেতে চাই। খুব সম্ভব সেই সময়েই হত্যাকারীকে আপনার গ্রাসে সমর্পণ করতে পারব।'

-'বল কী হে, তুমি এতটা নিশ্চিত?'

-'হ্যাঁ সুন্দরবাবু। এইবারে আমার সঙ্গে বারান্দায় গিয়ে কিঞ্চিত বিশুদ্ধ বায়ু ভক্ষণ করবেন?'

-'আচমকা এ আবার কী খেয়াল?'

-'চলুন না। ঘুঘু দেখাতে পারব না বটে, কিন্তু ফাঁদ দেখাতে পারব।'

-'তোমার সবই হেঁয়ালি। চলো।'

বাইরে গিয়ে সুন্দরবাবু এদিকে-ওদিকে দৃষ্টি চালনা করে বললেন, 'বাবা, বাইরে তো দেখছি খালি অমাবস্যার অন্ধকার!'

-'এই যে, আমি অন্ধকারে আলোকপাত করবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই এসেছি।' একটা জানলার কাছে এগিয়ে জয়ন্ত টর্চ টিপে নীচে ফেললে আলো।

-'দেখুন সুন্দরবাবু।'

-'জানলার তলায় সাদা মতন কী ছড়ানো রয়েছে হে?'

-'পাউডারের গুঁড়ো। গুঁড়োর মাঝখানে কী দেখছেন?'

-'আরে, পায়ের দাগ না?'

-'হ্যাঁ, হত্যাকারী কিংবা তার সহকারীর পদচিহ্ন।'

'হুম!' বলে সুন্দরবাবু হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বিস্ফারিত চক্ষে পদচিহ্ন পরীক্ষা করতে লাগলেন।

মানিক বললে, 'ছোটো খালি পায়ের দাগ। দেখে মনে হয় স্ত্রীলোকের পা।'

জয়ন্ত বললে, 'সে বিচার করব ছাঁচ তোলবার পর।'

সুন্দরবাবু শুধোলেন, 'ঠিক এইখানেই যে কারুর আবির্ভাব হবে, তুমি কেমন করে জানলে জয়ন্ত?'

-'কোনো মূর্তি আগেও এখানে আড়ি পাততে এসেছেন। আন্দাজে ধরেছিলুম, আজও তিনি দয়া করে আসবেন। অন্য জানলা দুটো বন্ধ করে এইটাই খালি খোলা রেখেছিলাম, যাতে ওইখানেই তাঁর উদয় হয়। তবে বেশিক্ষণ তাঁকে দাঁড়াতে দিইনি, পর্দা সরাতেই তিনি চম্পট দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর কাল পূর্ণ হয়ে এসেছে, আর তিনি আমাদের ফাঁকি দিতে পারবেন না।'

দশ

অভিনয়ের আয়োজন

পরের দিন সকাল বেলায় জয়ন্ত চা পানের পর বাড়ির ভিতর দিকের বারান্দায় পায়চারি করছে, এমন সময়ে দুই জন বেয়ারার সঙ্গে পবিত্রবাবুর আবির্ভাব।

জয়ন্ত শুধোলেন, 'কী পবিত্রবাবু, বেয়ারা নিয়ে কোথায় চলেছেন?'

-'আর কোথায়, লাইব্রেরিতে! আজ যে লাইব্রেরি সাফ করবার দিন।'

-'আপনি তো খুবই কর্তব্যপরায়ণ দেখছি। সৌদামিনী দেবী স্বর্গে, পৃথিবীতে বসে এখনও আপনি তাঁর আদেশ পালন করছেন!'

-'হপ্তায় একদিন করে লাইব্রেরি সাফ করাতে হবে, এই ছিল তাঁর আদেশ। এখনও তাঁরই অন্ন খাচ্ছি, তাঁর আদেশ পালন করব না! কিন্তু এ বাড়িতে আমার অন্ন এইবারে বোধ হয় উঠল। সৌদামিনী দেবীকে খুন করে কোন পাষণ্ড আমারও সর্বনাশ করলে!'

-'কেন পবিত্রবাবু?'

-'নতুন মনিব আমার মতো বুড়ো ঘোড়াকে আর কি কাজে বহাল রাখতে চাইবেন? সৌদামিনী দেবীর মৃত্যু, আমাদেরও সর্বনাশ! সবই নিয়তির খেলা! আসি মশাই!' অত্যন্ত দুঃখিতভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে পবিত্রবাবু অগ্রসর হলেন লাইব্রেরির দিকে।

পবিত্রবাবুর গমনপথের দিকে তাকিয়ে জয়ন্ত অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, নুতন মনিব বলতে উনি কাকে বুঝেছেন? হীরেন্দ্রনারায়ণ না দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ?

লাইব্রেরিঘরের ভিতর থেকে পবিত্রবাবুর উত্তেজিত কণ্ঠের সাড়া পাওয়া গেল-'জয়ন্তবাবু, জয়ন্তবাবু!'

জয়ন্ত চেঁচিয়ে বললে, 'কী পবিত্রবাবু?'

-'শিগগির একবার এদিকে আসুন!'

শীঘ্র যাবার কোনো চেষ্টাই করলে না জয়ন্ত। ব্যাপারটা আন্দাজ করে মনে মনে হেসে সে ধীরে ধীরে লাইব্রেরির ভিতরে গিয়ে হাজির হল। যা ভেবেছে তাই! শোকেসের পাশে পবিত্রবাবু থ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর মুখ-চোখ উদভ্রান্তের মতো।

জয়ন্ত বললে, 'কী হল মশাই? আপনি সৌদামিনী দেবীর প্রেতাত্মা দেখেছেন নাকি?'

-'তা দেখলেও আমি অতটা অভিভূত হতুম না। কিন্তু যা তাঁকে প্রেতাত্মায় পরিণত করেছে, চোখের সামনে আমি তাই-ই দেখছি।'

-'মানে?'

-'ছত্রপতির ছোরা, হত্যার দিন যা অদৃশ্য হয়েছিল, হত্যার পরে আবার তা যথাস্থানে ফিরে এসেছে!'

-'কী করে জানলেন যে ওই ছোরা দিয়েই সৌদামিনী দেবীকে খুন করা হয়েছে?'

-'সেদিন তো আপনারাই এই সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন!'

-'তা বটে। কিন্তু সে কেবল সন্দেহ! নিশ্চিতভাবে কিছুই বলিনি।'

-'কিন্তু ঠিক ঘটনার দিনে ছোরাখানা চুরিই বা গেল কেন, আর চোরে আবার তা ফিরিয়েই বা দিলে কেন?'

-'এটা ভাববার কথা বটে।'

-'তবে কি হত্যাকারী এখনও এই বাড়ির ভিতরেই বাস করছে?'

-'থাকতেও পারে।'

-'বাপরে, বলেন কী মশাই?'

-'ছোরাখানা শোকেসের ভিতর থেকে বার করুন দেখি!'

পবিত্রবাবু শিউরে উঠে বললেন, 'আমি মরে গেলেও পারব না।'

-'কেন?'

-'যদি ওর উপরে এখনও সৌদামিনী দেবীর রক্ত লেগে থাকে? ও ছোরা স্পর্শ করলেও মহাপাপ!'

-'তাহলে ও ছোরা ছুঁয়ে কাজ নেই। আপনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকুন। আমি বাগানে একটু বেড়িয়ে আসি।'

পবিত্রবাবু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। জয়ন্ত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দুপুর বেলায় খাওয়া-দাওয়ার পর জামাকাপড় পরে জয়ন্ত বললে, 'মানিক, আমি একবার অ্যাটর্নি হরিদাস চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করে আসি।'

যথাসময়ে হরিদাসবাবুর কাছে গিয়ে জয়ন্ত আত্মপরিচয় দিলে।

সাদর সম্ভাষণ করে হরিদাসবাবু শুধোলেন, 'আমি আপনার কী করতে পারি?'

-'সৌদামিনী দেবীর নতুন উইলখানা একবার দেখতে চাই।'

-'অনায়াসে দেখতে পারেন। কিন্তু জানেন তো সেখানা ব্যর্থ উইল? হীরেন্দ্রনারায়ণ রায় মারা পড়েছেন?'

-'জানি।'

উইল এল। তার উপরে চোখ বুলোতে বুলোতে জয়ন্ত বললে, 'একজন সাক্ষী তো দেখছি আমাদের পবিত্রবাবু। দ্বিতীয় সাক্ষীটি কে?'

হরিদাসবাবু বললেন, 'আমার কেরানি।'

-'সৌদামিনী দেবীর প্রথম উইলখানা এখনও আছে তো?'

-'আছে বটে, কিন্তু এতদিন ওর অস্তিত্ব থাকবার কথা নয়।'

-'কেন?'

'উইলখানা তাঁকে আর একবার দেখিয়ে আমাকে নষ্ট করে ফেলতে বলা হয়েছিল। কিন্তু দেখাবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাই সেখানা এখনও বর্তমান আছে।'

-'সে উইলখানাও একবার দেখতে পাই কি?'

-'সেখানা আপনার কোনো কাজে লাগবে বলে মনে হয় না।'

-'তবু একবার দেখতে দোষ কী?'

-'তবে দেখুন।'

পুরাতন উইলখানা আনানো হল। জয়ন্ত সেখানা পাঠ করে ফিরিয়ে দিলে।

হরিদাসবাবু হেসে বললেন, 'দেখছেন তো, ওখানা আপনার পক্ষে একেবারে অকেজো কাগজ?'

জয়ন্ত পকেট থেকে রুপোর শামুকদানী বার করে দুই টিপ নস্য নিয়ে বললে, 'না হরিদাসবাবু, উইলখানা দেখবার সুযোগ পেয়ে বড়োই উপকৃত হলাম!'

-'উপকৃত হলেন?'

-'আজ্ঞে হ্যাঁ, অত্যন্ত!'

-'কোন দিক দিয়ে যে উপকৃত হলেন, কিছুই বুঝতে পারছি না।'

-'সেটা এখনও বলবার সময় হয়নি, ক্ষমা করবেন। কিন্তু এইটুকু জেনে রাখুন, প্রথম উইলখানা দেখতে পেলুম বলেই আমার এখানে আসা সার্থক হল। আপনি আমাকে অন্ধকারে আলো দেখালেন। ধন্যবাদ, আপনাকে ধন্যবাদ! নমস্কার!'

বাসায় ফিরে এসে জয়ন্ত দেখলে মানিকের সঙ্গে দাবা খেলবার জন্যে ছকের উপরে ঘুঁটি সাজাচ্ছেন পবিত্রবাবু।

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, 'পবিত্রবাবু, নতুন উইলের সময়ে আপনি যে সাক্ষী ছিলেন, এ কথা তো জানতুম না!'

পবিত্রবাবু বললেন, 'ও কথা তো এ বাড়ির সবাই জানে! এ বাড়িতে আমি ছাড়া উইলের সাক্ষী হবে কে? আমি হচ্ছি সৌদামিনী দেবীর বিশ্বস্ত পুরাতন কর্মচারী।'

-'বুঝলুম। কিন্তু দ্বিজেনবাবুকে আপনি একরকম কোলে-পিঠে করেই মানুষ করেছেন। তাঁকে কি আপনি ভালোবাসেন না?'

-'বলেন কী, ভালোবাসি না আবার? নিজের মতো ভালোবাসি!'

-'তাহলে সৌদামিনী দেবী যখন দ্বিজেনবাবুকে সমস্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে উদ্যত হন, তখন আপনি তাঁকে বাধা দেননি কেন?'

-'যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলাম মশাই, যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলাম। আপনি সৌদামিনী দেবীকে তো জানেন না! তিনি ছিলেন তৈলপক্ক বাঁশের মতো-এতটুকু নোয়ানো অসম্ভব। আমাকে দ্বিজেনের পক্ষ গ্রহণ করতে দেখেই তিনি অগ্নিমূর্তি ধারণ করে যেসব কথা বললেন, আর তারপর যা করলেন, সেসব কথা আর প্রকাশ না করাই ভালো!'

জয়ন্ত বললে, 'আপনি কর্তব্যপালন করেছেন শুনে সুখী হলুম। যাক। এখন আপনি একটি কার্যভার গ্রহণ করবেন?'

-'কেন পারব না? আপনার অনুরোধ তো আদেশ!'

-'আজ সন্ধ্যার আগে কোনো একটা বড়ো ঘরে বাড়ির সবাইকে এনে জড়ো করতে পারবেন?'

-'পারব। কিন্তু কেন বলুন দেখি?'

-'একটা অভিনয় হবে।'

-'কারা অভিনয় করবে?'

-'আমরা সকলেই।'

এগারো

অপূর্ব অভিনয়

একখানা হলঘর। একদিকে পাশাপাশি উপবিষ্ট জয়ন্ত, মানিক, সুন্দরবাবু ও কয়েকজন পুলিশ-কর্মচারী। আর একদিকে দেখা যাচ্ছে দ্বিজেন, পবিত্রবাবু, মানসী, সুরবালা, উমাতারা, সিন্ধুবালা, বিন্দুবালা এবং বাড়ির কয়েকজন ভৃত্য ও দারোয়ান।

সুন্দরবাবু বললেন, 'তাহলে জয়ন্ত, তুমিই পালা শুরু করো।'

জয়ন্ত গাত্রোত্থান করে বললে, 'দ্বিজেনবাবু অনুগ্রহ করে এগিয়ে আসবেন কি?'

দ্বিজেন অগ্রসর হয়ে জয়ন্তের কাছে এসে দাঁড়াল। তার দৃষ্টি সন্দেহপূর্ণ, ভাবভঙ্গি সংকুচিত।

জয়ন্ত বললে, 'দ্বিজেনবাবু, সৌদামিনী দেবীকে হত্যা করেছে কে?'

দ্বিজেন হতভম্ব হয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

-'সৌদামিনী দেবীকে হত্যা করেছে কে? আপনি?'

দ্বিজেনের মুখ নীরব, মাথা নত।

জয়ন্ত কঠোর কণ্ঠে বললে, 'এখন কি ও কথা আপনি অস্বীকার করতে চান? কিন্তু মনে রাখবেন, আপনি নিজেই আমার কাছে অপরাধ স্বীকার করেছেন!'

দ্বিজেন মৃদু স্বরে বললে, 'আমার কিছুই বক্তব্য নেই।'

ওপাশ থেকে পবিত্রবাবু বলে উঠলেন, 'অসম্ভব! দ্বিজেন কিছুতেই হত্যাকারী হতে পারে না।'

জয়ন্ত গম্ভীর স্বরে বললে, 'স্তব্ধ হোন পবিত্রবাবু! আপনারা কেউ আমাকে বাধা দেবেন না। দ্বিজেনবাবু যে হত্যাকারী নন আমি তা জানি।'

দ্বিজেন ভয়ে ভয়ে মুখ তুলে তাকালে। জয়ন্তের আসল উদ্দেশ্য যে কী, আন্দাজ করতে পারছে না সে!

জয়ন্ত বললে, 'আমি জানি দ্বিজেনবাবু হত্যাকারী নন। আমি জানি হত্যাকারী কে। দ্বিজেনবাবু মিথ্যা বলেছেন। তিনি কে দ্বিজেনবাবু?'

দ্বিজেনের সর্বশরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল।

-'তিনি কে দ্বিজেনবাবু?'

দ্বিজেন প্রাণপণে কোনোরকমে বলে উঠল, 'দয়া করুন জয়ন্তবাবু, দয়া করুন!'

অট্টহাস্য করে জয়ন্ত বললে, 'দয়া! বাঘ মারতে গিয়ে শিকারি করবে দয়া! অপরাধী ধরতে এসে গোয়েন্দা করবে দয়া! . . . যাকে বাঁচাবার জন্যে আপনি ফাঁসির দড়ি গলায় পরতে চেয়েছিলেন, তিনি কে? এখনও আপনি বলবেন না? তাহলে আমিই বলে দিচ্ছি। দ্বিজেনবাবু বেশ জানেন, সৌদামিনী দেবীকে হত্যা করেছেন শ্রীমতী মানসী দেবী।'

দ্বিজেন মর্মান্তিক আর্তনাদ করে উঠল। সকলের বিস্মিত দৃষ্টি মানসীর উপরে গিয়ে পড়ল বিদ্যুতের মতো। কিন্তু মানসীর মুখে নেই কোনো ভাবের রেখা। মূর্তির মতো স্থির তার দেহ।

জয়ন্ত বললে, 'দ্বিজেনবাবুকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করা বৃথা। আপাতত ওঁর কাছ থেকে কোনো জবাব পাওয়া যাবে না। কিন্তু প্রত্যেক কার্যের সঙ্গে থাকে কারণের সম্পর্ক আর দুইয়ের সঙ্গে দুই যোগ করলে হয় চার। দ্বিজেনবাবুরই কাছ থেকে তাঁর মন ধার নিয়ে আর মামলার অন্যান্য সূত্রগুলো যথাস্থানে সাজিয়ে আমি যা পরিকল্পনা করেছি, সকলে এখন তাই-ই শ্রবণ করুন। বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার কিছু কিছু গরমিল থাকতে পারে, কিন্তু মোটামুটি ব্যাপারটা দাঁড়ায় এইরকম।

'দ্বিজেনবাবু মাঝরাত্রে ঘরে শুয়ে আছেন, চোখে ঘুম আসছে না। এমন সময়ে বাইরে শব্দ পেয়ে সাড়া নিয়ে জানলেন, মানসী দেবীও তখন পর্যন্ত জেগে আছেন।'

'সেই রাত্রেই নিহত হলেন সৌদামিনী দেবী। সকলেরই দৃঢ় ধারণা, হত্যাকারী বাড়ির বাইরের লোক নয়। সে সময়ে সকলেই সহজে অন্য লোককে সন্দেহ করে। গতকল্যকার রাত্রের কথা ভেবে দ্বিজেনবাবুর মনটা ছ্যাঁত করে উঠল। অত রাত্রেও কেন জেগে ছিলেন মানসী দেবী!

'সন্দেহের আরও একটা বিশেষ কারণও আছে। প্রথমত সৌদামিনী দেবী প্রথম উইলে মানসী দেবীর জন্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা বরাদ্দ করেছিলেন। নতুন উইলে মানসী দেবীকে সে টাকা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, মানসী দেবীর সঙ্গে তিনি দ্বিজেনবাবুর বিবাহ দিতে সম্পূর্ণ নারাজ আর তাঁর কথার অবাধ্য হওয়ার দরুণ দ্বিজেনবাবুকে পথের ভিখারি করেছেন। সুতরাং সৌদামিনী দেবীর উপরে মানসী দেবীর বিজাতীয় ক্রোধ আর দারুণ আক্রোশ হওয়াই স্বাভাবিক।

'মানসী দেবী যখন অন্যান্য সকলের সঙ্গে সৌদামিনী দেবীর মৃতদেহ নিয়ে অভিভূত হয়ে আছেন, নিজের সন্দেহ ভঞ্জন করবার জন্যে দ্বিজেনবাবু তখন চুপিচুপি মানসী দেবীর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন আর জামাকাপড়ের ভিতর থেকে আবিষ্কার করলেন রক্তমাখা ছত্রপতির ছোরা! আমার ধারণা, সেইসঙ্গে তিনি আরও কিছু আবিষ্কার করেছিলেন, কিন্তু তা নিয়ে পরে আলোচনা করলেও চলবে।

'এই অভাবিত আবিষ্কার করে দ্বিজেনবাবু যে হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত পেলেন, সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তবু মানসী দেবীর প্রতি তাঁর ভালোবাসা একটুও কমল না, বরং পুলিশের কবল থেকে তাঁকে উদ্ধার করবার জন্যে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করতে উদ্যত হলেন। কেমন দ্বিজেনবাবু, আমার অনুমান বোধ হয় নিতান্ত ভ্রান্ত নয়?'

দ্বিজেন নিরুত্তর, তার অবস্থা জীবন্মৃতের মতো।

জয়ন্ত বললে, 'সঞ্জীবিত হোন দ্বিজেনবাবু, আশ্বস্ত হোন! আমি জানি, আপনি মিথ্যা ভয় পেয়ে মিথ্যা কথা বলেছেন। আমি আপনাকে অভয় দিয়ে বলতে পারি, মানসী দেবী হত্যা করেননি সৌদামিনী দেবীকে!'

ঘরের ভিতর শোনা গেল বহু কণ্ঠের বিস্ময়গুঞ্জন। মানসীর মূর্তি তেমনি নির্বাক, তেমনি নিস্পন্দ-সমান অটল আনন্দে-নিরানন্দে! দ্বিজেন ফেললে আশ্বস্তির নিশ্বাস।

জয়ন্ত বললে, 'এইবারে পবিত্রবাবু কি একবার এদিকে আসতে পারবেন?'

পবিত্রবাবু উঠে এলেন। দুই ভুরু তাঁর সংকুচিত।

'পবিত্রবাবু, আজ অ্যাটর্নি বাড়িতে গিয়ে জানলুম যে, প্রথম উইলে সৌদামিনী দেবী আপনার জন্যে বরাদ্দ রেখেছিলেন বিশ হাজার টাকা?'

-'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

-'নতুন উইলে আপনার ভাগে ছিল না একটিমাত্র পয়সাও? আপনি উইলের একজন সাক্ষী, এটা নিশ্চয়ই আপনি দেখেছিলেন?'

-'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

-'নতুন উইলে আপনার টাকা মারা গেল কেন, এটা প্রথমে আমি বুঝতে পারিনি। তাই আজ সকালে অ্যাটর্নি বাড়ি থেকে ফিরে এসেই কৌশলে আপনার কাছ থেকে গুপ্তকথাটা আদায় করে নিই। -আপনাকে বঞ্চিত করার কারণ বোধ হয় আপনি করেছিলেন দ্বিজেনবাবুর পক্ষসমর্থন?'

-'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

-'আপনার পক্ষে দ্বিজেনবাবুর পক্ষসমর্থন বলতে বোঝায় আত্মপক্ষসমর্থনও?'

-'অর্থ বুঝলুম না'।

-'নতুন উইলে সম্পত্তির মালিক হতেন হীরেন্দ্রনারায়ণ। তিনি আপনাকে ঘৃণা করতেন। তাঁকে সম্পত্তির মালিক করার অর্থই হচ্ছে আপনাকে চাকরি থেকে তাড়ানো।'

-'ব্যাপারটা প্রায় সেইরকমই দাঁড়ায় বটে।'

-'তাহলে একসঙ্গে বিশ হাজার টাকা হারিয়ে আর চাকরি খুইয়ে সৌদামিনী দেবীকে নিশ্চয়ই আপনি ধন্যবাদ দেননি?'

-'বলা বাহুল্য।'

-'তাই ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে করেছিলেন সৌদামিনী দেবীর বক্ষে ছুরিকাঘাত?'

-'আপনি কী আজগুবি কথা বলছেন!'

-'আপনি এক ঢিলে মারতে চেয়েছিলেন দুই পাখি। সৌদামিনী দেবীকে হত্যা করে নিজে নিরাপদে থাকবার জন্যে সমস্ত সন্দেহ চালনা করতে চেয়েছিলেন এমন এক নিষ্পাপ নির্দোষ মহিলার দিকে, যার উপরে আপনি তুষ্ট ছিলেন না।'

-'কার উপরে আমি তুষ্ট ছিলুম না?'

-'মানসী দেবীর উপরে। এ কথা আমি দ্বিজেনবাবুর মুখেই শুনেছি।'

-'একেবারে বাজে কথা।'

-'প্রথমত আপনি ছত্রপতির ছোরাখানা মানসী দেবীর আলমারিতে রাখেন। কিন্তু তারপরই বোধ করি আপনার মনে হয়, প্রমাণটা আরও দৃঢ় করা উচিত। মানসী দেবীর আলনা থেকে আপনি তাঁর সায়াটা নামিয়ে নেন-সেটাও রক্তলিপ্ত করতে চান। সৌদামিনী দেবীর ঘরে গিয়ে মৃতদেহের ক্ষত থেকে রক্ত সংগ্রহ করা চলত, কিন্তু যেকোনো মুহূর্তে লাইব্রেরি থেকে মানসী দেবী এসে পড়তে পারতেন। আর একটু দেরি করলেই সত্যসত্যই আপনি সেইদিনই হাতেনাতে ধরা পড়ে যেতেন, কারণ মানসী দেবী তখন নিজের ঘরের দিকেই আসছিলেন, আর আসতে আসতে দূর থেকে আপনার পলায়মান মূর্তি দেখেও চিনতে পারেননি। খুব চটপট কাজ সারবার জন্যে আপনি ছত্রপতির ছোরা দিয়েই নিজের বাঁ-হাতের এক জায়গা অল্প একটু কেটে রক্তপাত করে সায়াটাকেও করেন রক্তাক্ত। তারপর ছোরা আর সায়া আলমারির ভিতরে গুঁজে রেখে পালিয়ে আসেন।'

পবিত্রবাবু হাসবার চেষ্টা করে বললেন, 'আপনি দিব্যি বানিয়ে বানিয়ে কথা বলতে পারেন। কিন্তু প্রমাণ কোথায়?'

জয়ন্ত বললে, 'দ্বিজেনবাবু, আলমারির ভিতরে আপনি ছোরার সঙ্গে নিশ্চয়ই একটা রক্তমাখা সায়া পেয়েছিলেন?'

দ্বিজেন শ্রান্ত স্বরে বললে, 'পেয়েছিলুম।'

-'সেটা কোথায় গেল?'

-'পুড়িয়ে ফেলেছি।'

-'আরও শুনুন পবিত্রবাবু। আপনি যে রোজ ডাক্তার ডি. এন. বসুর ডিসপেন্সারিতে আপনার বাঁ-হাতের ক্ষত ব্যান্ডেজ করতে যান, পুলিশ এ খবরও পেয়েছে। ছোরাখানা প্রাচীন। তাতে যে মরচে ধরেছে তাও আমি দেখেছি। তাই আপনার সামান্য ক্ষত বিষিয়ে অসামান্য হয়ে উঠেছে। আপনি জামার বাঁ-আস্তিন গুটোন দেখি, তাহলে সকলেই ব্যান্ডেজ দেখতে পারে।'

পবিত্রবাবু ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, 'আমার হাতের ব্যান্ডেজ কি আমাকে হত্যাকারী বলে প্রমাণিত করবে?'

-'আপনি আমার ঘরের জানলায় আড়ি পেতে আমাদের কথা শোনবার চেষ্টা করতেন। কৌশলে আমি আপনার পদচিহ্ন সংগ্রহ করেছি। তার ছাঁচও উঠেছে। একটু মেলালেই আপনি ধরা পড়ে যাবেন।'

পবিত্রবাবু এইবারে অধীর স্বরে চিৎকার করে বললেন, 'আড়ি পেতে শোনা মানেই কি নরহত্যা করা? প্রমাণ দেখান, প্রমাণ দেখান। যত রাবিশ কথা!'

-'পবিত্রবাবু, তাহলে এইবারে আমাকে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করতে হল। ছোরা দিয়ে বাঁ-হাত কাটবার পর রক্ত বন্ধ করবার জন্যে আপনি নিজের রুমালখানা ক্ষতের উপরে জড়িয়ে নিয়েছিলেন। তবু তিন ফোঁটা রক্ত পড়েছিল ঘরের মেঝের উপরে। সেই রক্তাক্ত রুমালের উপরে ছিল আপনার ডান হাতের একটা আঙুলের ছাপ। কিন্তু আলমারির ভিতরে ছোরা আর সায়াটা রাখবার সময়ে রুমালখানাও যে ক্ষতস্থান থেকে খসে পড়ে গিয়েছিল, মনের উত্তেজনায় আর তাড়াতাড়িতে আপনি তা একেবারেই টের পাননি। কাল পুলিশ এসে আপনাদের সকলকার ডান হাতের আঙুলের ছাপ নিয়ে গিয়েছে। পরীক্ষায় নিশ্চিতভাবে জানা গিয়েছে যে, রুমালের উপরে আপনারই আঙুলের ছাপ। আপনার কিছু বক্তব্য আছে?'

পবিত্রবাবু মুখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠল এবং ফুলে উঠল তাঁর কপালের দুই দিকের দুটো শির। তারপরই বিকট একটা চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দুই বাহু ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করে দুই হাত দিয়ে শূন্য আঁচড়াতে আঁচড়াতে দড়াম করে পড়ে গেলেন কক্ষতলে! মহা হইচই করে সকলে কাছে ছুটে এল। পবিত্রবাবুর দেহ দুই-তিন বার নড়েচড়ে একেবারেই স্থির হয়ে গেল। তিনি সংবরণ করলেন ইহলীলা।

জয়ন্ত বললে, 'আর এখানে নয় মানিক, সরে পড়ি চলো। আমাদের কর্তব্য সমাপ্ত।'

জয়ন্ত ও মানিক নিজেদের জিনিসপত্তর গুছিয়ে নিচ্ছে, এমন সময়ে সুন্দরবাবু এসে বললেন, 'জয়ন্ত, একেবারে ডবল ট্র্যাজেডি! পবিত্রবাবুর কীর্তি শুনে আর মৃত্যু দেখে তাঁর স্ত্রী সুরবালারও হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে!'

জয়ন্ত দুঃখিতভাবে বললে, 'গোয়েন্দার কর্তব্য কী নিষ্ঠুর! আমাদের জন্যেই এই কাণ্ড! মারা গিয়েছিলেন কেবল সৌদামিনী দেবী। আমরা এসে মরাকে তো বাঁচাতে পারলুমই না, উলটে মারলুম আরও দু-জন লোককে!'

মানসীকে সঙ্গে করে ঘরের ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে দ্বিজেন হাস্যমুখে বললে, 'না জয়ন্তবাবু, গোয়েন্দার কর্তব্যে মাধুর্যও আছে। আমরা তো মরতেই বসেছিলুম, আপনার জন্যেই আমরা আবার লাভ করলুম নবজীবন। আপনি আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন।' মানসীর সঙ্গে দ্বিজেন যুক্ত করে জানু পেতে জয়ন্তের সামনে উপবেশন করলে।

দু-জনকে হাত ধরে তুলে দাঁড় করিয়ে দিয়ে জয়ন্ত প্রসন্ন মুখে বললে, 'প্রার্থনা করি, ভগবান যেন আপনাদের যুক্তজীবনকে আনন্দময় করে তোলেন।' তারপর পকেট থেকে দ্বিজেনের দেওয়া চেকখানি বার করে সে আবার বললে, 'এই নিন আপনার চেক।'

দুই হাত জোড় করে দ্বিজেন বললে, 'ক্ষমা করবেন। ও চেক আপনারই।'

জয়ন্ত সকৌতুকে হেসে বললে, 'তাই নাকি? সুন্দরবাবু, ওষ্ঠাধরে একটা নতুন চুরোট ধারণ করুন তো! আচ্ছা, এইবারে আপনার দেশলাইটা আমাকে দিন। দ্বিজেনবাবু আগেকার শখের বাবুরা নাকি দশ টাকার নোট পুড়িয়ে সিগারেট ধরাতেন। আমরাও বড়ো ছোট্ট মনুষ্য নই। এই দেখুন, আপনার চেকে অগ্নিসংযোগ করলুম, আর এই দেখুন, সুন্দরবাবুর শ্রীমুখ ধূম্র-উদ্গিরণ করছে!'

মানিক বললে, 'অতুলনীয় দৃশ্যকাব্য! পঁচিশ হাজার টাকার অগ্নিসংস্কার! এ দৃশ্য দেবতাদেরও লোভনীয়!'
সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম!'

পদ্মরাগ বুদ্ধ

কলিকাতায় ভেনিসের একরাত্রি

জয়ন্ত ও মানিক সেদিন ডিনার খেতে গিয়েছিল,-পার্ক স্ট্রিটে এক হালফ্যাশানি বন্ধুর বাড়িতে।

জয়ন্ত ও মানিক থাকে বাগবাজারে, কিন্তু তাদের পার্ক স্ট্রিটবাসী এই বন্ধুটি ছিলেন সেই জাতীয় মনুষ্য, যাঁরা বিশ্বাস করেন যে, হগসাহেবের বাজারের উত্তরে আর আধুনিক ভদ্রলোকের বাস নেই। অতএব হগসাহেবের বাজারের দক্ষিণ দিকে আস্তানা গেড়ে এঁরা কোঁচানো কাপড় পরেন না, শিঙাড়া কচুরি খেতে ভালোবাসেন না, অ-আ ক-খ ব্যবহার করেন না, ঘড়ি ধরে দাড়ি কামান, হাঁচেন-কাশেন, স্বপ্ন দেখেন।

জয়ন্ত ও মানিক যে এই শ্রেণির বন্ধুর খুব অনুরাগী ছিল, তা নয়। কলেজ ছাড়বার পর এঁর সঙ্গে পথে-ঘাটে তাদের দেখা হয়েছে কালেভদ্রে কদাচ। শখের গোয়েন্দাগিরিতে বারংবার আশ্চর্যরূপে সফল হয়ে জয়ন্ত আজকাল কলকাতার একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বলে গণ্য হয়েছে এবং সেই খ্যাতির কিছু কিছু অংশ মানিকও পেয়েছে। তাদের মতন লোককে নিমন্ত্রণ করে এখন বাড়িতে আনতে পারলেও অনেকে সৌভাগ্য বলে মনে করে। হয়তো সেইজন্যেই পার্ক স্ট্রিট আজ বাগবাজারকে করেছে ডিনার খাবার নিমন্ত্রণ! বাগবাজারকে চমকে দেবার জন্যে পার্ক স্ট্রিট কোনো আয়োজনেই ত্রুটি করেনি। সে-সব দেখে জয়ন্ত ও মানিক কোনোরকম বিস্ময় প্রকাশ করলে না বলে গৃহকর্তা বোধ হয় মনে মনে কিঞ্চিৎ হতাশ হলেন।

কিন্তু খানা খাবার টেবিলের উপরে মেনুতে খাদ্যের ফরাসি নামগুলি তাদের কাছে বড়ো বাড়াবাড়ি বলে মনে হল।

জয়ন্ত বললে, 'ওহে, এই ফরাসি নামগুলোর ভেতরে গোরু আর শুয়োরের মাংস লুকিয়ে নেই তো?'

গৃহকর্তা এতক্ষণে তো পেয়ে অট্টহাস্য করে বললেন, 'কেন হে, গোরু আর শুয়োর সম্বন্ধে এখনও তোমাদের প্রাচীন কুসংস্কার আছে নাকি?'

জয়ন্ত গম্ভীর হয়ে বললে, 'তোমার কথার উত্তর দিতে গেলে তর্ক করতে হয়। খানার টেবিলের সামনে সে তর্ক করার অভ্যাস আমার নেই। আসল কথা, ও দু-টি খাবার আমরা পছন্দ করি না।'

খানা শেষ হলে পর সকলে পাশের একটি ঘরে গিয়ে বসলেন। সে ঘরটি একেবারে একেলে কায়দায় সাজানো। দেওয়ালে কিউবিস্ট চিত্রকরদের আঁকা ছবি, টেবিল-চেয়ার প্রভৃতি আসবাবও কিউবিস্ট কারিগরদের দ্বারা গড়া, এমনকী ঘরের মেঝের মোজেকের উপরেও কিউবিজমের প্রভাব।

গৃহকর্তা বললেন, 'জয়ন্ত, এ ঘরটির ডেকোরেশান তোমার কেমন লাগছে?'

-'বেশ। কিন্তু ভারতবাসী যখন ঘরবাড়ি সাজায় তখন সে যদি ভারতের প্রাচীন শিল্পের আদর্শের দিকে লক্ষ রাখে, তাহলে আমি বেশি খুশি হই।'

-'কিন্তু আমি চাই আপ-টু-ডেট হতে। কিউবিজম হচ্ছে হাল-ফ্যাশানের ঢেউ।'

-'না, কিউবিজমের বয়েস হল ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর। এখনকার আর্টে হালফ্যাশান এনেছেন হাইপার রিয়ালিস্ট শিল্পীরা। তাদের নাম তুমি শুনেছ?'

-'না।'

-'তাহলে পার্ক স্ট্রিটে বাস করেও তুমি আপ-টু-ডেট হতে পারনি। তুমি জানো, যিনি কিউবিজম আবিষ্কার করেছেন, তিনি এখন কিউবিজম ছেড়ে অন্য পদ্ধতিতে ছবি আঁকছেন?'

-'না।'

-'তাহলে হে বন্ধু, তুমি পার্ক স্ট্রিটের কালো কলঙ্ক!'

বন্ধু মনে মনে রেগে ঠোঁট কামড়ালেন। অধিকাংশ আধুনিক বাঙালি-সাহেবের মতন তিনিও লোক-দেখানো আধুনিক হয়েছেন, আর্টের অত খুঁটিনাটির খবর রাখবার উৎসাহ তাঁর নেই।

ডিনারের পর কফির পালা। কিন্তু কফির পেয়ালায় চুমুক দেওয়ার সঙ্গেসঙ্গেই নামল যেন আকাশ ভেঙে বৃষ্টির ধারা। হু-হু করে ঝোড়ো-হাওয়া ঘরের ভিতরে ঢুকে প্রথমেই কিউবিস্টদের আঁকা ছবিগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে। তখনি তাড়াতাড়ি দরজা-জানলা বন্ধ করে দেওয়া হল।

এক, দুই, তিন ঘণ্টা গেল, তখনও ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে।

জয়ন্তের চোর-ডাকাত ধরার কাহিনি শুনে গৃহকর্তার সময় কিন্তু বেশ কেটে যাচ্ছে। তাঁর গল্প শোনার উৎসাহ যেন ফুরোতেই চায় না। কিন্তু শেষ-গল্প শেষ করবার আগেই ঘড়িতে বাজল সাড়ে-বারোটা। জয়ন্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আর অপেক্ষা করা চলে না। পার্ক স্ট্রিট থেকে বাগবাজার-মস্ত লম্বা দৌড়! ওঠো মানিক!'

গৃহকর্তা বললেন, 'কিন্তু এখনও বৃষ্টি পড়ছে যে!'

-'পড়ুক। চলো মানিক!'

গাড়ি বারান্দার তলাতেই তাদের মোটর দাঁড়িয়েছিল, তারা মোটরে গিয়ে উঠল।

চৌরঙ্গি তখন একটা প্রকাণ্ড হ্রদে পরিণত হয়েছে। সেই জলরাজ্যে জনপ্রাণীর সাড়া নেই, কেবল সরকারি আলোক-স্তম্ভগুলো সারি সারি দাঁড়িয়ে দীপ্তনেত্রে যেন সেই নির্জন রাজ্য শাসন করছে, নীরবে।

চৌরঙ্গি ছাড়িয়ে মোটর যখন সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউতে প্রবেশ করল পথের জলও তখন বেড়ে উঠল। যতদূর চোখ যায় তাকিয়ে দেখলে মনে হয়, শহরের বুকের ভিতরে সুদীর্ঘ এক নদীর আবির্ভাব হয়েছে!

মানিক বললে, 'বর্ষায় কলকাতায় বাস করলে ভেনিসে বাস করা হয়, কারণ তখন কলকাতার রাজপথের সঙ্গে ভেনিসের জলপথের কোনো তফাতই থাকে না।'

জয়ন্ত বললে, 'কেবল দীর্ঘশ্বাসের সেতু আর গন্ডোলা নৌকার অভাব।'

-'গন্ডোলার অভাব কর্পোরেশনের দূর করা উচিত। বর্ষাকালের জন্যে কলকাতার মাঝে মাঝে খেয়াঘাট বসিয়ে নৌকো রাখার ব্যবস্থা করা দরকার। আর দীর্ঘশ্বাসের সেতুর কথা বলছ? বর্ষার সময়ে সারা কলকাতা যত দীর্ঘশ্বাস ফেলে, তা দিয়ে কি শত শত সেতু তৈরি করা যায় না?'

কিন্তু জয়ন্ত কোনো জবাব দেবার আগেই তাদের মোটর হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ড্রাইভার বললে, 'হুজুর, গাড়ি আর চলবে না!'

জয়ন্ত বললে, 'গাড়ি তো আর নৌকো নয়, এতক্ষণ সে যে নৌকোর কর্তব্যপালন করতে নারাজ হয়নি, এইটুকুই আশ্চর্য! এসো মানিক, এখন জলে ঝাঁপ দেওয়া ছাড়া কোনো উপায়ই নেই!'

সেখানটা হ্যারিসন রোডের মোড়। বাগবাজার তখন অনেক দূরে। দু-জনে জল ভাঙতে ভাঙতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হল,-পথের জল প্রবাহ ঠিক নদীর মতোই কোলাহল করতে করতে ছুটে চলেছে এবং জলের মাঝে মাঝে ভাসছে মরা ও পচা ইঁদুর, কুকুর ও বিড়ালের দেহ!

মানিক ঘৃণায় নাক টিপে ধরে বললে 'বাড়িতে গিয়ে জলে পার্মাঙ্গেনেট অফ পটাস গুলে গা না ধুলে আর রক্ষা নেই! জয়, পার্ক স্ট্রিটের ডিনার বুঝি আর বাগবাজারি পেটে থাকে না! থুঃ থুঃ!'

জয়ন্ত বললে, 'আমি বলি, জয় কর্পোরেশনের! আধুনিক কলকাতার টেক্সো যত বাড়ছে, তার রাস্তার জলের পরিমাণও সেই অনুপাতে দিব্যি বেড়ে উঠছে! অথচ আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে জল নিকাশের ব্যবস্থা করবার অজুহাতে কত লক্ষ টাকা খরচ করা হচ্ছে!'

দু-জনে বিরক্ত মনে হোঁচট খেতে খেতে এগিয়ে চলল, তখন তাদের দুর্দশা দেখবার জন্য পথে একটা জ্যান্ত কুকুর পর্যন্ত হাজির ছিল না। লাল পাগড়ি পর্যন্ত অদৃশ্য! বৃষ্টি তখনও থামেনি এবং ঝোড়ো বাতাস তখনও বন্ধ জানলায় মাথা খুঁড়ে ভিতরে ঢুকতে না পেরে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে!

হঠাৎ জয়ন্ত বলে উঠল, 'হুঁ, এই তো চোরের শুভমুহূর্ত! মানিক, তুমি কি একটা মানুষ-টিকটিকি দেখতে চাও?'

মানিক বিস্মিত নেত্রে জয়ন্তের মুখের পানে তাকালে।

জয়ন্ত আঙুল তুলে বললে, 'আমার মুখের পানে তাকিয়ে তুমি আমার মুখ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না,-ওই বাড়িখানার তিনতলার দিকে তাকাও!'

পাশেই একখানা ত্রিতল বাড়ি! একটা মনুষ্য-মূর্তি দেয়াল বেয়ে উপরে উঠছে!

মানিক বললে, 'চোর! কিন্তু কেমন করে লোকটা উপরে উঠছে?'

'ট্যাঙ্কের জলের পাইপ ধরে।'

লোকটা হাত বাড়িয়ে বারান্দার রেলিং ধরলে, তারপর ভিতরে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

জয়ন্ত বললে, 'এসো, দেখা যাক চোরটাকে ধরতে পারা যায় কি না?'

জয়ন্ত বাড়ির সদর দরজায় গিয়ে খুব জোরে কড়া নাড়তে লাগল। খানিকক্ষণ পরে ভিতর থেকে হিন্দুস্থানি গলায় কে শুধোলে, 'কোন হায় রে?'

-'বাইরে এসে দেখো না বাবা, চ্যাঁচাও কেন? বাড়িতে চোর ঢুকেছে!'

হঠাৎ রাস্তার দিক থেকে কোথায় কে তীক্ষ্ণ শিস দিলে!

জয়ন্ত চারিদিকে চেয়ে কারুকেই দেখতে পেলে না। বললে, 'মানিক, এ চোর একলা আসেনি। তার দলের লোক নীচে কোথাও লুকিয়ে পাহারা দিচ্ছে। শিস দিয়ে উপরের চোরকে সে সাবধান করে দিলে।'

দরজা খুলে বেরুল গালপাট্টাওয়ালা মস্ত একখানা মুখ।

জয়ন্ত বললে, 'দারোয়ানজি, রাস্তা থেকে দেখলুম একটা চোর পাইপ ধরে তিনতলার বারান্দার গিয়ে উঠল! তাকে ধরতে চাও তো শিগগির আমাদের নিয়ে ওপরে চলো!'

দারোয়ান তখনি কোণ থেকে নিজের লাঠিটা তুলে তিন বার মাটিতে ঠুকে যা বললে তার সারমর্ম হচ্ছে এই যে, এই লাঠি দিয়ে সে যদি আজ চোরের মাথাটা কাঁধের উপর থেকে উড়িয়ে দিতে না পারে, তাহলে মিথ্যাই তার নাম হাতি সিং!

তার সঙ্গে জয়ন্ত ও মানিক সিঁড়ি দিয়ে দ্রুতপদে উপরে উঠতে লাগল।

একেবারে তিনতলার বারান্দায়! তিনতলার দুটো দরজা রয়েছে, দুটোই বন্ধ।

একটা দরজার সামনে গিয়ে দারোয়ান ডাকলে, 'হুজুর, হুজুর!'

কেউ সাড়া দিলে না।

কিন্তু জয়ন্তের তীক্ষ্ণ কাণ শুনতে পেলে, ঘরের ভিতরে ঝটাপটির শব্দ হচ্ছে!

সে দরজায় পিঠের বামদিক রেখে দাঁড়াল। তার সেই ছয় ফুট চার ইঞ্চি উঁচু দেহ আসুরিক শক্তির জন্যে বিখ্যাত, আর এ তো তুচ্ছ একটা কাঠের কবাট! তার দেহের এক ধাক্কায় ভিতরের খিল ভেঙে গেল-দরজার কবাট সশব্দে খুলে গেল!

ঘরে ঘুটঘুট করছে অন্ধকার! প্রথমেই দেখা গেল রাস্তার বারান্দার দিকের খোলা দরজা দিয়ে একটা মূর্তি বেরিয়ে যাচ্ছে!

হাতি সিং ছুটে গিয়ে বাঘের মতো তার উপরে লাফিয়ে পড়ল।

প্রথমেই একটা শব্দ হল,-কার হাত থেকে কী একটা জিনিস যেন মাটির উপরে পড়ে ভেঙে গেল! তারপরেই চোখের পলক না পড়তেই বিপুলবপু হাতি সিং কুপোকাত!

জয়ন্তও একলাফে বারান্দায় গিয়ে পড়ল, কিন্তু চোর তখন সেখানে নেই! বারান্দার রেলিংয়ে ঝুঁকে পড়ে জয়ন্ত দেখলে, জলের পাইপ ধরে আশ্চর্য বেগে সে নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে! তাকে আর ধরবার চেষ্টা করা বৃথা।

অন্ধকার ঘরে ঢুকে সে বললে, 'হাতি সিং, তুমি উঠেছ?'

হিন্দি ভাষায় সাড়া এল, 'উঠেছি বাবুজি! বড়োই জোয়ান চোর, ধরে রাখতে পারলুম না!'

-'সে তোমার দোষ নয়। আলোর সুইচ কোথায়?'

হাতি সিং আলো জ্বালল।

ঘরের একদিকে একখানা খাট। ঠিক তলাতেই মেঝের উপরে পড়ে একটি প্রৌঢ় বাঙালি ভদ্রলোক অত্যন্ত হাঁপাচ্ছেন।

জয়ন্ত ও মানিক তাঁর পাশে গিয়ে বসল। প্রথমেই জয়ন্তের চোখ পড়ল ভদ্রলোকের গলার উপরে-সেখানে মানুষের আঙুলের রাঙা ছাপ! চোর তাঁর গলা টিপে ধরেছিল।

ভদ্রলোকের বয়স হবে চল্লিশ। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। গৌরবর্ণ। দোহারা দেহ।

হাতি সিং জল এনে তাঁর গলায় ও মুখে ঝাপটা দিতে লাগল। খানিকক্ষণ পরে ভদ্রলোক কতকটা সামলে নিয়ে উঠে বসলেন। ধীরে ধীরে বললেন, 'আপনারা কে তা জানি না। কিন্তু আপনারা না এসে পড়লে আমি বাঁচতুম না। গেল হপ্তায় আমার সহকারী বন্ধু সুরেন বাবুকে কে খুন করেছে, আর আজ আমিও পরলোকে চলে যাচ্ছিলুম!'

মানিক বললে, 'আমি খবরের কাগজে পড়েছি, গেল হপ্তায় বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক অমল চন্দ্র সেনের সহকারী সুরেন্দ্র নাথ বসুকে কে হত্যা করে পালিয়েছে। আপনি কি সেই সুরেনবাবুর কথা বলছেন?'

-'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

-'তাহলে আপনিই হচ্ছেন প্রত্নতাত্ত্বিক-'

-'অমল চন্দ্র সেন।'

জয়ন্ত অবাক হয়ে অমলবাবুর মুখের দিকে তাকালে। অমলবাবুর বিখ্যাত নাম সেও শুনেছে বটে, কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিকের নিরীহ দেহের উপরে এমন মারাত্মক আক্রমণ কেন? পুরানো পোকায়-কাটা পুঁথিপত্র, অচল সেকেলে মুদ্রা আর ভাঙা ইট-কাঠ-পাথর নাড়াচাড়া করা যাঁদের একমাত্র পেশা, তাঁদেরই একজনকে পাঠানো হয়েছে পরলোকে এবং আর একজনকেও-

তার চিন্তায় বাধা পড়ল। অমলবাবু হঠাৎ সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'ওকী, ওই বুদ্ধমূর্তিটা ওখানে পড়ে কেন? ওটা ভাঙলই বা কী করে?'

জয়ন্ত চেয়ে দেখলে, বারান্দার দিকে দরজার সামনে মাটির উপরে একটি বুদ্ধমূর্তি পড়ে রয়েছে, তার মুণ্ড ভেঙে আরেকদিকে গড়িয়ে গিয়েছে।

সে বললে, 'এখন বোঝা যাচ্ছে, হাতি সিং যখন চোরকে আক্রমণ করে, তখন ওই মূর্তিটাই চোরের হাত থেকে পড়ে ভেঙে গিয়েছিল! শব্দটা আমি তখনি শুনেছিলুম, কিন্তু কারণ বুঝতে পারিনি।'

অমলবাবু উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'এত জিনিস থাকতে চোর ওই বুদ্ধমূর্তি নিয়ে পালাচ্ছিল? চোর ওই-বুদ্ধমূর্তি-নিয়ে' বলতে বলতে তিনি হঠাৎ আবার থেমে গেলেন!

জয়ন্ত নীরবে তাঁর ভাবভঙ্গি লক্ষ করতে লাগল। সে বেশ বুঝলে, অমলবাবু আজকের এই বিপদের একটা হদিস খুঁজে পেয়েছেন।

খানিকক্ষণ পরে অমলবাবু বললেন, 'আপনারা আমার প্রাণরক্ষা করলেন, কিন্তু আপনাদের পরিচয় জানা হল না তো?'

জয়ন্ত বললে, 'জানাবার মতো পরিচয় আমাদের কিছুই নেই। আমার নাম জয়ন্ত আর আমার বন্ধুর নাম মানিকলাল। আমাদের শখ হচ্ছে গোয়েন্দাগিরি।'

-'আপনাদের কথা আমিও বোধ হয় শুনেছি। বৈজ্ঞানিক অপরাধী ভবতোষ মজুমদারকে আপনারাই কি ধরিয়ে দিয়েছিলেন?'

-'অনেকটা তাই বটে। কিন্তু পুলিশ বলবে ভবতোষকে ধরেছিলেন ইনস্পেক্টার সুন্দরবাবু।'

-'পুলিশ যা বলে বলুক, কিন্তু আসল বাহাদুরি কার লোকে তা জানে। আপনারা এখানে এলেন কেমন করে?'

জয়ন্ত সব খুলে বললে। অমলবাবু বললেন, 'জয়ন্তবাবু, ভগবান আপনাদের এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, 'অনেকটা সেইরকমই মনে হয় বটে! নইলে হঠাৎ এই দুর্যোগ, জলমগ্ন রাস্তা, মোটরের বিদ্রোহ, যথাসময়ে আপনার বাড়ির সামনে আমাদের আবির্ভাব-এ-সমস্তই অর্থহীন হয়ে পড়ে!'

অমলবাবু বললেন, 'দেখুন, ওই বুদ্ধমূর্তিটি এতদিন আমার সহকারী সুরেনবাবুর বাড়িতে ছিল। ওই মূর্তিটি আমরা চার মাস আগে কাম্বোডিয়ায় গিয়ে পেয়েছিলুম।'

-'কাম্বোডিয়ায়? যেখানে জঙ্গলের ভিতরে প্রসিদ্ধ প্রাচীন হিন্দু মন্দির ওঙ্কারধাম আছে?'

-'হ্যাঁ। সেই পিরামিডের চেয়েও আশ্চর্য মন্দির থেকে আরও তফাতে, জঙ্গলের ভিতরে প্রাচীন হিন্দুদের আরও অনেক কীর্তি লুকানো আছে। খোঁজে গিয়েই আমরা এই বুদ্ধমূর্তিটি পাই। এই মূর্তি পাওয়ারও একটা বিচিত্র ইতিহাস আছে, সে কথা পরে বলব।'

জয়ন্ত বললে, 'মূর্তিটি এতদিন সুরেনবাবুর কাছে ছিল,-তারপর?'

অমলবাবু বললেন, 'গেল হপ্তায় একদিন ওই মূর্তিটি আমার পরীক্ষা করবার দরকার হয়। আমি মূর্তিটি সুরেনবাবুর কাছ থেকে আনিয়ে নিই। ঠিক সেই রাত্রেই কে সুরেনবাবুকে গলা টিপে হত্যা করে। কেবল তাই নয়। সুরেনবাবুর ঘরে আরও অনেক মূর্তি ছিল, হত্যাকারী যে সেগুলো নিয়েও নাড়াচাড়া করেছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু হত্যাকারী কোনো জিনিস বা মূর্তি নিয়ে যায়নি। পুলিশ এই হত্যার কোনো যুক্তিসংগত কারণ খুঁজে পায়নি। জয়ন্তবাবু, হত্যাকারী কীসের খোঁজে সুরেনবাবুর ওখানে গিয়েছিল, বলতে পারেন?'

-'আপনার আর কিছু বলবার আছে?'

-'আছে, আমার কোনো শত্রু নেই। আজ রাত্রে আপনাদের কড়ানাড়ার শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। খাট থেকে যেই নেমেছি, অমনি কে আমার গলা টিপে ধরলে-আমি অজ্ঞানের মতো হয়ে গেলুম। এখন দেখছি, আমার ঘরেও এক হত্যাকারী এসে আর কিছু না নিয়ে ওই বুদ্ধমূর্তি নিয়েই পালাচ্ছিল, যে-মূর্তি এতদিন সুরেনবাবুর ঘরে ছিল!'

মানিক বললে, 'আমার তো মনে হয়, সুরেনবাবুকে খুন করে সেখানে ওই বুদ্ধমূর্তি না পেয়ে হত্যাকারী আজ আপনার এখানে খুঁজতে এসেছিল।'

জয়ন্ত কিছু বললে না। দরজার কাছে গিয়ে বুদ্ধমূর্তির দেহ ও মাথা মাটির উপর থেকে কুড়িয়ে নিলে।

মূর্তিটি চুনাপাথরে গড়া ধ্যানী বুদ্ধের, উচ্চতায় এক হাতের বেশি হবে না।

সোনার চাকতির নকশা

জয়ন্ত বুদ্ধমূর্তির দিকে স্থিরদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। কিন্তু তার ভিতর থেকে কোনোরকম বিশেষত্বই আবিষ্কার করতে পারলে না। এ ধরনের লক্ষ লক্ষ বুদ্ধমূর্তি এশিয়ায় সর্বত্রই পাওয়া যায়।

মূর্তির ভাঙা মাথাটি দেহের উপরে আলতো ভাবে লাগিয়ে জয়ন্ত বুদ্ধদেবকে আবার টেবিলের উপর বসিয়ে দিলে। তারপরে যেন আপন মনেই মৃদুকণ্ঠে বললে, 'হত্যাকারী এই মূর্তিই চুরি করতে এসেছিল? কিন্তু হিংসার সঙ্গে এই মূর্তিমান অহিংসার সম্পর্ক কী?'

মানিক বললে, 'হয়তো বিশেষ কোনো কারণে ওই মূর্তিকে কেউ এমন পবিত্র মনে করে যে, ওকে হস্তগত করবার জন্যে সে নরহত্যা করতেও সংকুচিত নয়!'

জয়ন্ত বললে, 'এর উত্তরে দু-টি কথা বলা যায়। প্রথমত বুদ্ধের প্রতি এতটা অতি-ভক্তি থাকা সম্ভব কেবল গোঁড়া বৌদ্ধের। কিন্তু কলকাতায় এমন ভীষণ প্রকৃতির বৌদ্ধ আছে বলে মনে হয় না। দ্বিতীয়ত কাশীধামে কাক মরলে কামরূপে কেউ হাহাকার করে না। কাম্বোডিয়ার অজানা জঙ্গলে কুড়িয়ে পাওয়া সাধারণ বুদ্ধমূর্তি, তার জন্যে কলকাতার কোনো বৌদ্ধের এতটা নাড়ির টান হবে কেন? এর চেয়ে ঢের মূল্যবান আর অসাধারণ পুরোনো বুদ্ধমূর্তি কত লোকের ঘরে ঘরে রয়েছে, তাদের জন্যে তো কোনো বৌদ্ধের মাথাব্যথা হয় না! না মানিক। এ ব্যাপারের মধ্যে অন্য রহস্য আছে।'

মানিক বললে, 'দেশে লক্ষ লক্ষ কালীর প্রতিমা আছে, তাদের জন্যে ভক্তরা তেমন পাগল হয় না। কিন্তু শুনতে পাই, কোনো কোনো কালীর মূর্তি নাকি জাগ্রত, তাই তাদের জন্যে অনেক ভক্ত প্রাণ নিতে বা দিতে প্রস্তুত। কে বলতে পারে, এই বুদ্ধমূর্তিরও তেমন কোনো খ্যাতি আছে কি না?'

জয়ন্ত বললে, 'থাকতে পারে। কিন্তু সে খ্যাতির কথা কাম্বোডিয়ার দুর্ভেদ্য জঙ্গলের ভিতর থেকে কলকাতায় আসবে কেমন করে ?'

এতক্ষণ অমলবাবু চুপ করে খুব মন দিয়ে জয়ন্ত ও মানিকের কথাবার্তা শুনছিলেন। এখন তিনি বললেন, 'জয়ন্তবাবু, আমার মনে হচ্ছে, মূর্তিটি কেমন করে আমরা পেয়েছিলুম, সে গল্পটাও আপনাদের কাছে বলা উচিত। হয়তো তাহলেই আপনাদের কোনো কোনো প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সহজ হবে।'

জয়ন্ত একখানা চেয়ার টেনে বসে পড়ে বললে, 'বলুন। আমরা গল্প শুনতে ভালোবাসি।'

অমলবাবু আর কোনোরকম ভূমিকা না করেই বলতে লাগলেন :

'বহুদিন থেকেই আমি কাম্বোডিয়ার ওঙ্কারধামের (ইংরেজিতে Angkor Thom) কথা শুনে আসছি। তাই মাস কয়েক আগে আমি যখন সুরেনবাবুর কাছে প্রাচীন হিন্দুদের এই বিরাট কীর্তিমন্দির দেখতে যাবার প্রস্তাব করলুম, তখন তিনিও খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলেন।

'কিন্তু আমরা তো সাধারণ ভ্রমণকারী নই, আমরা হচ্ছি প্রত্নতাত্ত্বিক। আমাদের অন্য উচ্চাকাঙ্খাও ছিল। শুনেছি, ওঙ্কারধামের চারিদিককার গভীর অরণ্যের মধ্যে এমন আরও অনেক হিন্দুকীর্তি আছে, যা এখনও আবিস্কৃত হয়নি। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, তাদের সন্ধান নেওয়া।

'যথাসময়ে যাত্রা করলুম। তারপর সাগর, নগর ও অরণ্য পার হয়ে কী করে ওঙ্কারধামের আকাশছোঁয়া ও দৃষ্টিসীমা-ছাড়ানো ধ্বংসস্তূপের পরিত্যক্ত বিজন বিরাটতার ছায়ায় এসে দাঁড়ালুম, সে সব কথা এখানে বলবার দরকার নেই।

'গৌরবময় অতীতের এই মূর্তিমান মৃত্যুনিসাড় দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে একদিন আমি আর সুরেনবাবু সবিস্ময়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, এমন সময়ে শুনতে পেলাম পাশের ভাঙা মন্দিরের ভিতরে কে কাতর আর্তনাদ করছে!

'মন্দিরের মধ্যে ঢুকে দেখলুম, একদিকে একজন বর্মি ফুঙ্গি বা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী শুয়ে প্রায় অচেতন অবস্থায় ছটফট ও আর্তনাদ করছেন। তাঁর গায়ে হাত দিয়ে দেখলুম, জ্বরে গা যেন পুড়ে যাচ্ছে।

'সুরেনবাবু চিকিৎসাশাস্ত্র জানতেন, তাঁর সঙ্গে ঔষধের বাক্স ছিল। চিকিৎসার গুণে দু-দিন পরে সন্ন্যাসীর অসুখ কিছু কমল। তাঁর মুখে শুনলুম, তিনি ওঙ্কারধামে বেড়াতে এসে এই বিপদে পড়েছেন। কেবল ওঙ্কারধাম নয়, ইতিমধ্যে এখানকার গহন বনের ভিতরে অদৃশ্য, অনেক অজানা বিস্ময় তিনি দেখে এসেছেন।

'সন্ন্যাসীর কাছ থেকে নতুন তথ্য জানতে পারা যাবে বুঝে আমরা প্রাণপণে তাঁর চিকিৎসা ও সেবা করতে লাগলুম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না, হপ্তা খানেক পরে তাঁর অবস্থা একেবারে খারাপ হয়ে পড়ল।

'সুরেনবাবু হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন, আর কোনো আশা নেই। আজকের রাত বোধ হয় কাটবে না।

'গভীর রাত্রে সন্ন্যাসী আচ্ছন্নের মতো বললেন, সুরেনবাবু, আমার কাছে সরে এসো।

'সুরেনবাবু তাঁর মুখের কাছে মুখ নিয়ে বললেন আদেশ করুন।

'সন্ন্যাসী খুব ক্ষীণস্বরে বললেন, সুরেনবাবু, তুমি আর তোমার বন্ধু আমার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করেছ। কিন্তু আমি আর বাঁচব না। মরবার আগে আমি তোমাদের পুরস্কার দিয়ে যেতে চাই।

'সুরেনবাবু বললেন, পুরস্কারের লোভে আমরা আপনার সেবা করিনি।

'-সে কথা আমি জানি। সেই জন্যেই তোমাদের পুরস্কার দিতে চাই, তোমাদের সেবার ঋণ নিয়ে মরব কেন? কিন্তু যে পুরস্কার তোমাদের দেব তা বড়ো সাধারণ পুরস্কার নয়, এর জন্যে পৃথিবীর যেকোনো সম্রাটও লালায়িত হতে পারে। তবে এ পুরস্কার লাভ করবার আগে তোমাদের এক কাজ করতে হবে।

'সুরেনবাবু বললেন, কী কাজ?

'-তোমাদের সঙ্গে দেখছি ইন আর চ্যান রয়েছে। ওদের কালকেই বিদায় করে দিয়ো।

'সুরেনবাবু সবিস্ময়ে বললেন, কেন?

'-ওরা ভালো লোক নয়। ওরা সঙ্গে থাকলে তোমরা বিপদে পড়বে।

'আমাদের দলে জন-বারো কুলি ছিল। চ্যান হচ্ছে তাদের সর্দার। ইন হচ্ছে আমাদের পথপ্রদর্শক। এরা যে অকারণে কেন আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করতে চাইবে, তার কোনো হদিস খুঁজে পেলুম না।

'সন্ন্যাসীর কথা কইতে কষ্ট হচ্ছিল। তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, সুরেনবাবু, আমি বুঝতে পারছি আমার শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে। এখন আমি যা বলব, খুব মন দিয়ে শোনো। এখানে উত্তর-পশ্চিম দিকে একটা ভাঙা হাতির মূর্তি আছে। তার ওপাশে একটা সরু পথ জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চলে গিয়েছে। সেই পথ ধরে তোমরা অগ্রসর হবে। যেখানে পথ নেই, সেইখানে জঙ্গলের ভিতরে পথ করে নেবে-কিন্তু সাবধান, উত্তর-পশ্চিম দিক ছাড়া আর কোনো দিকে যেয়ো না। দু-দিন পরে প্রকাণ্ড এক প্রান্তরে গিয়ে পড়বে। তারপর-এই পর্যন্ত বলবার পরেই সন্ন্যাসীর গলা থেকে ক্রমাগত হেঁচকি উঠতে লাগল।

'খানিকক্ষণ পরে সেই অবস্থাতেই থেমে সন্ন্যাসী বললেন, তারপর সেই প্রান্তরের ভিতরে দেখবে চারিদিকে পাথরে বাঁধানো একটি পুষ্করিণী। তার এক কোণ থেকে পশ্চিমমুখো একটি রাস্তা আছে। সেই রাস্তার শেষে আছে একটি প্রকাণ্ড মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। প্রধান মন্দিরের চারিকোণে আরও চারটি ছোটো ছোটো ভাঙা মন্দিরও আছে!

'সন্ন্যাসীর হাঁপ ও হেঁচকি আরও বেড়ে উঠল। কিন্তু আমাদের আগ্রহ তখন জেগে উঠেছে, বারংবার জিজ্ঞাসা করতে লাগলুম, তারপর-তারপর?

'কিছুক্ষণ পরে অতি কষ্টে তিনি বললেন, বড়ো মন্দিরের মাঝখানে একটি বেদি আছে। তার উপরে আছে ছোটো একটি বুদ্ধমূর্তি। তোমরা সেই মূর্তিকে তুলে নিয়ে-সন্ন্যাসী আবার থেমে গেলেন, তাঁর দুই চোখ মুদে এল।

'সুরেনবাবু তাঁর মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললেন, 'তারপর আমরা কী করব?

'কিন্তু সে কথা সন্ন্যাসী শুনতে পেলেন বলে মনে হল না। যেন নিজের মনেই অস্ফুট স্বরে তিনি বললেন, পদ্মরাগ বুদ্ধ, পদ্মরাগ বুদ্ধ-তারপরেই তাঁর মৃত্যু হল।

'এর পরের কথা আমি খুব সংক্ষেপেই সারব। আমরা সন্ন্যাসীর কথার আসল অর্থ বুঝতে পারলুম না বটে, কিন্তু তাঁর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করলুম। চ্যান আর ইনের প্রাপ্য চুকিয়ে দিয়ে বললুম-আমরা ওঙ্কারধাম ছেড়ে আর কোথাও যাব না, এখানেই হপ্তা দুয়েক থেকে আবার দেশে ফিরব। আমাদের সঙ্গে কেবল চার জন কুলি রেখে বাকি লোক নিয়ে তারা চলে যেতে পারে।

'আমাদের হঠাৎ মতপরিবর্তনে তারা বিস্মিত হল বটে, কিন্তু কোনোরকম সন্দেহ করতে পেরেছে বলে মনে হল না। সেইদিনই তারা বিদায় গ্রহণ করলে।

'সেই অজ্ঞাত মন্দিরে গিয়ে কী দেখব আর কী লাভ হবে, তা আন্দাজ করতে পারলুম না, কিন্তু কী একটা রহস্যের নেশায় আমাদের কৌতূহল এমন ভাবে জেগে উঠল যে পরদিনই উত্তর-পশ্চিম দিকে যাত্রা করলুম।

'সেই প্রান্তরে, পুষ্করিণী আর চারটি ছোটো মন্দিরের মাঝখানে প্রধান একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ,-সমস্তই পাওয়া গেল। বড়ো মন্দিরের ভিতরে পাথরের বেদির উপরে একটি বুদ্ধমূর্তি বেদির সঙ্গে গাঁথা ছিল। আমরা গাঁথুনি থেকে মূর্তিটিকে খুলে নিলুম। কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও সেখানে উল্লেখযোগ্য আর কিছুই আবিষ্কার করতে পারলুম না। সম্রাটেরও পক্ষে লোভনীয় কোনো পুরস্কারই সেখানে ছিল না-যদিও আমাদের মতো প্রত্নতাত্ত্বিকের পক্ষে লোভনীয় অনেক পুরাতন জিনিসই সেখানে দেখতে পেলুম। বিশেষ, হাজার বছর পুরানো যে শিলালিপি সেখানে পেয়েছি, তাইতেই আমাদের সমস্ত পরিশ্রম সার্থক হয়েছে।

'সেখান থেকে ফিরে আসবার সময় সুরেনবাবু খুশি হয়ে বললেন, সন্ন্যাসী বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলেন, কীসের লোভে আমরা এদেশে এসেছি! যে শিলালিপি আমরা পেয়েছি, তার চেয়ে অমূল্য সম্পদ আর কী থাকতে পারে?

'জয়ন্তবাবু, চোর আজ যে বুদ্ধমূর্তিটি চুরি করবার চেষ্টা করেছিল, ওইটিকেই আমরা সেই বড়ো মন্দিরের ভিতরে পেয়েছিলুম। কিন্তু ও মূর্তি নিয়ে চোরের কী লাভ হত, এ কথাটা কিছুতেই আমি বুঝতে পারছি না।'

জয়ন্ত অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, 'অমলবাবু, আপনি বলছেন যে সন্ন্যাসীর শেষ কথা হচ্ছে পদ্মরাগ বুদ্ধ? কিন্তু পদ্মরাগ বুদ্ধ নামে কোনো বুদ্ধমূর্তির কথা তো আমি কখনো শুনিনি?'

অমলবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'আমিও শুনিনি।'

মানিক বললে, 'কিন্তু পদ্মরাগ মণি বলে মহামূল্যবান মণি আছে!'

জয়ন্ত অস্ফুট কণ্ঠে বললে, 'সন্ন্যাসী এমন পুরস্কার দিতে চেয়েছিলেন, যার জন্যে পৃথিবীর যেকোনো সম্রাট লালায়িত হতে পারেন। এঁরা ওখান থেকে এনেছেন চুনাপাথরের গড়া এক বুদ্ধমূর্তি, আর একখানা শিলালিপি, -রাজা মহারাজার কাছে যা তুচ্ছ! অথচ এই সামান্য বুদ্ধমূর্তিও চোরে চুরি করতে চায়, এর জন্যে মানুষ খুন করতেও ভয় পায় না! আশ্চর্য রহস্য!' সে বুদ্ধমূর্তির ভাঙা মাথাটা টেবিলের উপরে নামিয়ে রেখে দেহটা আবার তুলে নিলে। তারপর তাকে উলটে ধরে খানিকক্ষণ পরীক্ষা করে বললে, 'দেখো মানিক, এর তলার দিকটা!'

মানিক দেখলে, মূর্তির তলায় খানিকটা জায়গায় গুঁড়ো পাথরের প্রলেপ মাখানো হয়েছে! সে বললে, 'এখানে একটা ছ্যাঁদা ছিল। এখন ভরাট করে দেওয়া হয়েছে!'

জয়ন্ত হঠাৎ মূর্তিটা উচুঁতে তুলে ধরে মাটির উপরে সজোরে নিক্ষেপ করলে, সেটা সশব্দে চূর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

অমলবাবু হাঁ হাঁ করে বলে উঠলেন, 'কী করলেন, কী করলেন! ওর পিছনে যে ব্রাহ্মী লিপি ছিল।'

জয়ন্ত সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে হেঁট হয়ে ভাঙা টুকরোর ভিতর থেকে একটা জিনিস নিয়ে সকলের চোখের সামনে তুলে ধরলে।

জিনিসটা তামার একটা কৌটোর মতো-অনেকটা বিলাতি সেভিংস্টিকের কৌটোর মতন দেখতে, তেমনি গোল, কিন্তু তার চেয়ে লম্বা, প্রায় এক বিঘত হবে!

জয়ন্ত বললে, 'মূর্তির ভিতরে খুদে এই কৌটোটা পুরে, তলার ছ্যাঁদা আবার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।'

অমলবাবু খানিকক্ষণ হতভম্বের মতো চুপ করে থেকে বললেন, 'ও কৌটোর ভিতর কী আছে?'

-'সেইটেই এখন দেখতে হবে। কারণ, এর ভিতর যা আছে, তার লোভেই আজ এখানে চোরের আবির্ভাব হয়েছিল!' সে কৌটোর ঢাকুনি খুলে তার ভিতর থেকে বার করলে একটি চাবি ও একটি সোনার চাকতি!

অমলবাবু বললেন, 'ও আবার কী?'

জয়ন্ত জবাব না দিয়ে চাকতিটা খানিকক্ষণ পরীক্ষা করে বললে, 'এতে কী একটা নকশা খোদা রয়েছে।'

-'নকশা?'

'হ্যাঁ,' বলেই সে টেবিলের ধারে আলোর কাছে গিয়ে বসল। তারপর পকেট থেকে কাগজ, পেনসিল ও ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস বার করলে। বাঁ-হাতে চাকতির উপরে ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস ও ডান হাতে কাগজের উপরে পেনসিল ধরে সে তখনি তাড়াতাড়ি আর একখানা বড়ো নকশা তৈরি করে ফেললে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে কাগজে আঁকা নকশাখানা অমলবাবুর হাতে সমর্পণ করলে।

অমলবাবু কাগজখানার দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'এ যে প্রান্তরের সেই মন্দিরের নকশা! এই মন্দিরেই আমরা ওই বুদ্ধমূর্তি পেয়েছি।'

জয়ন্ত খুব খুশিমুখে পকেট থেকে রুপোর নস্যদানি বার করে দু-বার নস্য নিয়ে বললে, 'তাহলে আসুন অমলবাবু! এই টেবিলের ধারে বসুন! ভালো করে আপনি একবার নকশাখানা দেখুন। আমার মনে হচ্ছে, সন্ন্যাসী যা বলে যেতে পারেননি, আমরা এইবারে সেই গুপ্তকথাটা জানতে পারব! পদ্মরাগ বুদ্ধ! পদ্মরাগ বুদ্ধ! রহস্যময় নাম।'

অমলবাবু নকশার কাগজখানার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে অনেকক্ষণ বসে রইলেন। তারপর বললেন, 'দেখুন জয়ন্তবাবু, এখানা যে সেই মন্দিরের নকশা, তাতে আর একটুও সন্দেহ নেই। সেই চার-ঘাটওয়ালা পুকুর, তার কোনাকুনি রাস্তা, চারিদিকে চারটি ছোটো আর মাঝখানে প্রধান মন্দির, এমনকী কালো পাথরের লম্বাটে বেদিটি পর্যন্ত মিলে যাচ্ছে, কিন্তু কোনো কোনো জায়গায় অমিল রয়েছে।'

জয়ন্ত নকশার উপরে ঝুঁকে পড়ে বললে, 'কী কী মিলছে না, আমাকে ভালো করে বুঝিয়ে বলুন।'

-'মন্দিরের ভিতরে, বেদির সামনে সিঁড়ির মতন ওটা কী আঁকা রয়েছে? আমার বেশ মনে আছে, মন্দিরের ভিতরে ওরকম কিছুই আমাদের চোখে পড়েনি।'

-'তারপর?'

-'পুকুরের পশ্চিম কোণে তিনকোনা ওই কালো অংশটাই বা কী? মন্দিরের বেদির মাঝখানে একটি সাদা জায়গা আছে-ওইখানেই আমরা বুদ্ধমূর্তি দেখেছিলুম। কিন্তু পুকুরের কোণেও কালোর মাঝখানে সাদা চিহ্ন আছে, বুঝতে পারছি না। পুকুরের ওখানে আমরা জল ছাড়া আর কিছুই দেখিনি।'

-'আর কোনো অমিল দেখতে পাচ্ছেন?'

-'না। তবে মন্দির থেকে পুকুরে আসবার পথের উপরে তিনটে তির চিহ্ন রয়েছে কেন?'

জয়ন্ত নকশার দিকে চেয়ে খানিকক্ষণ ভেবে বললে, 'আমার মাথায় কতকগুলো সন্দেহের উদয় হচ্ছে! কিন্তু সেগুলো এখন প্রকাশ করে লাভ নেই, কারণ সেসব সন্দেহ অমূলক হতেও পারে। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি যে অমিলের কথা বলছেন, তারই মধ্যে পদ্মরাগ বুদ্ধের সমস্ত রহস্য লুকিয়ে আছে।'

অমলবাবু বললেন, 'জয়ন্তবাবু, আমার আর একটা কথা মনে পড়ছে। ওঙ্কারধামে যাবার আগে আমরা শ্যামদেশেও বেড়াতে গিয়েছিলুম। সেখানে একটা জনপ্রবাদ শুনেছি। ও অঞ্চলে কোথায় নাকি এক মূল্যবান বুদ্ধমূর্তি আছে, তা নাকি দুর্লভ মণিমাণিক্য কেটে একসঙ্গে জুড়ে জুড়ে গড়া! কিন্তু সে মূর্তির ঠিকানা কেউ জানে না! অবশ্য এটা আমরা জনপ্রবাদ বলেই উড়িয়ে দিয়েছি, কারণ জনপ্রবাদ অসম্ভবকেই সম্ভব করতে চায়!'

মানিক বললে, 'ভেবে দেখো জয়ন্ত, পদ্মরাগও হচ্ছে মহা মূল্যবান মণি! এই মণি দিয়ে যদি বুদ্ধমূর্তি গড়া হয়, তবে তার পদ্মরাগ বুদ্ধ নাম হওয়া খুবই স্বাভাবিক!'

জয়ন্ত বললে, 'সন্ন্যাসীও এমন পুরস্কার দিতে চেয়েছিলেন, যার জন্যে পৃথিবীর যেকোনো সম্রাট লালায়িত হতে পারেন!'

-'পদ্মরাগ বুদ্ধ! আমাদের অনুমান যদি সত্য হয়, তবে সে মূর্তি সম্রাটের পক্ষেও লোভনীয় বটে!'

-'পদ্মরাগ বুদ্ধ! সে মূর্তি কত বড়ো? কতগুলো পদ্মরাগ মণি দিয়ে সে মূর্তি গড়া হয়েছে? মানিক, এই অসম্ভব সম্পদের কথা ভাবতেও আমার মাথা ঘুরে যাচ্ছে!'

অমলবাবু মাথা নেড়ে হেসে বললেন, 'কিন্তু সেই মণিময় বুদ্ধ কোথায় লুকিয়ে আছেন, কেউ তা জানে না!'

জয়ন্ত বললে, 'অমলবাবু লোভের মহিমা দেখুন! মণিময় বুদ্ধের নাম শুনেই আমি পরম ভক্ত বৌদ্ধ হয়ে পড়েছি!'

-'কিন্তু জয়ন্তবাবু, এটাও ভুলে যাবেন না যে, সারা মন্দির তন্নতন্ন করে খুঁজেও আমরা চুনাপাথরে গড়া বুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই পাইনি!'

জয়ন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, 'আপনিও ভুলে যাবেন না যে, এই চুনাপাথরে গড়া মূর্তির মধ্যে আমরা পেয়েছি একটি চাবি আর নকশা আঁকা চাকতি! বুদ্ধমূর্তির মধ্যে এমন দুটো জিনিস লুকিয়ে রাখবার কথা কে কবে শুনেছে? এত লুকোচুরির কারণ কি অত্যন্ত অসামান্য নয়? সেই কারণটাই কি বুঝিয়ে দিচ্ছে না যে আমরা কল্পনাতীত কোনো সুদুর্লভ বস্তু লাভ করতে পারি? এই জন্যেই এমন একটি সাধারণ মূর্তির লোভে কেউ নরহত্যা করেছে, হয়তো আজ আপনাকেও খুন করত! কীসের এই চাবি? চাবিটা যেরকম বড়ো, তাতে মনে হচ্ছে, এর দ্বারা খুব বড়ো কুলুপই খোলা যায়! সে কুলুপ কোথায় লাগানো আছে? আপনার মতে, এই চাকতির উপরে সেই ভাঙা মন্দিরের নকশা আছে। কিন্তু নকশার ওই সিঁড়ির রহস্যটাই বা কি? ওরকম কোনো সিঁড়ি আপনি দেখতে পাননি বটে, কিন্তু নিশ্চয়ই ও সিঁড়ি কাল্পনিক নয়-নকশার সবটাই যখন মিলছে তখন ও সিঁড়ি কাল্পনিক হতে পারে না, ওর অস্তিত্ব আছেই।'

অমলবাবু দৃঢ় স্বরে বললেন, 'না ওর অস্তিত্ব নেই!'

জয়ন্তও দৃঢ় স্বরে বললে, 'কিন্তু আমি যদি ওর অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারি?'

-'কেমন করে ?'

-'ওঙ্কারধামে গিয়ে।'

-'ওঙ্কারধামে গিয়ে? সে যে হবে মরীচিকার পিছনে ছোটার মতো। ওই অদৃশ্য সিঁড়ি, আর পুকুরের কোণে আর এক অদৃশ্য রহস্য, এরা কোন জাদুমন্ত্রে আবার দৃশ্যমান হবে?'

-'বুদ্ধির জাদুমন্ত্রে অমলবাবু, বুদ্ধির জাদুমন্ত্রে!'

অমলবাবু আহত কণ্ঠে বললেন, 'অদৃশ্য সিঁড়ি দেখতে পাইনি বলে আপনি কি আমাকে এক নম্বরের গাধা বলে মনে করেন?'

জয়ন্ত ব্যস্ত ভাবে বললে, 'না, না অমলবাবু, আপনাকে বোকা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়! আমার বক্তব্য হচ্ছে, পৃথিবীর বুদ্ধিমান লোকরাও সকল ক্ষেত্রে সমান ভাবে বুদ্ধিকে ব্যবহার করতে পারে না। ধরুন প্রত্নতত্ত্বের কথা। ও বিভাগে আপনার তুলনায় আমার বুদ্ধি একেবারেই অকেজো। আবার, আমার বিভাগে আপনার মাথাও বেশি সুবিধা করে উঠতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না। এই চাবি আর সোনার চাকতির ব্যাপারটাই ভেবে দেখুন না! বুদ্ধদেবের মূর্তি আপনাদের কাছে এতদিন ধরে রয়েছে, তবু এমন দুটো অদ্ভুত জিনিস আপনারা আবিষ্কার করতে পারেননি! আর একটা প্রমাণ হাতে হাতেই দিতে পারি। এখানে এসেই আমি যখন বারান্দায় গিয়েছিলুম, তখন কতকগুলো কাদামাখা পায়ের দাগ চোখে পড়েছিল! এতক্ষণ সেগুলো পরীক্ষা করবার সময় পাইনি, এইবারে তাদের কাছে যাওয়া যাক। আসুন অমলবাবু, এসো মানিক!'

সকলে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন। লম্বা বারান্দায় সারি সারি পায়ের দাগ রয়েছে, তার অনেকগুলোই বেশ স্পষ্ট।

জয়ন্ত বললে, 'এগুলো নিশ্চয়ই চোরের পায়ের দাগ! আচ্ছা অমলবাবু, এই দাগগুলো দেখে আপনার কী মনে হয়?'

অমলবাবু সেগুলোর উপরে একবার চোখ বুলিয়ে বললেন। 'কী আবার মনে হবে? ওগুলো হচ্ছে চোরের পায়ের দাগ!'

জয়ন্ত হেঁট হয়ে পড়ে দাগগুলো তীক্ষ্ণ নেত্রে পরীক্ষা করতে করতে বললে, 'আর কিছু মনে হয় না?'

অমলবাবু বললেন, 'আমার মনে হয় দাগগুলো অতিরিক্ত বড়ো! . . . কিন্তু জয়ন্তবাবু, পায়ের দাগ নিয়ে অত বেশি মাথা ঘামাবার কী আছে? আসামি যখন পলাতক, তখন ওই দাগগুলোর ভিতর থেকে তাকে তো আর গ্রেপ্তার করা যাবে না!'

কিন্তু সেকথা বোধ হয় জয়ন্তের কানে ঢুকল না। পকেট থেকে নস্যদানি বার করে সে ঘন ঘন নস্য নিতে লাগল, নীরবে!

তারপর সে বললে, 'পৃথিবীতে যেদিন থেকে অপরাধ সৃষ্টি হয়েছে, সেই দিন থেকেই যেসব প্রমাণের জোরে অপরাধী ধরা পড়েছে তাদের মধ্যে পায়ের দাগই হচ্ছে প্রধান!' একটু থেমে, হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে সে আবার বললে, 'অমলবাবু, আমি একটি লোকের চেহারার কথা বলব, তাকে আপনি চেনেন কি? মাথায় সে খুব ঢ্যাঙা, মাপলে সাত ফুটও হতে পারে। তার দেহ রীতিমতো হৃষ্টপুষ্ট। তার গায়ে অসুরের মতন জোর। সে ডান পাশে একটু বেশি হেলে পড়ে হাঁটে। আর-আর তার ডান পায়ের কড়ে আঙুল নেই!'

প্রথমে অমলবাবু হতভম্বের মতন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। তারপর তাঁর মুখে-চোখে গভীর বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠল। তিনি তাড়াতাড়ি বললেন, 'জয়ন্তবাবু, আপনি চ্যানকে চিনলেন কেমন করে?'

জয়ন্ত দুই ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসার স্বরে বললে, 'চ্যান?'

-'হ্যাঁ, হ্যাঁ চ্যান। ওঙ্কারধামে সে আমাদের কুলির সর্দার ছিল। সন্ন্যাসীর কথায় তাকে আর তার বন্ধু ইনকে আমরা বিদায় করে দিয়েছিলুম। আপনার মুখে এখনি অবিকল চ্যানেরই বর্ণনা শুনলাম, আর তাকে আপনি চেনেন না!'

জয়ন্ত আর এক টিপ নস্য নিয়ে খুশিমুখে বললে, 'না চ্যানকে আমি চিনি না! তাহলে চ্যানের দেহ হচ্ছে বেজায় ঢ্যাঙা, জোয়ান আর মোটাসোটা?'

-'হ্যাঁ! আর তার ডান পায়ের কড়ে আঙুল নেই!'

-'উত্তম! মানিক, কাল ভোরে উঠেই আগে আমাদের বন্ধু ইনস্পেক্টার সুন্দরবাবুকে ফোন করে সব কথা জানিয়ো। চ্যানের নামে কালকেই যেন ওয়ারেন্ট বার করা হয়। কারণ খুব সম্ভবত সুরেনবাবুকে সেইই খুন করেছে। আর আজকে চ্যানই যে অমলবাবুকে খুন করতে উদ্যত হয়েছিল, তার প্রমাণ ওই পদচিহ্ন!'

অমলবাবু অভিভূত স্বরে বললেন, 'জয়ন্তবাবু, কী বলছেন! চ্যান কি কলকাতায় আছে?'

-'পদচিহ্ন তো সেই সাক্ষ্যই দিচ্ছে!'

-'পদচিহ্ন! অসম্ভব, পায়ের দাগে কি চেহারার বর্ণনা লেখা থাকে?'

'থাকে। এ বর্ণনা পড়তে পারে কেবল বিশেষ বুদ্ধি। পায়ের দাগগুলো আর একবার ভালো করে দেখুন, বর্ণনা পড়তে বেশি সময় লাগবে না। আপনিও তো দেখেছেন, পায়ের ছাপগুলো অতিরিক্ত বড়ো! সাধারণত ছোটো চেহারার পায়ের দাগ এত বড়ো হয় না। তারপর প্রত্যেক পদচিহ্নের মাঝখানকার ব্যবধান লক্ষ করে দেখুন। এই ব্যবধানের মাপ দেখেও আকৃতির আন্দাজ করা যায়। বেঁটে লোকের চেয়ে ঢ্যাঙা লোকেরা বেশি তফাতে পা ফেলে হাঁটে। দাগগুলো কীরকম স্পষ্ট দেখেছেন? হালকা দেহ বহন করে যেসব পা, তাদের ছাপ আরও কম স্পষ্ট হত। ডান পায়ের প্রত্যেক ছাপের ডান পাশটা বেশি চেপে মাটির উপর পড়েছে; কারণ এগুলো যার পায়ের দাগ, সে ডান পাশে বেশি হেলে হাঁটে। তার ডান পায়ের কড়ে আঙুল যে নেই,

এ সত্য তো ছাপ দেখে বালকরাও ধরতে পারবে! আর তার গায়ের জোর তো আমরা সকলেই দেখেছি! সে আজ চোখের পলকে আপনার অতবড়ো পালোয়ান দরোয়ানকে কুপোকাত করে সরে পড়েছে! দেখছেন তো অমলবাবু, আমাকে বেশি বুদ্ধি খরচ করতে হয়নি, আমি কেবল বুদ্ধির যথা ব্যবহার করেছি। সাধারণ লোকে যা করতে পারে না।'

অমলবাবু অস্ফুটস্বরে বললেন, 'কিন্তু চ্যান এসেছিল আমাকে খুন করতে! কোথায় কাম্বোডিয়া, আর কোথায় কলকাতা! কী আশ্চর্য।'

-'এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই! ওঙ্কারধামের সন্ন্যাসী তো চ্যান আর ইন সম্বন্ধে আপনাদের আগেই সাবধান করে দিয়েছিলেন! নিশ্চয়ই তিনি জানতেন যে চ্যান আর ইন পদ্মরাগ বুদ্ধের সন্ধানে আছে! পদ্মরাগ বুদ্ধকে লাভ করতে হলে যে চুনাপাথরে গড়া বুদ্ধ মূর্তিটিকে দরকার, চ্যান কোনোগতিকে সেটাও টের পেয়েছে। ওই মূর্তি এখন আপনার দখলে তাই শত্রুর দৃষ্টি আপনার উপরেই পড়েছে! এতক্ষণে সব রহস্য তো বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল!'

অমলবাবু সভয়ে বললেন, 'আমি তো পদ্মরাগ বুদ্ধ চাই না, তবে আমার প্রাণ নিয়ে এত টানাটানি কেন?'

জয়ন্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললে, 'কে বলে আপনি পদ্মরাগ বুদ্ধ চান না? এক হপ্তার ভিতরেই আপনার সঙ্গে আমরাও যে পদ্মরাগ বুদ্ধকে আনবার জন্যে ওঙ্কারধামে যাত্রা করব!'

-'বলেন কী মশাই? একটা জনপ্রবাদের পিছনে দৌড়ে অপঘাতে মারা পড়ব? পদ্মরাগ বুদ্ধের মূল্য যদি লক্ষ কোটি টাকাও হয়, তাহলেও ওর মধ্যে আমি নেই। আপাতত কেবল চ্যানের সাংঘাতিক অনুগ্রহ থেকে আমাকে রক্ষা করুন, প্রতিদানে ওই চাবি আর চাকতি আপনাদের হাতে আমি সমর্পণ করলুম। পদ্মরাগ বুদ্ধ পেলে সে মূর্তি নিয়ে আপনারা যা-খুশি তাই করতে পারেন, তার উপরে আমার আর একটুও লোভ নেই।'

মানিক বললে, 'আচ্ছা, ওসব কথা পরে হবে তখন। কিন্তু আপাতত এইটেই আমি বুঝতে পারছি না যে, বিদেশি লোক হয়েও চ্যান কী করে অমলবাবুর বাড়ির অন্ধিসন্ধির সব খবর রেখেছে? সে কেমন করে জানলে, অমলবাবুর ঘরের কোথায় বুদ্ধমূর্তি আছে, আর গৃহকর্তা নিদ্রিত? বুঝে দেখো জয়, চ্যান অন্ধকারেই ঘরে ঢুকে মূর্তিটিকে অনায়াসে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল!'

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি মানিকের পিঠ চাপড়ে খুশি কণ্ঠে বললে, 'শাবাশ মানিক, শাবাশ! তুমি খুব বড়ো প্রশ্ন তুলেছ, একথা তো আমার মাথাতেও ঢোকেনি! চ্যান এত হাঁড়ির খবর রাখলে কী করে?'

অমলবাবু বললেন, 'আপনাদের কথা শুনে আর একটা কথা এখন আমার মনে পড়ছে। আজ কিছুদিন ধরে লক্ষ করছি, এই পাড়ায় চার-পাঁচজন বর্মি লোক প্রায় আনাগোনা করে। দেখলে মনে হয় যেন তারা এই পাড়ারই বাসিন্দা!'

জয়ন্ত বললে, 'তাই নাকি? তাহলে তারা নিশ্চয়ই এই বাড়ির উপরে পাহারা দেয়! কিন্তু তারা ঘরের ভিতরকার খোঁজ রাখলে কেমন করে? আচ্ছা অমলবাবু, পথের ওপাশে ওই মস্ত বাড়িখানায় কে থাকে বলতে পারেন?'

-'ওটা মেসবাড়ির মতো। ওখানে দেশ-বিদেশের লোক থাকে কিন্তু তারা কেউ বাঙালি নয়।'

-'তাহলে ও বাড়ির তিনতলার ঘর থেকে আপনার এই ঘরের ভিতরে নজর রাখা খুবই সহজ দেখছি! কে বলতে পারে এই মুহূর্তেই ওখানে বসে কেউ আমাদের গতিবিধি লক্ষ করছে কি না?'

অমলবাবু চমকে উঠলেন, ম্লান মুখে বললেন, 'বলেন কী? আমি কি তবে শিয়রে শমন নিয়ে বাস করছি?'

জয়ন্ত বললে, 'আচ্ছা, একটা পরীক্ষা করা যাক। আমরা দু-জনে আপনাকে নমস্কার করে ঘর থেকে বেরিয়ে যাই। আপনিও প্রতিনমস্কার করে ঘরের আলো নিবিয়ে দিন। যদি কোথাও শত্রু জেগে থাকে, সে মনে করবে আমরা বিদায় হয়েছি, আর আপনি আবার শুয়ে পড়েছেন। এই পরীক্ষার ফল কী হয়, দেখা যাক।'

কথামতো কাজ হল। জয়ন্ত ও মানিক ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়াল, ঘরের আলো নিবে গেল এবং তার পরেই রাস্তার দিক থেকে ভেসে এল একটা তীক্ষ্ণ বাঁশির আওয়াজ।

জয়ন্ত বললে, 'যা ভেবেছি তাই! আমাদের উপরে কড়া পাহারা বসেছে! কেউ বোধ করি বাঁশির সংকেতে তাদের জানিয়ে দিলে যে, সবাই হুঁশিয়ার হও, শত্রুরা এখনি রাস্তায় বেরুবে! ওরা কি আমাদেরও পথে আক্রমণ করতে চায়? ওরা কি ও বাড়ি থেকে দেখেছে যে, চাবি আর চাকতি আমার পকেটে ঢুকেছে? আচ্ছা, এসো! আর একবার অন্ধকারে অমলবাবুর ঘরে ঢোকা যাক!'

জয়ন্ত আস্তে আস্তে বারান্দার দরজার কাছে দাঁড়াল। তখন বৃষ্টির প্রবল ঝোঁকটা কেটে গেছে বটে, কিন্তু জল তখনও ঝিমঝিম করে ঝরছিল, রাস্তা দিয়ে তখনও হাঁটু-ভোর জলের ধারা কলকল করে ছুটছিল এবং শেষ রাতের আকাশের বুকে পুরু মেঘের কালো পর্দা ছিঁড়ে তখনও থেকে থেকে বিদ্যুতের অগ্নি-অক্ষরগুলো ঝকমক করে জ্বলে উঠছিল। সেই মুহূর্তেই আবার বিদ্যুৎ ফুটল এবং জয়ন্ত স্পষ্ট দেখলে, ওপাশের বাড়ির তিনতলার বারান্দা থেকে একটা মূর্তি রেলিংয়ের উপরে সাগ্রহে ঝুঁকে পড়ে নীচের দিকে তাকিয়ে আছে!

ক্ষণিক আলোতে তাকে ভালো করে দেখা গেল না-কিন্তু কে সে? চ্যান, না আর কেউ?

একটিমাত্র ঢিল ও দুইটি পক্ষী

অমলবাবু সভয়ে বলে উঠলেন, 'কী ভয়ানক! দেখুন জয়ন্তবাবু দেখুন! সত্যিই তো, ও বাড়ির বারান্দায় একটা লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে! এই শেষ রাতে, এমন দুর্যোগে রাস্তার দিকে অত আগ্রহে ঝুঁকে পড়ে ও লোকটা কী দেখছে?'

জয়ন্ত বললে, 'এতক্ষণ ও লোকটা নিজের অন্ধকার ঘরে বসে আমাদের ঘরের সমস্ত দৃশ্য লক্ষ করছিল। এখন ও বেরিয়ে এসে দেখছে যে, চাবি আর চাকতি নিয়ে আমরা পথে বেরিয়েছি কি না! আমরা পথে বেরুলেই বোধ হয় আমাদের উপরে আক্রমণ হবে!'

-'সর্বনাশ! তাহলে আপনারা কী করবেন?'

জয়ন্ত হেসে বললে, 'অমলবাবু, আমার চেহারা দেখছেন তো? আমরা শত্রুদের গায়ে কত জোর আছে জানি না, তবে আমি যে একবার একটা খ্যাপা ষাঁড়কে ধরে মাটির উপর কাত করেছিলুম, মানিক সে সাক্ষ্য দিতে পারে! কুস্তি-বক্সিং আমরা দু-জনেই জানি। সুতরাং পথে বেরুতে আমাদের কোনো ভয় নেই। কিন্তু অকারণে অশান্তি সৃষ্টি না করে আজ আমরা এইখানেই রাতটা কাটাতে চাই। এতে আপনার আপত্তি নেই তো?'

অমলবাবু বললেন, 'অশান্তি? বিলক্ষণ! আপনারা কাছে থাকলে আমি তো ধড়ে প্রাণ পাই! যদি চ্যান আবার আসে?'

জয়ন্ত বললে, 'আজ আর সে এখানে বেড়াতে আসবে না। বরং কাল সকালে আমরাই ওই সামনের বাড়িটায় বেড়াতে যাব।'

-'বলেন কী, ওই বাঘের বাসায়?'

-'কেন, আপনি তো বললেন ওটা হচ্ছে মেসবাড়ি! তা যদি হয়, তাহলে ওখানে আরও অনেক লোক নিশ্চয়ই বাস করে? আমরা ওখানে ঘর ভাড়া করতে বা কোনো চেনা লোককে খুঁজতে যাব! দিনের বেলায় পাঁচজনের বাসায় নিশ্চয়ই কেউ আমাদের গলায় ছুরি বসাতে সাহস করবে না।'

মানিক বললে, 'কিন্তু ওখানে গিয়েই বা আমাদের কী লাভ হবে?'

-'প্রথম লাভ হবে এই যে চ্যান ওখানে আছে কি না সেটা জানতে পারব। অমলবাবু তার চেহারার যে বর্ণনা দিয়েছেন, চ্যানকে চিনে নিতে আমাদের একটুও বিলম্ব হবে না। দ্বিতীয় লাভ হবে, চ্যান ওখানে থাকলে কাল সকালেই তার হাতে হাতকড়ি দেবার ব্যবস্থা করব।'

-'কী অপরাধে, আর কী প্রমাণে?'

-'চ্যানই যে সুরেনবাবুকে খুন করেছে, আমাদের হাতে আপাতত তার কোনো প্রমাণ নেই বটে। কিন্তু চ্যান যে এই বাড়িতে দেওয়াল বেয়ে উঠে চুরি করতে এসেছিল আর অমলবাবুকে খুন করবার চেষ্টা করেছিল তার স্পষ্ট প্রমাণ হচ্ছে বারান্দায় ওই পদচিহ্নগুলো। এই প্রমাণের জোরেই তাকে এখন অনেককালের জন্যে জেল খাটানো যেতে পারে। প্রধান শত্রুকে সরাতে পারলে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে কাম্বোডিয়ায় গিয়ে বনবাসী হতে পারব।'

অমলবাবু বললেন, 'কিন্তু জয়ন্তবাবু, আপনি ইনের কথা ভুলে যাচ্ছেন কেন? সন্ন্যাসীর কথা মানলে বলতে হয়, ইনও আমাদের মস্ত শত্রু। সে কোথায় আছে?'

জয়ন্ত বললে, 'তারও চেহারার সঙ্গে আমাদের পরিচয় থাকা দরকার তো! অমলবাবু, অঃতপর আপনি ইনের রূপবর্ণনা করুন!'

অমলবাবু বললেন, 'চ্যান যেমন অসাধারণ ঢ্যাঙা, ইন তেমনি অসাধারণ বেঁটে, মাথায় সে চার ফুটের বেশি তো হবেই না, বরং কম হওয়া সম্ভব। কিন্তু নিজের দীর্ঘতার অভাব সে মিটিয়ে নিয়েছে অসাধারণ মোটা হয়ে! দূর থেকে তাকে দেখলে মনে হয়, যেন একটি গোলাকার পদার্থ জাদুকরের মন্ত্রে হঠাৎ জ্যান্ত হয়ে পৃথিবীর উপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে! কিন্তু এত মোটা ও বেঁটে হলেও ইন অত্যন্ত চটপটে আর চুলবুলে। সে ছোটো ক্রিকেট বলের মতো আর মাটি থেকে লাফ মারে টেনিস বলের মতো। চ্যানের লম্বা-চওড়া চেহারা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে বটে, কিন্তু ইনকে দেখলে একেবারেই অবাক হয়ে যেতে হয়! আবার চ্যান ও ইনকে একসঙ্গে দেখলেই মনে হয় ভগবানের অপূর্ব সৃষ্টি বৈচিত্র্যের কথা!'

জয়ন্ত বললে, 'চমৎকার! মানিক, এমন উজ্জ্বল বর্ণনা শোনবার পর আর কি ইনকে চিনে নিতে আমাদের কষ্ট হবে?'

মানিক বললে 'নিশ্চয়ই নয়! অমলবাবু একখানা কথার ফোটোগ্রাফ তুলে আমাদের দান করলেন!'

-'ফোটোগ্রাফ নয় মানিক, এ হচ্ছে এক্সপ্রেশানিস্ট চিত্রকরের আঁকা ছবি; এ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এঁকে এঁকে কিছু দেখালে না, কিন্তু মূল ভাবটি হুবহু প্রকাশ করলে। তুমি যদি ইনের সত্যিকার একখানা ফোটোগ্রাফও হাতে পেতে, তাহলেও তার স্বরূপ এত সহজে ধরতে পারতে না! কিন্তু যাক সেকথা! ভোরের পাখি ডাকবার আগে আপাতত একটুখানি স্বপ্নলোকটা দেখবার চেষ্টা করা দরকার!'

পরদিন বেলা সাতটার সময়ে আকাশের বিরাট কুম্ভ শূন্য হয়ে গেল-এখন আর এক ফোঁটাও বৃষ্টি নেই। এবং সূর্যের তাপে মেঘগুলোও মোমের মতন গলে মিলিয়ে গেল। রাস্তার ময়লা জল কমেছে বটে, কিন্তু এখনও জুতো না ভিজিয়ে পথ চলবার উপায় নেই।

অন্যদিনে এ সময়ে বিচিত্র জনতার অনৈক্যতানে রাজপথের তন্দ্রা ছুটে যায়, আর এখনও তার ঘুম ঘুম ভাব দূর হয়নি। যার নিতান্ত দায়, সেই-ই পথে পা বাড়িয়েছে। অনেক দোকান এখনও বন্ধ, ফিরিওয়ালাদের আর্তনাদ প্রায় স্তব্ধ, মোটররা এখনও মানুষ মৃগয়ার লোভে উৎসাহিত হয়নি।

জয়ন্ত ও মানিক যখন রাস্তার ওপাশের মস্ত বাড়িখানার সুমুখে গিয়ে দাঁড়াল, তখনও তার ভিতর থেকে জীবনের কোনো কচকচিই জাগেনি।

একটা বুড়ো হিন্দুস্থানি দ্বারবান সদর দরজার চৌকাঠে বসে দাঁতন কাঠি চর্বণ করছিল, জয়ন্ত তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'দ্বারবানজি, এ বাড়িতে ঘর ভাড়া পাওয়া যায়?'

দ্বারবান একটু বিস্মিত ভাবে জানালে যে এখানে ঘর আছে বটে, কিন্তু বাঙ্গালিবাবুদের থাকবার সুবিধা হবে না।

জয়ন্ত বললে, 'সেকথা আমিও বুঝি দ্বারবানজি! কিন্তু আমি তো এখানে পরিবার নিয়ে থাকব না, খান দুই-তিন ঘর ভাড়া নিয়ে আমি এখানে আপিস করব, মাড়োয়ারি আর পশ্চিমা লোক নিয়েই আমার কারবার

কিনা!'

দ্বারবান জানালে, তিনতলার চারখানা ঘর খালি আছে, বাবুরা উপরে গিয়ে দেখতে পারেন।

-'তিনতলায়? সেখানে আর ক-ঘর ভাড়াটে আছে?'

শোনা গেল তিনতলায় রাস্তার দিকে দু-খানা ঘর নিয়ে পাঁচ-ছয় জন বর্মি লোক আছে। ভিতরের দিকে আছে একঘর মাদ্রাজি। বর্মিদের ঘরের পাশেই দু-খানা ঘর খালি আছে।

জয়ন্ত আর কিছু জিজ্ঞাসা না করে দ্বারবানের কাছ থেকে চাবি নিয়ে মানিকের সঙ্গে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করল।

সিঁড়ি দিয়ে তারা উপরে উঠতে লাগল। কলকাতার অধিকাংশ মেসবাড়ির-বিশেষত যেখানে অবাঙালির বাস-সিঁড়ি হচ্ছে অত্যন্ত ঘৃণাকর স্থান। তার ধাপে চোখে পড়ে কুকুরের বিষ্ঠা, মানুষের মূত্র ও যত রাজ্যের দুর্গন্ধ জঞ্জাল এবং তার দেওয়াল হয় থুতু, পানের পিক ও অন্যান্য নানা নক্কারজনক মলিনতার দ্বারা চিত্রবিচিত্র। শ্বাস ও চক্ষু বন্ধ করে এবং যতটা সম্ভব জড়োসড়ো হয়ে সেখান দিয়ে ওঠানামা করতে হয়।

জয়ন্ত ও মানিক এইভাবেই দোতলায় গিয়ে উঠল। দোতলায় চারিদিকে বারান্দা ও তারপর সারি সারি ঘর। বারান্দা দিয়ে মুখ বাড়ালে ডাস্টবিনের চেয়েও নোংরা একতলার উঠান দেখা যায়। অধিকাংশ ঘরের দরজা-জানলাই সারারাত্রব্যাপী বৃষ্টির জন্যে এখনও বন্ধ এবং তাদের ভিতর থেকে একাধিক নাসিকার তর্জন-গর্জন বাইরে বেগে ছুটে আসছে।

তারা তিনতলায় উঠতে শুনতে পেলে, তিন-চার জন লোকের দ্রুত পদধ্বনি! কিন্তু তিনতলায় উঠে জনপ্রাণীকে দেখতে পেলে না এবং সেখানেও বারান্দার ধারের প্রত্যেক ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ রয়েছে।

তারা চারিদিকের বারান্দা ঘুরে এল-তবু কারুর দেখা বা সাড়া নেই, এমনকী এখানে কারুর নাক পর্যন্ত ডাকছে না!

মানিক মৃদুস্বরে বললে, 'কিন্তু উপরে এখনি যাদের পায়ের শব্দ পেলুম তারা কে, আর গেলই বা কোথায়?'

জয়ন্ত বললে, 'হয়তো তারাই হচ্ছে চ্যান ও ইন কোম্পানির লোক, আমাদের সাড়া পেয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে! মানিক এখানে সাবধানে চলাফেরা করতে হবে!'

একটা ঘরের দরজা বাহির থেকে তালা লাগানো রয়েছে। দ্বারবানের দেওয়া চাবি সেই কুলুপে লাগল। দু-জনে ঘরের ভিতরে ঢুকল। ঘরের মধ্যে একটা দরজা দিয়ে আর একখানা ঘরে যাওয়া যায়। তারপর রাস্তার ধারের বারান্দা।

সেখানে গিয়ে সুমুখের দিকে তাকিয়ে জয়ন্ত বললে, 'দেখো মানিক, এখান থেকে অমলবাবুর ঘরের ভিতরটা পর্যন্ত বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে!'

বারান্দার যেখান থেকে কাল রাত্রেই সেই মূর্তিটা পথের উপরে পাহারা দিচ্ছিল, জয়ন্ত সেইদিকে পায়ে পায়ে অগ্রসর হচ্ছে, এমন সময়ে আস্তে আস্তে একটা জানলা বন্ধ করার আওয়াজ হল।

মানিক চুপিচুপি বললে, 'বারান্দার ধারের একটা ঘরের জানলা খোলা ছিল আমাদের সাড়া পেয়ে কেউ বন্ধ করে দিলে!'

জয়ন্ত বললে, 'হুঁ। বেশ বোঝা যাচ্ছে, এরা আমাদের সন্দেহ করেছে। হয়তো আমাদের মতলব ধরে ফেলেছে!'

যেখান থেকে আওয়াজটা এসেছিল সেইখানেই গিয়ে তারা দেখলে, একটা জানলা ও একটা দরজা রয়েছে। দুই-ই বন্ধ।

দরজার কড়া ধরে জয়ন্ত বারকয়েক নাড়া দিলে। কোনো সাড়া নেই।

জয়ন্ত বললে, 'এরা বোধ হয় প্রতিজ্ঞা করেছে যে, আমাদের সঙ্গে দেখা করবে না। চলো, নীচে নেমে অন্য উপায় চিন্তা করি গে।'

দু-জনে আবার ভিতর-বারান্দায় ফিরে এল। আর একবার এদিকে-ওদিকে উকিঝুঁকি মেরে তারা সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল-আগে মানিক, তারপর জয়ন্ত।

হঠাৎ হুড়মুড় করে একটা বিষম শব্দ হল-মানিক চমকে পিছনে তাকাতে-না-তাকাতে জয়ন্তের বিপুল দেহ একেবারে তার ঘাড়ের উপরে এসে পড়ল এবং পর মুহূর্তেই ভয়ানক ধাক্কা খেয়ে মানিক সিঁড়ির উপরে আছাড় খেয়ে পড়ল।

দৈবগতিকে মানিক হাত বাড়িয়ে রেলিং ধরে ফেললে তাই আর নীচের দিকে নেমে গেল না, কিন্তু যন্ত্রণায় সে যেন অন্ধ হয়ে গেল এবং সেই অবস্থাতেই সে শুনতে পেলে যে, জয়ন্তের দেহ গড়াতে গড়াতে দুম দুম শব্দে নীচে নেমে যাচ্ছে! তারপরই চারিদিকে ব্যস্ত পদধ্বনি, চ্যাঁচামেচি, হুড়োহুড়ি! সে বুঝলে, জয়ন্ত হঠাৎ পা-হড়কে সিঁড়ির উপর পড়ে গেছে!

প্রায় দুই মিনিটকাল সেইখানে আচ্ছন্নের মতো বসে থেকে মানিক অতিকষ্টে উঠে দাঁড়াল এবং আস্তে আস্তে আবার সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল।

দোতলায় নেমে সে দেখলে সেখানে মাদ্রাজি, পাঞ্জাবি ও মাড়োয়ারির ভিড়! জয়ন্ত বারান্দার রেলিংয়ে ঠেসান দিয়ে পা ছড়িয়ে অর্ধমূর্ছিতের মতন বসে আছে, তার মুখ বুকের উপরে ঝুলে পড়েছে এবং কেউ তার মাথায় জলের ঝাপটা দিচ্ছে ও কেউ পাখা নেড়ে বাতাস করছে!

মানিক তার কাছে গিয়ে ডাকলে, 'জয়, জয়, তোমার কি বড্ড বেশি লেগেছে?'

অভিভূতের মতো জয়ন্ত খালি বললে, 'হুঁ।'

মিনিট পাঁচেক পরে জয়ন্ত কতকটা প্রকৃতিস্থ হল, তার চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আবার ফিরে এল। সে মুখ তুলে ভিড়ের ভিতরে যেন কাকে খুঁজতে লাগল। মানিক বুঝলে, জয়ন্ত এ অবস্থাতেই চ্যান বা ইনকে ভোলেনি! কিন্তু ভিড়ের ভিতরে মগের মুল্লুকের কোনো নমুনাই দেখা গেল না।

মানিক বললে, 'জয়, আমি একখানা ট্যাক্সি ডেকে আনব কি?'

জয়ন্ত কষ্টেসৃষ্টে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'না, আমি হেঁটে যেতেই পারব। আগে এখান থেকে বেরিয়ে পড়ি।'

সকলকে সাহায্য করার জন্যে ধন্যবাদ দিয়ে জয়ন্ত ও মানিক ধীরে ধীরে আবার সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল।

রাস্তায় এসে জয়ন্ত নিজের জামার ভিতরকার পকেটে হাত দিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। শুষ্ক স্বরে বললে, 'মানিক, ভিড়ের ভিতরে তুমি কোনো বর্মি লোককে দেখনি?'

-'না। তবে তোমার কাছে যেতে আমার মিনিট দুয়েক দেরি হয়েছিল। তার মধ্যে কেউ এসেছিল কি না জানি না।'

-'নিশ্চয় এসেছিল!'

-'কী করে জানলে?'

জয়ন্ত গম্ভীর স্বরে বললে, 'মানিক, আমি পা পিছলে পড়ে যাইনি!'

-'তবে?'

-'আমাদের সুচতুর বন্ধু এক ঢিলে দুই পক্ষী বধ করেছে!'

-'জয়ন্ত, তোমার কথার অর্থ আমি বুঝতে পারছি না!'

জয়ন্ত খুব শুকনো হাসি বললে, 'মানিক, তোমার পরে আমি নামছিলুম। হঠাৎ পিছন থেকে কেউ এমন ভাবে আমাকে একটা প্রবল ধাক্কা মারলে যে, তোমাকে নিয়ে আমিও হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেলুম।'

মানিক সচকিত কণ্ঠে বললে 'বল কী জয়! কে ধাক্কা মারলে? তাকে দেখেছ?'

-'না, দেখবার সময় পাইনি। তবে তার গায়ে যে ভীষণ জোর আছে, ধাক্কা খেয়ে সেটা বেশ বুঝতে পেরেছি। তারপর আমি যখন দোতলার বারান্দায় পড়ে প্রায় অজ্ঞানের মতন হয়ে আছি সেই সময়ে আমাকে

সাহায্য করবার অছিলায় অজানা বন্ধু আমার পকেট থেকে সেই বড়ো চাবিটা আর নকশা-আঁকা সোনার চাকতিটা নিয়ে দিব্যি সরে পড়েছে!'

-'সর্বনাশ! এখন উপায়?'

জয়ন্ত বললে, 'অমলবাবুর বাড়িতে ফোন আছে। তুমি এখনি গিয়ে ইনস্পেক্টার সুন্দরবাবুকে একদল কনস্টেবল নিয়ে এখানে আসতে বলো। এই বাড়িতে খানাতল্লাস করা ছাড়া অন্য উপায় দেখছি না। তুমি যাও, আমি এখানে দাঁড়িয়ে পাহারা দিই।'

গোপীনাথের মহাপ্রস্থান

একদল পাহারাওয়ালা নিয়ে ইনস্পেক্টার সুন্দরবাবু যখন মানিকের সঙ্গে এসে হাজির হলেন, জয়ন্ত তখন অস্থির পদে ফুটপাথের উপরে পায়চারি করছে।

অধীর কণ্ঠে সে বললে, 'এত দেরি হল কেন সুন্দরবাবু?'

সুন্দরবাবু তাঁর মাথাজোড়া ঘর্মাক্ত টাকের উপরে রুমাল চালনা করতে করতে বললেন 'হুম! দেরি হবে না? শুনলাম বাড়ি খানাতল্লাস করতে হবে, উপরওয়ালার কাছ থেকে হুকুমনামা আনতে হল যে! . . . কিন্তু ব্যাপার কী জয়ন্ত? সত্যিই কি তুমি সুরেনবাবুর হত্যাকারীর খোঁজ পেয়েছ?'

-'আমার তো তাই বিশ্বাস। অন্তত যাকে আমরা ধরতে চাই, সে আজ প্রত্নতাত্ত্বিক অমলবাবুকে খুন করতে উদ্যত হয়েছিল।'

-'হুম। মানিকের মুখে সব আমি শুনেছি। শুনে মনে হচ্ছে, তুমি আবার এক নতুন রহস্যসাগর আবিষ্কার করেছ! পদ্মরাগ বুদ্ধ, নকশা-আঁকা সোনার চাকতি, একটা চাবি! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!'

জয়ন্ত বললে, 'এখন ওসব বোঝাবুঝির চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে আমাকে সাহায্য করুন। চলুন, ওই বাড়ির ভিতর যাই।'

-'কিন্তু অপরাধী কি এখনও ওখানে আছে?'

-'বর্মিদের উপরেই আমার সন্দেহ! কিন্তু এবাড়ির ভেতর থেকে কোনো বর্মি লোক বাইরে বেরোয়নি। আমি খবর নিয়ে জেনেছি, এখান থেকে বেরুতে গেলে এই সদর দরজা দিয়েই বেরুতে হবে।'

-'বেশ, তবে চলো।'

এত পাহারাওয়ালা দেখে দ্বারবানের দুই চক্ষু বিস্ময়ে ছানাবড়ার মতন হয়ে উঠল!

সুন্দরবাবু পুলিশসুলভ কর্কশ কণ্ঠে বললেন, 'এই পাঁড়ে!' দ্বারবান মস্ত একটা সেলাম ঠুকে বললে, 'আমি পাঁড়ে নয় হুজুর, আমি হনুমান চোবে!'

-'তুমি হনুমান চোবেই হও, আর জাম্বুবান পাঁড়েই হও, সে কথা আমি জানতে চাই না! আমাদের তাড়াতাড়ি ওপরে নিয়ে চলো!-তারপর পাহারাওয়ালাদের দিকে ফিরে সুন্দরবাবু হুকুম দিলেন, 'এই সেপাই! আমার সঙ্গে জন-ছয়েক লোক এসো, বাকি সবাই এইখানে পাহারা দাও,-কেউ যেন এই বাড়ির বাইরে যেতে না পারে!'

জয়ন্ত ও মানিক সবাইকে নিয়ে একেবারে তেতলায় গিয়ে উঠল। বর্মিদের ঘরের দরজা তখনও বন্ধ ছিল। সুন্দরবাবু পাল্লার উপরে এক লাথি মারতেই ভিতর থেকে কে দরজা খুলে দিলে।

ঘরের ভিতরে ঢুকে দেখা গেল, চারজন বর্মি বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

সুন্দরবাবু রুক্ষ স্বরে বললেন, 'এই মগের বাচ্ছারা! দেশ ছেড়ে তোরা কলকাতায় কী করতে এসেছিস?'

একটা লোক ভাঙা হিন্দিতে বললে, 'আমরা এখানে ব্যাবসা করতে এসেছি।'

-'হুম। মানুষ মারবার ব্যাবসা? ওহে জয়ন্ত, এ বেটাদের কোনটাকে তুমি চাও?'

বর্মিদের কাছে এগিয়ে এসে জয়ন্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে প্রত্যেকের আপাদমস্তক লক্ষ করে বললে, 'তোমরা ক-জন এখানে থাকো?'

তারা জবাব দেবার আগেই দ্বারবান হনুমান চোবে বললে, 'হুজুর, এখানে দুটো ঘর নিয়ে ছ-জন বর্মি থাকে।'

জয়ন্ত বললে, 'এরা তো মোটে চার জন দেখছি। আর দু-জন কোথায়?'

একজন বর্মি বললে, 'আধ ঘণ্টা আগে তারা বাইরে বেরিয়ে গেছে।'

জয়ন্ত চুপিচুপি সুন্দরবাবুকে বললে, 'এ লোকটা মিছে কথা কইল। আমি হলপ করে বলতে পারি, আজ সকাল থেকে কোনো বর্মি লোক বাড়ির বাইরে পা বাড়ায়নি।'

-'হুম, মিছে কথা, না? তাহলে বেটাদের মনে নিশ্চয়ই পাপ আছে! চলো ভেতরের ঘরটা খুঁজে দেখি!'

কিন্তু অন্য ঘরে ঢুকেও বাকি দু-জনের দেখা পাওয়া গেল না।

সুন্দরবাবু ফিরে বললেন, 'এই জাম্বুবান পাঁড়ে!'

দ্বারবান হাত জোড় করে বললে, 'হুজুর, আমার নাম হনুমান চোবে!'

-'ও একই কথা। সকাল থেকে তুমি দেউড়িতে আছ?'

-'হাঁ হুজুর!'

-'দু-জন বর্মিকে তুমি বাইরে যেতে দেখেছ?'

-'না হুজুর!'

-'তাহলে তারা কি হুস করে আকাশে উড়ে গেল?'

-'বড়োই তাজ্জবের কথা হুজুর! আরও দু-জন লোক এ ঘরে থাকে-একজন ভয়ানক ঢ্যাঙা, আর একজন ভয়ানক বেঁটে!'

মানিক জয়ন্তের কানে কানে বললে, 'চ্যান আর ইন-এর চেহারার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে!'

জয়ন্ত কেবল বললে, 'হুঁ।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'জয়ন্ত, এখন আমাদের কী করা উচিত?'

জয়ন্ত বললে, 'সেই চাকতি আর চাবির খোঁজ। যদিও ও দুটো জিনিস খুব সম্ভব সেই অদৃশ্য লোক দুটোর সঙ্গেই আছে, তবু একবার এই ঘর দুটো খুঁজে দেখা যাক।'

খানাতল্লাস শুরু হল। দুটো ঘরের সমস্ত ওলটপালট করে, এমনকী বিছানার বালিশ পর্যন্ত ছিঁড়েখুঁড়ে দেখা হল, কিন্তু চাবি আর চাকতি পাওয়া গেল না।

ঘর থেকে বাইরে এসে সুন্দরবাবু বললেন, 'সে মগ দুটো তাহলে বাড়ির অন্য কোথাও লুকিয়ে আছে। জাম্বুবান-'

-'হুজুর হনুমান-'

-'না আমি তোমাকে জাম্বুমান বলেই ডাকব! বারান্দার ওপাশের ওই ঘরে কে থাকে?'

-'একজন মাদ্রাজি সদাগর।'

-'আচ্ছা, আগে ওই ঘরখানাই দেখা যাক। এসো জয়ন্ত! এই সেপাই, হুঁশিয়ার! মগের বাচ্ছাগুলো যেন সরে না পড়ে!'

বারান্দার ওপাশের ঘরের দরজাও ভিতর থেকে বন্ধ ছিল, সুন্দরবাবুর ধাক্কাধাক্কিতেও কেউ খুলে দিলে না।

জয়ন্ত শুধোলে, 'হনুমান চোবে, এ ঘরে যে মাদ্রাজি থাকে তার নাম জানো?'

-'জানি হুজুর! গোপীনাথ নায়ডু।'

সুন্দরবাবু হাঁকলেন, 'গোপীনাথ! গোপীনাথ!'

কোনো সাড়া নেই।

দ্বারবান একটু আশ্চর্য হয়ে বললে, 'গোপীনাথরা তো খুব ভোরে ওঠেন, তবে এখনও দরজা বন্ধ কেন?'

সুন্দরবাবু আবার পদযুগল ব্যবহার করলেন, চার-পাঁচ বার লাথি মারবার পরেই খিল ভেঙে দড়াম করে দরজার পাল্লা দুটো খুলে গেল!

হুড়মুড় করে ঘরের ভিতরে ঢুকেই সুন্দরবাবু সবিস্ময়ে 'হুম' বলে চিৎকার করে বেগে আবার পিছিয়ে এলেন।

মানিক বললে, 'কী হল সুন্দরবাবু, কী হল?'

সুন্দরবাবু আবার বললেন, 'হুম!'

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতরে ঢুকেই যে দৃশ্য দেখলে, তা ভয়াবহ!

দরজার ঠিক সামনেই মেঝের উপরে চিত হয়ে চারিদিকে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে একটা লম্বা-চওড়া মাদ্রাজি, -তার বুকের উপরে আমূলবিদ্ধ একখানা মস্ত ছোরা! এবং ক্ষত দিয়ে তখনও রক্তস্রোত বেরিয়ে আসছে!

দ্বারবান বিহ্বল স্বরে ডাকলে, 'গোপীনাথবাবু!-গোপীনাথবাবু!'

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, 'গোপীনাথবাবু এ জীবনে আর কথা কইবে না!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'গোপীনাথকে এখনি কেউ খুন করেছে! সাবধান খুনি ঘরের ভিতরেই আছে, কারণ দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল!'

জয়ন্ত ঘরের চতুর্দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, 'জানলার দিকে চেয়ে দেখুন। খুনি পালিয়েছে!'

একটা খোলা জানলার দুটো লোহার গরাদ দুমড়ে ফাঁক হয়ে রয়েছে!

জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে সুন্দরবাবু বললেন, 'বাপ! গায়ে কত জোর থাকলে এমন লোহার গরাদ তারের মতন দুমড়ে ফাঁক করে পালানো যায়?'

মানিক বললে, 'এ চ্যান ছাড়া আর কেউ না! কিন্তু চ্যান এই গোপীনাথ বেচারাকে খুন করলে কেন?'

সুন্দরবাবু এদিকে-ওদিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বললেন, 'দেখো মানিক, ঘরের সমস্ত জিনিস লণ্ডভণ্ড! যেন কেউ এখানে মালপত্তর উলটেপালটে কিছু খুঁজেছিল!'

ঘরের সর্বত্রই রাশি রাশি চটিজুতো, কাঠের পুতুল, ল্যাকারের কৌটো প্রভৃতি ছড়ানো রয়েছে!

মানিক বললে, 'দেখছি, সমস্ত জিনিসই বর্মায় তৈরি! গোপীনাথ কি বর্মা থেকেই এগুলো আনিয়ে ব্যাবসা করত?'

দ্বারবান বললে, 'হাঁ বাবুজি!'

সুন্দরবাবু বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, 'আবার দেখছি একটা নতুন মামলা ঘাড়ে চাপল। যাই উপরওয়ালাদের কাছে খবর পাঠাবার ব্যবস্থা করে আসি গে!'

সুন্দরবাবু বাইরে গেলেন। মানিক বললে, 'জয়, তুমি বোবা হয়ে কী ভাবছ বলো দেখি?'

জয়ন্ত দুই হাতের ভিতরে মাথা রেখে একখানা চেয়ারের উপরে বসেছিল। সে মুখ তুলে বললে, 'মানিক, আমি মনে মনে অঙ্ক কষছিলুম। দুই আর দুই যোগ দিয়ে দেখলুম, চার হয়।'

-'অর্থাৎ?'

-'মন দিয়ে আমার কথা শোনো। আমার কথা সত্য হওয়া উচিত। নইলে গোপীনাথের মৃত্যুর কোনো অর্থই হয় না। এই যে গোপীনাথবাবু, যিনি এইমাত্র স্বর্গারোহণ করেছেন, এঁর ব্যাবসা ছিল ব্রহ্মদেশ থেকে মাল আমদানি করা। অতএব ধরে নেওয়া যাক, গোপীনাথ নিজেও অনেকবার বর্মায় গিয়েছে আর বর্মি ভাষাও তার অজানা নয়। গোপীনাথ হঠাৎ একদিন এই ঘরে বসে দেখলে যে একদল বর্মি লোক সামনের ওই ঘর দু-খানা ভাড়া নিলে। কলকাতার এই পাড়ায় এটা খুব স্বাভাবিক নয়। তারপর সে দেখলে বর্মিদের হাবভাব রহস্যময়। তারা কোনো কাজ করে না, কেবল রাস্তার ওপাশে অমলবাবুর বাড়ির দিকে নজর রাখে, আর বর্মি ভাষায় কী পরামর্শ করে। গোপীনাথও তখন কৌতূহলী হয়ে তাদের উপরে আড়ি পাতলে, তাদের গুপ্তকথা জেনে ফেলে! তখন সেও তাদের উপরে- আর অমলবাবুর বাড়ির উপরে পাহারা দিতে লাগল।

কাল রাত্রের সমস্ত ব্যাপার সে স্বচক্ষে দেখেছিল। আমার পকেটে যে চাকতি আর চাবি আছে, গোপীনাথ তা জানত। চ্যান আর ইন কোম্পানি আজ সকালে ভয়ে আমাদের আক্রমণ করতে পারেনি বটে, কিন্তু গোপীনাথ তাদের চেয়েও সাহসী, এমন সুযোগ সে ছাড়লে না। সে মারলে আমাকে ধাক্কা, আমি পড়ে প্রায় অজ্ঞান হয়ে গেলুম, সেই ফাঁকে গোপীনাথ আমার চাকতি আর চাবির অধিকারী হল। কিন্তু তার দুর্ভাগ্যক্রমে উপরের বারান্দা থেকে চ্যান আর ইন কোম্পানির কেউ সেই দৃশ্যটা দেখে ফেলে। তারই ফলে গোপীনাথকে এখন ইহলোক ত্যাগ করতে হয়েছে! মানিক, আমি কি অঙ্ক কষতে ভুল করেছি বলে মনে কর?'

ইতিমধ্যে কখন সুন্দরবাবু আবার ঘরের ভিতরে এসে ঢুকেছেন এবং জয়ন্তের কথা কিছু কিছু শুনেছেন! তিনি বললেন, 'না, জয়ন্ত! তুমি তো অঙ্ক কষছ না, তুমি কল্পনার আকাশে মেঘের প্রাসাদ তৈরি করছ! হুম, ওই তো হচ্ছে শখের গোয়েন্দাদের বদ স্বভাব! তারা যখন কবিত্ব করে, আসল অপরাধী তখন কেল্লা ফতে করে সরে পড়ে!'

সে কথায় কান না দিয়ে মানিক বললে, 'তাহলে তোমার মত হচ্ছে গোপীনাথকে খুন করে চ্যান আর ইন এই ঘর খানাতল্লাস করে চাবি আর চাকতি নিয়ে ওই জানলা দিয়ে অদৃশ্য হয়েছে?'

জয়ন্ত কিছু বললে না, সামনের দেয়ালের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

তার দৃষ্টির অনুসরণ করে মানিক দেখলে, সামনের দেয়ালের গায়ে একখানা বড়ো ব্রমাইড এনলার্জমেন্ট ছবি টাঙানো রয়েছে! ছবিখানা মৃত গোপীনাথের, কিন্তু উলটো করে টাঙানো রয়েছে।

মানিক বললে, 'চ্যান আর ইন দেখছি ছবিখানা নিয়েও টানাটানি করেছিল, তারপর তাড়াতাড়ি উলটো টাঙিয়ে পালিয়ে গিয়েছে!'

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, 'তারা যদি ওই ছবিখানা নামাত তাহলে আবার ওখানা টাঙিয়ে রেখে যাবার মাথাব্যথা তাদের হত না বোধ হয়! দেখো না, ঘরের যেসব জিনিস তারা ঘেঁটেছে, কোনোটাই গুছিয়ে রেখে যায়নি।'

-'তবে?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আমার মাথা আর মুন্ডু! এখন উলটো আর সোজা ছবি নিয়ে গোলমাল করবার সময় নয়, আমাকে কাজ করতে দাও!'

জয়ন্ত বললে, 'এ হচ্ছে সম্ভবত গোপীনাথেরই কাজ! সে ছবিখানা নামিয়ে আবার খুব তাড়াতাড়ি টাঙিয়ে রেখেছিল, সোজা হল কি উলটো হল সেটা দেখবার সময় আর পায়নি।'

-'কিন্তু তার এতটা তাড়াতাড়ির কারণ কী?'

-'ছবিখানা আর একবার নামালেই হয়তো কারণ বোঝা যাবে!' -এই বলে জয়ন্ত উঠে গিয়ে ছবিখানা দেয়াল থেকে নামিয়ে নিলে। তারপর সেখানা উলটে দেখলে, ছবির পিছনে পিচবোর্ডের একজায়গা উঁচু হয়ে আছে এবং দুটো কাঁটা-পেরেকও তুলে ফেলা হয়েছে!

জয়ন্ত পিচবোর্ড ফাঁক করে ভিতরে আঙুল চালিয়ে দিয়ে টেনে বার করলে, একটা চাবি ও একখানা সোনার চাকতি!

মানিক ও সুন্দরবাবুর দৃষ্টি একেবারে চমৎকৃত!

জয়ন্ত খুশি কণ্ঠে বললে, 'চাবি আর চাকতি চুরি করে গোপীনাথ ঘরে এসে ঢুকল। তাড়াতাড়ি জিনিস দুটো ছবির পিছনে ঢুকিয়ে রেখে দিলে। এমন সময়ে চ্যান আর ইনের প্রবেশ। গোপীনাথ বধ। খুনিরা খানাতল্লাসিতে প্রবৃত্ত। সদলবলে আমাদের পুনরাগমন। জানলা-পথে চ্যান আর ইনের পলায়ন। সুন্দরবাবু দেখছেন, কল্পনার আকাশে মেঘের প্রাসাদ সব সময়ে ব্যর্থ হয় না? আলেকজান্দার একবারেই পৃথিবী জয় করেননি, প্রথমে তিনি কল্পনাতেই পৃথিবী জয়ের উপায় স্থির করেছিলেন! যার কল্পনাশক্তি নেই দুনিয়ায় তার পরাজয় পদে পদে!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'দৈবগতিকে যখন জিতে গেছ, তখন দু-কথা শুনিয়ে দাও ভায়া, শুনিয়ে দাও। এই জাম্বুমান পাঁড়ে-'

-'হুজুর, হনুমান চোবে-'

-'ও একই কথা! নীচে গোলমাল শুনছি! বোধ হয় বড়ো সাহেব এলেন! তোমরা এখন এখান থেকে চলে যাও!'

জয়ন্ত বললে, 'আমাদের হারানিধি আবার ফিরে পেয়েছি, আমাদেরও এখানে থাকবার আর দরকার নেই! কিন্তু সুন্দরবাবু, যাবার আগে আপনাকে একটা কথা বলে যাই। এই মামলাটা আপনি অন্য ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে মাস খানেক ছুটি নিন।'

-'কেন?'

-'আর আমরা কলকাতায় থাকছি না! এই নাটকের পরের দৃশ্য শুরু হবে একেবারে কাম্বোডিয়ার জঙ্গলে, ওঙ্কারধামের ধ্বংসস্তূপে। আপনিও আমাদের সঙ্গে চলুন।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম।'

ওঙ্কারধামের যাত্রী

ধান খেতের পর ধান খেত, তারপর আবার ধান খেত! সবুজের পর সবুজ আর সবুজ! যতদূর চোখ চলে খালি দেখা যায় সমতল ক্ষেত্র! মাঝে মাঝে নারিকেল গাছ, কলা গাছ আর বাঁশ বনের ভিড়। তারই ভিতর দিয়ে সোজা চলে গিয়েছে একটি সুদীর্ঘ রাঙা রাস্তা। এত সোজা ও লম্বা রাস্তা সহজে নজরে পড়ে না!

মাঝে মাঝে দেখা দেয় নদী। কোথাও আছে সাঁকো, কোথাও খেয়া ঘাটে নৌকোয় চড়ে পার হতে হয়।

মাঝে মাঝে দেখা দেয় ছোটো ছোটো গ্রাম। সরাইখানার সামনে রয়েছে খাবার সাজানো। পথের ধারে উবু হয়ে বসে আনামি স্ত্রীলোকেরা চিংড়িমাছ, কমলালেবু ও নারিকেল প্রভৃতি বিক্রি করছে। ধুলোর স্তূপে খেলা করছে নগ্ন বা নেংটি-পরা শিশুরা।

সেই সিধে রাঙা রাস্তার উপর দিয়ে ছুটছে তিনখানা মোটর। একখানা গাড়িতে আছে জয়ন্ত ও মানিক, পরের গাড়িতে অমলবাবু ও সুন্দরবাবু, তার পরের গাড়িতে দরকারি জিনিসপত্র এবং চাকরবাকর।

সুন্দরবাবু বলছিলেন, 'এ যে দেখছি অন্নপূর্ণার স্বদেশ! পাশাপাশি একটানা এত বেশি ধানের খেত কেউ কি কখনো চোখে দেখেছে? হুম!'

অমলবাবু বললেন, 'হ্যাঁ। এ দেশ এমনি উর্বর বলেই একদল ভারতবাসী সমুদ্র পার হয়ে এখানে এসে নূতন এক রাজ্যস্থাপন করে ছিলেন, নতুন এক সভ্যতা গড়ে তুলেছিলেন।'

-'হুম, ওসব বাজে উপকথা! আমি বিশ্বাস করি না।'

-'না সুন্দরবাবু, সেই লুপ্ত সভ্যতার শেষ চিহ্ন যখন স্বচক্ষে দেখবেন, তখন আর অবিশ্বাসের কথাই তুলতে পারবেন না। আচ্ছা, সেই সভ্যতার কিছু কিছু কথা আগেই আপনাকে শুনিয়ে রাখছি। এ দেশটা আসলে শ্যামদেশেরই অঙ্গ, খুব অল্পদিনই ফরাসিদের অধিকারে এসেছে। আজ ফরাসিরা এখানে পথঘাট বানিয়েছে, নিবিড় বন কেটে সাফ করেছে বটে, কিন্তু সেদিন পর্যন্ত এটা ছিল বাঘ আর হাতির নিজস্ব মুল্লুক, এখানকার দুর্ভেদ্য অরণ্যের গভীর রহস্যের মধ্যে অতি সাহসী মানুষও পদার্পণ করতে ভয়ে শিউরে উঠত! সত্তর বছর আগেও পৃথিবী ওঙ্কারধামের নাম শোনেনি।

'সতেরো শতাব্দীতে পর্তুগিজ মিশনারিরা শ্যামদেশে এসেছিলেন ধর্ম প্রচার করতে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ অরণ্যে ভ্রমণ করতে করতে পাহাড়ের মতো প্রকাণ্ড মন্দিরের গগনস্পর্শী চূড়া ও বিপুল এক নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। ইউরোপ ফিরে তাঁরা অনেকের কাছে এই বিস্ময়কর কাহিনী প্রচার করেন। মিশরের পিরামিডের মতন বড়ো আশ্চর্য মন্দির! বাবিলনের মতন বিরাট জনপদ!

সবাই গল্প শুনলে বটে, কিন্তু কেউ বিশ্বাস করলে না। পরে সে গল্পও লোকে ভুলে গেল। বড়ো বড়ো বট গাছ, বাঁশ বন, নারিকেল গাছ ও নানাজাতীয় লতাগুল্ম এই লুপ্ত হিন্দুসভ্যতার শেষ চিহ্নগুলিকে এমন ভাবে ঢেকে রইল যে, বাইরের কোনো কৌতূহলী চক্ষু আর তাদের কোনো খোঁজই পেল না।

'দিনের পর দিন যায়-বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ! ফরাসিরা প্রথমে ব্যাবসাসূত্রে ইন্দো-চীনে পদার্পণ করলে। লোকের মুখে জনপ্রবাদ শোনা গেল, অরণ্যের অন্ধকারে যেখানে সূর্যালোক সোনা ছড়ায় না সেখানে অজ্ঞাতবাস করছে এক অদৃশ্য রাজ্যের অদ্ভুত রাজধানী, মাইলের পর মাইলব্যাপী নগরের পর নগর। অপূর্ব মন্দির, বিচিত্র প্রাসাদ! কোনো কোনো পুরাতত্ত্ববিদ পণ্ডিতও সেই সব প্রবাদ শুনলেন। অনেকেই বললেন, এই প্রবাদ যদি সত্য হয় তাহলে বলতে হবে, ওখানে আগে কোনো বিপুল সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল। মন্দির, প্রাসাদ, নগর নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে, কিন্তু এমন এক বিস্ময়কর সভ্যতার পিছনে কোনো চিহ্ন না রেখে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে না! বনবাসে লুকিয়ে থাকতে পারে কেবল অসভ্যতাই।

'কিন্তু চীনদেশের পুরাতন ঐতিহাসিক পুথিপত্রেও কাম্বোজের এক আশ্চর্য সভ্যতার কাহিনি পাওয়া যায়! Mouhot একজন ফরাসি ভদ্রলোকের নাম। তাঁর কৌতূহল জাগল। পলাতক এই সভ্যতাকে গ্রেপ্তার করার জন্যে গোয়েন্দার মতন তিনি বাঘ আর হাতির মুল্লুকে প্রবেশ করলেন। বাঘেরা জঙ্গলের ছায়ায় বসে, হাতিরা নদীর ধারে দাঁড়িয়ে এবং অজগরেরা গাছের ডালে ডালে ঝুলে পড়ে সবিস্ময়ে দেখলে, ওঙ্কারধামের অরণ্যে আধুনিক মানুষের মুখ। ওঙ্কারধামের দক্ষিণ প্রবেশ পথের উপরে জেগে ছিল কালজয়ী প্রলয়দেবতা শিবের চারিটি বিপুল মুখমণ্ডল, তাদের পাষাণ নেত্রের সামনে বহুযুগ পরে আবার ক্ষুদ্র মানুষের আবির্ভাব হল! বোবা পাথরের উপরে বিস্ময়ের শব্দরেখা ফুটল না বটে, কিন্তু যে অভাবিত কাহিনি বহন করে Mouhot আবার আধুনিক সভ্য জগতে ফিরে এলেন দিকে দিকে তা চমকপ্রদ উত্তেজনার সৃষ্টি করলে!

'সেকালের পৃথিবীতে এক জাতি যখন আর এক জাতিকে আক্রমণ করত, পরাজিত জাতিকে তখন প্রায়ই দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে হত। তারা আবার কোনো নতুন দেশে গিয়ে সেখানকার বাসিন্দাদের তাড়িয়ে বা বশ করে নতুন রাজ্যস্থাপন করত। এইভাবে সেকালকার পৃথিবীতে অনেক নতুন রাজ্য গড়ে উঠেছে এবং তাদের মধ্যে কোনো কোনো রাজ্য এখনও টিকে আছে।

'সম্ভবত এইভাবেই একদল হিন্দু ভারতবর্ষ ত্যাগ করে সাগর পেরিয়ে শ্যামদেশে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। কত শতাব্দী আগে এখনও সেটা স্থির হয়নি। তবে তেরো-চৌদ্দ শতাব্দী পর্যন্ত তাদের হাতে গড়া নূতন সভ্যতার অস্তিত্ব যে নষ্ট হয়নি, এমন কথা বলা যায়। এবং এই সভ্যতার আশ্রয়ে যে একসময়ে তিন কোটি মানুষ নিরাপদে বাস করত, সেটা অনুমান করবার মতো প্রমাণেরও অভাব নেই। ওঙ্কারধাম ছিল তাদের রাজধানী। সে এত বড়ো নগর এবং তার ধ্বংশাবশেষ এতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত যে সেখানেও বোধ হয় বাস করত দশ লক্ষ হিন্দু! আজ তাদের একজনও নেই, তাদের বংশধরদেরও সন্ধান মেলে না!

'কিন্তু তাদের মেঘছোঁয়া মন্দির মহাকালকে পরিহাস করে আজও বেঁচে আছে-যেমন বেঁচে আছে মৃত মিশরিদের পিরামিড! ওঙ্কারধামের এই অদ্ভুত মন্দির শিল্পের দিক দিয়ে পিরামিডেরও চেয়ে ঢের বড়ো, ঢের বিচিত্র, ঢের আশ্চর্য! মানুষের হাত পৃথিবীর আর কোথাও এমন মন্দির গড়তে পারেনি। ভাবতে গর্ব হয় যে, এই মন্দির যারা গড়েছে তারা হচ্ছে দিগবিজয়ী হিন্দু-আমাদেরই পূর্বপুরুষ!

'সুন্দরবাবু, আমাদের পূর্বপুরুষদের সেই চিরস্মরণীয় কীর্তি স্বচক্ষে দেখলে আপনাকে স্তম্ভিত হতে হবে! মানুষের হাত যে এমন মন্দির গড়তে পারে এ কথা আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না,-মনে করবেন আমাদের পূর্বপুরুষরা ছিলেন মর্তে অবতীর্ণ দেবতা!'

সুন্দরবাবু উত্তরে মনের মতো কথা খুঁজে না পেয়ে কেবল বললেন, 'হুম!'

প্রথম গাড়িতে তখন মানিক বলছিল, 'জয়, কলকাতার অলিগলিতে চ্যান আর ইন হয়তো এখনও আমাদের খুঁজে মরছে!'

জয়ন্ত ঘাড় নেড়ে বললে, 'শত্রুদের যারা নিজেদের চেয়ে বোকা মনে করে, পদে পদে ঠকে মরে তারাই! খুব সম্ভব আমরা তাদের ফাঁকি দিয়ে ভারতবর্ষ ত্যাগ করতে পারিনি।'

-'কিন্তু জয়, যে জাহাজে আমরা এসেছি তার মধ্যে যে চ্যান আর ইন ছিল না, এটা আমি হলপ করে বলতে পারি। অমলবাবু তাদের চেনেন, জাহাজের আরোহীদের দলে তারা ছিল না।'

জয়ন্ত অন্যমনস্কের মতো বললে, 'হতে পারে। না হতেও পারে।'

ঠিক সেই সময়ে পিছন থেকে শোনা গেল একখানা মোটরের ভেঁপুর শব্দ!

জয়ন্ত সচমকে গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে পিছন দিকে তাকিয়ে দেখলে। সোজা রাস্তা-অনেক দূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে। জয়ন্তের তিনখানা গাড়ি ঠিক পরে পরেই ছুটেছে। কিন্তু আরও খানিকটা পিছনে দেখা দিয়েছে আরও দু-খানা নতুন মোটরগাড়ি! রাস্তার উপরে ধুলোর মেঘ সৃষ্টি করে গাড়ি দু-খানা ছুটে আসছে যেন বিদ্যুৎবেগে!

মানিক সবিস্ময়ে বললে, 'এত বেগে ওরা কারা গাড়ি চালায়! ক্রমাগত হর্নের পর হর্ন দিয়ে ওরা আমাদের পথ ছেড়ে সরে যেতে বলছে! ওদের এত তাড়াতাড়িই বা কীসের?'

পিছনের গাড়ি থেকে ব্যস্ত স্বরে চেঁচিয়ে সুন্দরবাবু বলে উঠলেন, 'পথ ছাড়ো, পথ ছাড়ো! নইলে এখনি অ্যাক্সিডেন্ট হবে!'

জয়ন্ত নিজেদের ড্রাইভারকে বললে, 'গাড়ি নিয়ে একপাশে সরে যাও। গাড়ি একেবারে থামিয়ে ফেলো।'

ড্রাইভার তার কথামতো কাজ করলে। তাদের অন্য গাড়ি দু-খানাও পথের একপাশে গিয়ে থেমে দাঁড়াল।

গাড়ির দরজা খুলে জয়ন্ত পথের উপর নেমে পড়ল। তারপর নিজের কোমরবন্ধে সংলগ্ন রিভলভারের উপর হাত রেখে পিছন দিকে দৃষ্টিপাত করলে, তার দুই চক্ষু প্রদীপ্ত, মুখে দৃঢ়প্রতিজ্ঞার ভাব!

ধুলোর মেঘে-ঢাকা দু-খানা গাড়ি তার অজ্ঞাত আরোহীদের নিয়ে প্রচণ্ড বেগে খুব কাছে এসে পড়েছে!

মহাকালের অভিশাপ

জয়ন্তের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে মানিক বললে, 'জয়, তুমি কি মনে কর ও গাড়ি দু-খানার মধ্যে আমাদের শত্রু আছে?'

জয়ন্ত বললে, 'শত্রু-মিত্র জানি না, আমি কেবল সতর্ক হয়ে থাকতে চাই।'

জয়ন্তের মুখের কথা শেষ হবার আগেই ভোঁ ভোঁ ভোঁ ভোঁ করে ক্রমাগত হর্ন বাজাতে বাজাতে প্রথম মোটরখানা তীব্রগতিতে সাঁৎ করে তাদের চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল এবং পরমুহূর্তেই দ্বিতীয় গাড়িখানা! গাড়ি তো নয়, যেন দু-দুটো অগ্নিহীন উল্কা, সে প্রচণ্ড গতির ঝড়ের ভিতর থেকে চেনা বা অচেনা কোনো মানুষের মুখই আবিষ্কার করা গেল না!

সুন্দরবাবু বললেন, 'মেল ট্রেনের স্পিডও এদের কাছে বোধ হয় হার মানে! কিন্তু এত তাড়াতাড়ি এরা কেন যাচ্ছে আর কোথায়ই বা যাচ্ছে?'

পথের ধুলোর দিকে তাকিয়ে জয়ন্ত বললে, 'যেখানেই যাক, ওরা আমাদের ফাঁকি দিতে পারবে না। আমরা ওদের নাগাল ধরবই।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'নাগাল ধরবে মানে? ওদের নাগাল ধরতে গেলে আমাদেরও তো ওদের চেয়ে বেশি জোরে গাড়ি ছোটাতে হয়! হুম, আমি তাতে মোটেই রাজি নই! গাড়ি যদি একবার হোঁচট খায়, তাহলে ওঙ্কারধাম দেখবার আগেই গোলোকধামে গিয়ে হাজির হতে হবে!'

জয়ন্ত রুপোর নস্যদানি থেকে একটিপ নস্য নিয়ে বললে, 'সুন্দরবাবু, ছেলেবেলায় কচ্ছপ আর খরগোশের গল্প পড়েননি? কচ্ছপ দৌড়ে খরগোশকে শেষে হারিয়ে দিয়েছিল। আমরা গাড়ির স্পিড না বাড়িয়েও ওদের নাগাল ধরব। পথের দিকে তাকিয়ে দেখুন। ধুলোর ওপরে গাড়ির চাকার দাগ দেখতে পাচ্ছেন না?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'ও হো হো হো বুঝেছি! ওই দাগ ধরে আমরা ওদের পিছু নিতে পারব, তুমি এই বলতে চাও তো?'

অমলবাবু বললেন, 'কিন্তু ওদের পিছু নেবার দরকারই বা কী?'

জয়ন্ত বললে, 'দরকার একটু আছে বই কী! এমন মারাত্মক স্পিড নিয়ে যারা আমাদের পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে চায়, তাদের নিয়ে মাথা না ঘামালে চলবে কেন!'

অমলবাবু ভীত কণ্ঠে বললেন, 'আপনি কি বলতে চান, ওই গাড়ি দু-খানার মধ্যে চ্যান আর ইন আছে?'

-'চ্যানকেও চিনি না, ইনকেও চিনি না, এখন উঠুন গাড়িতে!' - এই বলে জয়ন্ত নিজের গাড়ির ভিতরে গিয়ে বসে পড়ল। আর সকলেও তখন তার অনুসরণ করলে, গাড়ি তিনখানা আবার অগ্রসর হতে লাগল।

জয়ন্ত প্রথম গাড়ির ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসল, পূর্ববর্তী গাড়িগুলোর চক্রে চিহ্নিত পথের উপরে দৃষ্টি রাখবার জন্যে।

মানিক সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললে, 'আচ্ছা জয়, যারা গেল তারা যদি চ্যানের দল হয় তবে তারা আমাদের আক্রমণ না করে এগিয়ে গেল কেন? আর শত্রুরা আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষ ছেড়ে এখানে এলই বা কী করে? আমাদের জাহাজে তারা তো ছিল না!'

জয়ন্ত বললে, চ্যান আর ইন হয়তো এখনও এখানে এসে পৌঁছোতে পারেনি, কিন্তু মানিক, তুমি ভুলে যেয়ো না যে এটা হচ্ছে বিংশ শতাব্দী! চ্যানের টেলিগ্রাম হয়তো আমাদের আগেই কালাপানি পার হয়েছে!'

-'জয়, তুমি কি বলতে চাও, চ্যানের কোনো টেলিগ্রাম পেয়ে তার দলের লোকেরা আমাদের পিছু নিয়েছে?'

-'হতেও পারে, না হতেও পারে! হয়তো ওরা হুকুম পেয়েছে আমাদের উপরে পাহারা দেবার জন্যে! ওঙ্কারধামে যাবার প্রধান রাস্তা হচ্ছে এইটাই। হয়তো ওরা এগিয়ে গেল আমাদের পথ আগলে থাকবার জন্যে।'

গাড়ি ছুটছে! দু-ধারে সেই সবুজ খেত, আর মাঝখানে সেই সোজা রাঙা রাস্তা।

মানিক বললে, 'দূরে একটা গ্রাম দেখা যাচ্ছে।'

ড্রাইভার বললে, 'হ্যাঁ, ওর নাম সিয়েম রিপ। আর মাইল খানেক পরেই আমরা ডাকবাংলোয় গিয়ে পৌঁছোব।'

সিয়েম রিপ গ্রাম থেকে উত্তর দিকে মোড় ফিরতেই চোখের সামনে জেগে উঠল, বিরাট ওঙ্কারধামের বিপুল দেবালয়! চারিধারের নিবিড় জঙ্গল ও সুদীর্ঘ বনস্পতিরা ওঙ্কারধামের পঞ্চচূড়ার অনেক নীচে পড়ে রয়েছে। দূর থেকে ওঙ্কারধামকে দেখে মনে হল, বিরাটতায় সে মিশরের পিরামিডের চেয়ে এবং সূক্ষ্ম শিল্পের নিদর্শনরূপে শাজাহান বাদশার তাজমহলের চেয়ে খাটো নয়! এই অরণ্যের মধ্যে হঠাৎ তাকে দেখলে তার বাস্তবতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। এ যেন আলাদিনের প্রদীপবাহী দৈত্যের হাতে গড়া কোনো অসম্ভব মায়ামন্দির, যেকোনো মুহূর্তে দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে শূন্যে মিলিয়ে যেতে পারে!

ওঙ্কারধামের ছায়ায় এসে দেখা গেল, তাদের অগ্রবর্তী সেই গাড়ি দু-খানার চাকার দাগ বাংলো ছাড়িয়েও এগিয়ে গিয়েছে।

সুন্দরবাবু সর্বপ্রথমেই ডাকবাংলোয় ঢুকে একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'হুম, এইবারে আহার আর বিশ্রাম!'

জয়ন্ত বললে, 'আপাতত আমাকে ও দু-টি সুখ থেকেই বঞ্চিত হয়ে থাকতে হবে। আগে বাংলোর চারিদিকটা তদারক না করে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারছি না!'

মানিক বললে, 'কিন্তু এখানে তদারক করবার কিছু আছে বলেই মনে হচ্ছে না। চারিদিক শান্তিময়, শত্রুদের কোনো চিহ্নই নেই।'

'হ্যাঁ, ঝড়ের আগে প্রকৃতি খুব শান্ত থাকে বটে-' মৃদুস্বরে এই কথা বলেই জয়ন্ত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অমলবাবু বললেন, 'এই ওঙ্কারধাম আমার পুরোনো বন্ধুর মতো। মানিক, আগে আমি মন্দিরের সঙ্গে আলাপ করে আসতে চাই।'

মানিক বললে, 'এই অদ্ভুত মন্দির আমারও কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছে! চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে যাই।'

অগ্রসর হতে হতে অমলবাবু অর্ধনিমীলিত নেত্রে যেন সুদূর অতীতের দিকে তাকিয়েই যে কাহিনি বর্ণনা করলেন তা হচ্ছে এই-অস্তলোক থেকে পূর্ব আকাশের গায়ে ছবির মতন আঁকা নীল পাহাড়ের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে যাত্রীর পর যাত্রী-যেন তাদের আর শেষ নেই!

চলেছেন রাজা আর রাজপুত্ররা সাজানো হস্তীদলের পৃষ্ঠে! চলেছেন রাজপুরোহিতগণ সোনার রথে চড়ে! চলেছেন বীরবৃন্দ ও সৈনিকগণ তেজীয়ান অশ্বদের উপরে বসে! চলেছে সভাসদ, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, কর্মচারী, সওদাগর ও ধনী-দীন প্রজার দল যথাযোগ্য যানবাহনে বা পদব্রজে! চলেছে রুগ্ন ও ভিখারির দল অরণ্যের ভিতর দিয়ে, অনুর্বর ক্ষেত্রের উপর দিয়ে বা সন্ন্যাসীর গায়ে-মাখানো শুকনো ভস্মের মতো সাদা ধুলোয় ভরা উঁচু-নীচু পথ মাড়িয়ে,-তাদের কোনো সম্পদ নেই, তবু তারাও পিছনে পড়ে থাকতে রাজি নয়, কারণ তাদের মনে মনে জ্বলছে উজ্জ্বল আশার অম্লান বাতি! হাজারের পর হাজার, লক্ষের পর লক্ষ লক্ষ লোক চলেছে, এগিয়ে চলেছে! কত লোকের দেহ পড়েছে এলিয়ে, পায়ে পড়েছে ফোসকা, তবু তারা এগিয়ে চলেছে। পথের মাঝে জাগছে পাগলি নদীর ক্রুদ্ধ ঢেউ, দুরারোহ শৈলের দর্পিত শিখর, দুর্গম বনের জ্বালাময় কণ্টক-প্রাচীর, তবু তারা সব পেরিয়ে চলেছে এগিয়ে-মুখে মুখে জাগিয়ে তুলে কবি-ঋষিদের রচিত পবিত্র মন্ত্রসংগীত! কত শত শত মানুষের অক্ষম ভগ্ন দেহ জনহীন অনভ্যস্ত পথের উপর লুটিয়ে পড়ল, তবু তাদের আত্মা এগিয়ে চলল সেই বিপুল বাহিনীর পিছনে পিছনে! . . . কিছুদিন পরে দিনের রোদে আর রাতের জোছনায় দেখা গেল, সেই নির্জন নিস্তব্ধ নির্দয় পথ জুড়ে পড়ে রয়েছে মাংসহীন নরকঙ্কালের পর নরকঙ্কাল,- জীবনের যাত্রাপথে যেসব অভাগা এগিয়ে যেতে পারলে না তাদেরই শেষ-চিহ্ন!

যারা এগিয়ে গেল আর যারা এগিয়ে যেতে পারলে না, তারা প্রত্যেকেই হচ্ছে ভারতসন্তান! হিমালয়ের আশ্রয় ছেড়ে, গঙ্গার স্নিগ্ধ স্পর্শ ভুলে, সাগর পার হয়ে ব্রহ্মদেশের নিবিড় অরণ্য ভেদ করে রাজা-প্রজা, পুরুষ-নারী, মা-ছেলে, বর-বউ, কুমার-কুমারী এইখানে এসে অবশেষে কাম্যলোকের সন্ধান পেলে-আজ আমরা যে পবিত্র ভূমির উপর দিয়ে পদচারণ করছি! সে হচ্ছে শত শত যুগ আগেকার কথা, স্বাধীন ভারতবর্ষে তখনও কোনো বিধর্মী প্রবেশ করতে সাহসী হয়নি। খুব সম্ভব তারা যে দেশ থেকে এসেছিল আজ আমরা তাকে মাদ্রাজ বলে জানি। ওঙ্কারধামের পাথরে পাথরে তারা যে সংস্কৃত ভাষার লিপি খুদে গেছে, তাই দেখেই এই সত্য জানা যায়। ওঙ্কারধামের অসংখ্য মূর্তিও তাদের মৌন ভাষায় আর এক নিশ্চিত সত্য প্রকাশ করবে : যাদের শিল্পনিপুণ হাত তাদের গড়েছে তারা প্রথমে ছিল হিন্দু, তারপর বৌদ্ধ।

এইখানে গহন বন কেটে তারা বিপুল সভ্যতা ও বিরাট নগর আর দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিল। তাদের হাতের অমর চিহ্ন আজও প্রায় অটুট হয়েই আছে! ভারতের গান্ধার, সারনাথ বা কোনারকের মতো এখানে আমরা কোনো প্রাচীন শিল্পকীর্তির ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাব না, ওঙ্কারধামের শত শত শিলাচিত্র, হাজার হাজার দেবতা-দানব মানব ও পশুর মূর্তি আজও সম্পূর্ণ গৌরবে বিরাজ করছে। এখানকার প্রাচীর ও দেওয়ালগুলি দেখলে সন্দেহ হবে, বয়সে তারা মোটেই পুরাতন নয়, সেকালে তারা যেমন শক্ত আর নিরেট ছিল আজও সেই রকমই আছে! বৃষ্টির জল আজও ছাদ ফুটো করতে পারেনি!

. . . মনে হয়, এই ঘণ্টা কয়েক আগেই যেন জীবন্তদের কলকোলাহলে ছিল চারিদিক পরিপূর্ণ হয়ে-দেবদাসীরা পায়ের নূপুর খুলে যেন এই সবে প্রণাম করে বিদায় নিয়ে গেছে, পুরোহিত মন্ত্র পড়ে পুজো সেরে এই সবে যেন চোখের অন্তরালবর্তী হয়েছেন, ধূপধুনো অগুরুর গন্ধ যেন আর একটু আগে এখানে এলেই পাওয়া যেত!

ঐতিহাসিকরা বলেন, একসময়ে ওঙ্কারধামের মতন বড়ো শহর সারা পৃথিবী খুঁজলেও পাওয়া যেত না। নবম শতাব্দীর প্রথমে ভারতশিল্পী যখন এই শহরকে সম্পূর্ণ করে তুলেছিলেন, তখন ইউরোপের যেকোনো নগর এর কাছে মাথা হেঁট করতে বাধ্য হত! এথেন্স, রোম, কার্থেজ ও বাবিলন প্রভৃতি বিখ্যাত ও অমর নগর তাদের উন্নতির দিনেও যে ওঙ্কারধামের চেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল, এমন মনে করবার মতো প্রমাণ নেই!

কিন্তু গভীর জঙ্গল আর হিংস্র পশুদের কবলে এত যত্নে গড়া মন্দির আর রাজধানীকে নিক্ষেপ করে কোথায় গেল সেই ভারতীয় রাজা, যোদ্ধা, সওদাগর আর শিল্পীর দল? কোথায় গেল এই সাগরপারে প্রবাসী ভারতীয় সভ্যতা? আজকের বোবা ওঙ্কারধাম সে প্রশ্নের কোনো উত্তর দেয় না। কেবল মনে হয়, এই ঘণ্টা কয়েক আগে যারা এখান থেকে চলে গিয়েছে যেকোনো মুহূর্তেই তারা আবার ফিরে এসে মন্দির আর নগর পুনরাধিকার করতে পারে!

অবাক হয়ে অতীত ভারতের এই ইতিহাস শুনতে শুনতে মানিক পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে। সূর্য তখন সুদূর অরণ্যের মধ্যে অদৃশ্য হয়েছে-পশ্চিম আকাশের মায়াপুরীর রঙিন কিরণমালা তখনও দুলছে হালকা মেঘে মেঘে। ওঙ্কারধামের পদ্মফোটা খালের ঝিলমিলে জলে, বট আর নারিকেলকুঞ্জের ভিড়ে ক্রমেই বেশি করে জমে উঠছে আসন্ন সন্ধ্যার ঘনচ্ছায়া! বিভিন্ন দল বেঁধে ছোটো ছোটো মেঘের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে পাখিরা আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে বাসার দিকে এবং তাদের কলধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে কানে আসছে দূরের মন্দিরগর্ভ ভেদ করে বৌদ্ধ পুরোহিতদের গম্ভীর মন্ত্র-ছন্দ! শুনলে আত্মা শিউরে উঠে,-এ কি বিংশ শতাব্দীর কণ্ঠস্বর না বহুযুগের ওপারে বসে ওঙ্কারধামের গৌরবের দিনে একদিন যারা এখানে উদাত্ত স্বরে স্তবপাঠ করত, তারই সুদীর্ঘ প্রতিধ্বনি আজও বেজে বেজে উঠছে মন্দিরের শিলায় শিলায়, অন্ধকারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে!

মানিক হঠাৎ মুখ তুলে সবিস্ময়ে দেখলে, তার সুমুখেই জেগে উঠেছে আশ্চর্য ও বিচিত্র এক নগর-তোরণ! দেখেই সে চিনতে পারলে, কারণ এই বিখ্যাত তোরণের বহু চিত্র ইংরেজি কেতাবে এর আগেই দেখেছে! কিন্তু এর আসল ভাবের কোনো আভাস ছবিতে কেউ ফোটাতে পারেনি।

খুব উঁচু সেই নগর-তোরণ, তার দ্বারপথ দিয়ে অনায়াসে বড়ো বড়ো হাতি আনাগোনা করতে পারে এবং তার উপরে জেগে রয়েছে চারিদিকে চারিটি বিরাট শিবের মুখ! এমন বৃহৎ শিবের মুখ মানিক জীবনে কোনোদিন দেখেনি!

ওঙ্কারধামের একজন হিন্দু রাজা একখানি শিলালিপিতে এই নগরকে প্রবলপরাক্রান্ত ও ভয়াবহ বলে বর্ণনা করে গেছেন। এখানকার হিন্দুরা জীবনধারণ করত তরবারির সাহায্যেই। তাদের স্থাপত্যেও প্রকাশ পেয়েছে সেই প্রচণ্ড ভাবই! কারণ বাহির থেকে ভিতরে ঢুকতে গেলেই শিবের যে প্রকাণ্ড মুখখানি দেখা যায়, তা ভয়ানক বটে,-সে যেন আগন্তুককে বলতে চায়, সাবধান! পূর্ব ও পশ্চিম দিকের মুখ দু-খানি যেন অনন্তের ধ্যানে আত্মহারা। এবং তোরণের ভিতরদিক থেকে যে মুখখানি নগরের দিকে তাকিয়ে আছে, তার ভিতর থেকে যেন আশীর্বাদ ও বরাভয়ের ভাব আবিষ্কার করা যায়!

প্রলয়কর্তা শিবকে নগররক্ষীরূপে নির্বাচন করে ওঙ্কারধামবাসী ভারতীয়রা উচিত কার্যই করেছে। কারণ, বারে বারে তারা যখন দিগবিজয়ে যাত্রা করত পৃথিবীর বুক ভেসে যেত তখন শোণিত প্রবাহে! প্রলয় দেবতার প্রীতির জন্যে লক্ষ লক্ষ শত্রুর প্রাণবলি দিয়ে অবশেষে তারা নিজেরাও পাষাণ দেবতার পায়ে আত্মদান করে চির বিদায় নিয়ে গিয়েছে। তাদের স্মৃতির শ্মশানে শেষ পর্যন্ত আজ জেগে আছেন কালজয়ী এবং চির একাকী প্রলয় দেবতাই!

অমলবাবু তোরণের উপরদিকে শিবের ভয়াল মুখের পানে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে নমস্কার করে বললেন, 'হে মহাদেব, তুমি কেবল লয়কর্তা নও, সৃষ্টি করাও তোমার কাজ! অবোধ প্রাণী আমরা, লোভে অন্ধ হয়ে তোমার আশ্রয়ে ছুটে এসেছি বলে আমাদের অপরাধ নিয়ো না প্রভু, আমাদের তুমি রক্ষা কোরো!'

মানিক হেসে বললে, 'এই পাথরে গড়া জড় দেবতার যদি রক্ষা করবার শক্তি থাকত, তাহলে ওঙ্কারধাম আজ শ্মশান হয়ে যেত না!'

অমলবাবু ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, 'মানিকবাবু, তীর্থক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে অমন কথা বলবেন না, এখনি সর্বনাশ হবে।'

মানিক বললে, 'সর্বনাশ যদি হয়, তাহলে ওই পাথরের দেবতার জন্যে নিশ্চয়ই হবে না, আমাদের নিজেদের বুদ্ধির ভুলেই হবে!'

মানিকের মুখের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গেসঙ্গে আসন্ন সন্ধ্যার কালিমাখা স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে আচম্বিতে জেগে উঠল একটা বন্দুকের শব্দ ও তীব্র আর্তনাদ! তারপরেই আবার বন্দুকের শব্দ!

অমলবাবু ও মানিকের সচকিত দৃষ্টি পরস্পরের মুখের দিকে ফিরল!

মানিক ত্রস্ত স্বরে বললে, 'শব্দগুলো এল বাংলোর দিক থেকে!' বলেই সে বেগে ডাকবাংলোর দিকে ছুটে চলল-তার পিছনে অমলবাবু!

বাংলোর হাতার মধ্যে ঢুকেই দেখা গেল, সুন্দরবাবু খুব ব্যস্তভাবে একটা বন্দুক নিয়ে ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছেন!

মানিক তাড়াতাড়ি শুধোলে, 'এখানে বন্দুক ছুড়লে কে? আর্তনাদ করলে কে?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আমিও তোমাদের ঠিক ওই কথাই জিজ্ঞাসা করতে চাই?'

-'জয়ন্ত কোথায়?'

-'সে তো এইখানেই ঘোরাঘুরি করছিল!'

মানিক চিৎকার করে ডাকলে, 'জয়ন্ত! জয়ন্ত!'

কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

মানিক বললে, 'সুন্দরবাবু আপনি ওইদিকে গিয়ে খুঁজুন! অমলবাবু আপনি ওইদিকে যান! আমি এইদিকটা খুঁজে দেখি!'

তিন জনে তিন দিকে ছুটল। সন্ধ্যা তখনও মানুষের চোখ অন্ধ করবার মতো অন্ধকার সৃষ্টি করেনি-শেষ পাখির দল তখনও বাসায় ফিরছে! কিন্তু মন্দিরের বৌদ্ধ পুরোহিতের কণ্ঠ আর শোনা যাচ্ছে না, নীরবতার মাঝখানে ছন্দ সৃষ্টি করছে কেবল তরুপল্লবের দীর্ঘশ্বাস!

হঠাৎ সুন্দরবাবুর ভীত কণ্ঠস্বর শোনা গেল-'মানিক! অমলবাবু! এইদিকে এইদিকে!'

মানিক সেইদিকে ঝড়ের মতন ছুটে গিয়ে দেখলে, একটা গাছের তলায় সুন্দরবাবু হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর হাতে রয়েছে একটা সোলার টুপি!

'কী সুন্দরবাবু, ডাকলেন কেন?'

'হুম, এ কী কাণ্ড! জয়ন্তের টুপি এখানে পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছিল, কিন্তু জয়ন্ত কোথায়?'

ততক্ষণে অমলবাবুও আর একদিক দিয়ে ছুটে আসতে আসতে হঠাৎ একজায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এখানে এত রক্ত কেন?'

মানিক উদভ্রান্তের মতো আবার সেইদিকে দৌড়ে গেল। আড়ষ্ট চোখে চেয়ে দেখলে, সেখানকার মাটি রক্তে যেন ভেসে যাচ্ছে!

সে প্রায় অবরুদ্ধ স্বরে বললে, 'এ কার রক্ত?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কিন্তু জয়ন্ত কোথায়?'

অমলবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে বললেন, 'মহাকালের অভিশাপ! মানিক, তোমার নাস্তিকতার ফল দেখো!'

পাথরের সিনেমা*

আরও অনেক ডাকাডাকির পরেও জয়ন্তের সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

ততক্ষণে গোলমাল শুনে অমলবাবুর দ্বারবান হাতি সিং ও দলের অন্যান্য চাকরবাকররাও এসে পড়েছে। সন্ধ্যার আবির্ভাবেও অন্ধকার সেখানে গাঢ় হতে পারলে না, কারণ কয়েকটা পেট্রলের লণ্ঠনের প্রখর আলোকে চারিদিক সমুজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিন্তু বনজঙ্গল ঠেঙিয়েও শত্রু বা মিত্র জনপ্রাণীরও সঙ্গে সাক্ষাৎ হল না।

সুন্দরবাবু হতাশভাবে কাঁচুমাচু মুখে বললেন, 'হায় হায় মগের মুল্লুকে এসে জয়ন্ত শেষটা প্রাণ হারাল!'

মানিক মাথা নেড়ে বললে, 'আমার বন্ধু এত সহজে কাবু হবার ছেলে নয়। জয়ন্ত হয়তো এখনি ফিরে আসবে!'

অমলবাবু বললেন, 'আমার তা মন হয় না। দু-দু-বার বন্দুকের আওয়াজ হল কেন? ওখানে রক্তে মাটি ভিজে কেন?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম! ওখানে জয়ন্তের টুপিটা গড়াগড়ি যাচ্ছে কেন?'

মানিক বললে, 'দেখা যাক, জয়ন্তের পদ্ধতিতেই কোনো রহস্য আবিষ্কার করা যায় কি না!'

যেখানে টুপিটা পড়েছিল সেইখানে গিয়ে সে আগে টুপিটা তুলে নিলে।

পরীক্ষা করতে গিয়ে প্রথমেই সভয়ে দেখলে, টুপির দু-দিকে দুটো ফুটো-বন্দুকের গুলি একদিক দিয়ে ঢুকে অন্যদিক দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে এবং টুপির ভিতরেও রক্তের দাগ! সেখানকার মাটির উপরেও রক্তের দাগ দেখা গেল!

মানিক নিরাশ কণ্ঠে বললে, 'আর কিছু পরীক্ষা করা মিছে! জয়ন্তের মাথায় লেগেছে শত্রুর গুলি।'

অমলবাবু বললেন, 'তাহলে গুলি খেয়ে জয়ন্তবাবু কি পালিয়ে গিয়েছেন?'

-'জয়ন্তের মতন সাহসী লোক খুব কম দেখা যায়। সে পালাবে বলে মনে হয় না।'

অমলবাবু বললেন, 'দশ জন সশস্ত্র লোক এক জনকে যখন হঠাৎ আক্রমন করে, তখন যে পালাতে রাজি হয় না তাকে সাহসী না বলে নির্বোধ আর গোঁয়ার বলাই উচিত। জয়ন্তবাবু নিশ্চয়ই এ শ্রেণির লোক নন।'

-'সেকথা সত্যি। কিন্তু তাহলেও এতক্ষণে সে ফিরে আসত।'

-'এখানে জয়ন্তবাবুও নেই, শত্রুরাও নেই। যদি তারা তাঁর পিছনে পিছনে ছুটে থাকে?'

-'অসম্ভব নয়। কিন্তু জয়ন্তকে ধরেও শত্রুরা বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারবে না। কারণ সেই সোনার চাকতিখানা তার কাছে আছে বটে, কিন্তু চাবিকাঠি আছে আমার কাছে। জয়ন্তের পরামর্শেই এই ব্যবস্থা হয়েছে। একজন ধরা পড়লে একসঙ্গে দুটো জিনিস চুরি যাবে না।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'এখানে রয়েছে জয়ন্তের রক্তমাখা টুপি, মাটির উপরেও রক্তের দাগ! কিন্তু ওখানে অত দূরেও মাটির উপরে রক্তের ঢেউ বইছে! আমার কি ভয় হচ্ছে জানো মানিক?'

-'কী ভয় হচ্ছে?'

-'আমরা দু-বার বন্দুকের আওয়াজ শুনেছি। ধরো, জয়ন্ত জানতে পারবার আগেই শত্রুর প্রথম গুলিতে আহত হয়ে এইখানে পড়ে যায় আর তার টুপিটা যায় মাথা থেকে খুলে। কিন্তু আহত হয়েও সে তাড়াতাড়ি আবার উঠে ওইদিক দিয়ে পালাবার চেষ্টা করে, তাই এখানে রক্তের দাগ এত কম। সে যখন ওইখানে গিয়ে পৌঁছেচে তখন শত্রুদের দ্বিতীয় গুলি আবার তাকে মাটির উপরে পেড়ে ফেলে, আর তার রক্তের ধারায় মাটি যায় ভিজে। তারপর হয় সে অজ্ঞান হয়ে গেছে, নয়-ভগবান না করুন-মারা পড়েছে! কারুর দেহ থেকে অত বেশি রক্ত বেরুলে তার পক্ষে বাঁচা অসম্ভব, দীর্ঘকাল পুলিশে কাজ করে এ অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে! মানিক, খুব সম্ভব আমাদের বন্ধু আর বেঁচে নেই!'-গভীর দুঃখে সুন্দরবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, তাঁর চোখ দু-টি ছলছল করতে লাগল!

অমলবাবু আকুল কণ্ঠে বললেন, 'কিন্তু জয়ন্তবাবুর দেহ কোথায় গেল?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'নিজেদের বিরুদ্ধ প্রমাণ লুকোবার জন্যে শত্রুরা জয়ন্তের দেহ সরিয়ে ফেলেছে।'

ওঙ্কারধামের মন্দির চূড়াকে তখন রহস্যময় আকাশের বিরাট পটে কালি দিয়ে আঁকা ছবির মতন দেখাচ্ছে এবং জঙ্গলের বোবা অন্ধকারের মুখে ভাষা দিয়ে ধীরে ধীরে জেগে উঠেছে নৈশ জীবদের নানারকম কলরব, গাছে গাছে পাতায় পাতায় বাতাসের নিশ্বাস-উচ্ছ্বাস।

মানিক খানিকক্ষণ স্তব্ধ মূর্তির মতো বসে থেকে হঠাৎ পাগলের মতো চিৎকার করে উঠল, 'প্রতিশোধ-প্রতিশোধ-আমি প্রতিশোধ চাই!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম! আমারও ওই কথা! এখন আর পদ্মরাগ বুদ্ধের খোঁজ নয়, আগে খুঁজে বার করতে হবে জয়ন্তের হত্যাকারীদের!'

অমলবাবু বললেন, 'কিন্তু কোথায় তারা?'

মানিক বললে, 'অমলবাবু, যে ভাঙা মন্দিরের ভিতর থেকে আপনি বুদ্ধমূর্তিটা এনেছিলেন, সেখানে যাবার পথ আপনার মনে আছে তো?'

-'নিশ্চয়ই আছে!'

-'তাহলে তল্পিতল্পা গুছিয়ে নিয়ে এখনি চলুন সেইদিকে!'

-'তবে কি এখন হত্যাকারীদের সন্ধান করা হবে না?'

-'অমলবাবু, হত্যাকারীরা যদিও চাবিটা পায়নি, কিন্তু চাকতির নকশা তো পেয়েছে! তারা এখন সেই মন্দিরের দিকেই যাবে। ওইদিকে গেলেই তাদের খোঁজ পাব।'

-'কিন্তু আমরা যখন সেখানে গিয়েছিলুম তখন চ্যান আর ইনকে তো সঙ্গে নিয়ে যাইনি, মন্দিরে যাবার পথ হয়তো তারা জানে না।'

-'এটা আপনার ভুল বিশ্বাস। পদ্মরাগ বুদ্ধের কথা আর মন্দিরের পথ হয়তো তারা আপনার আগে থাকতেই জানত-জানত না কেবল পদ্মরাগ বুদ্ধের ঠিকানা। চাকতির নকশা পেয়ে তারা এখন সদলবলে সেইদিকেই ছুটে চলেছে!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'মানিকের কথাই যুক্তিসংগত বলে মনে হচ্ছে। চলো, চলো-আর দেরি করা নয়, যত দেরি করব শত্রুরা ততই এগিয়ে যাবে! আগে প্রতিহিংসা, তারপর শোক-দুঃখের কথা! তাড়াতাড়ি পেটে ছাইভস্ম কিছু পুরে আমাদের এখনি যাত্রা করতে হবে!'

সবাই যখন শত্রুদের সন্ধানে যাত্রা শুরু করলে, আকাশে তখন অপরিপূর্ণ চন্দ্র জেগে চারিদিকে যেন ছায়ামাখা আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে! ডাকবাংলোর ছাদে একটা প্যাঁচা বসেছিল, হঠাৎ এতগুলো লোক দেখে ভয়ে চ্যাঁ-চ্যাঁ করে চেঁচিয়ে শূন্যে ঝটপট ডানা বাজিয়ে উড়ে পালাল।

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম-পথে পা বাড়াতে-না-বাড়াতেই প্যাঁচার ডাক! দুর্গা, দুর্গা!'

মানিক দুঃখিত স্বরে বললে, 'জয়ন্তকে যখন হারিয়েছি, তুচ্ছ প্যাঁচার ডাকে আমাদের আর কী অনিষ্ট হবে সুন্দরবাবু?'

-'যা বলেছ মানিক! জয়ন্ত যে আমাদের কতখানি ছিল এখন সেটা বুঝতে পারছি! আজ আমরা তাকে হারিয়ে চলেছি যেন নাবিকহীন জাহাজের মতো! কপালে এও ছিল-হুম!'

এবারে আর ঝাপসা আকাশপটে নয়, চাঁদের ছটা পিছনে রেখে ওঙ্কারধামের পঞ্চচূড়া অন্ধকারে গড়া পঞ্চ স্তম্ভের মতো মহাশূন্যের বুক বিদীর্ণ করছে! এখন তাকে কী অবাস্তবই দেখাচ্ছে! অতীতের একটা বিলুপ্ত জাতির সমস্ত সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশার সমাধি-মন্দির এই ওঙ্কারধাম। তার বিপুল ছায়ার তলায় লক্ষ লক্ষ মানুষের দেহ মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে আজও বিদ্যমান রয়েছে-তারই উপর দিয়ে লণ্ঠনের আলোতে চলন্ত ও সুদীর্ঘ কৃষ্ণচ্ছায়ার সৃষ্টি করে হেঁটে যাচ্ছে আজ বিংশ শতাব্দীর কয়েকটি প্রাণী! একদিন এইখান দিয়ে হেঁটে বা রথে বা গজপৃষ্ঠে বা অশ্বারোহণে বীরদর্পে ধনুক-বর্ষা-তরবারি হাতে করে দলে দলে হাজারে হাজারে এগিয়ে গিয়েছিল যে স্বাধীন ভারতের ছেলেরা, তাদের সঙ্গে তুলনা করলে তাদের স্বগোত্র এই লোকগুলিকে কত অসহায়, কত ক্ষুদ্র, কত তুচ্ছ বলেই মনে হয়!

দূর গ্রামে কাদের সব দামামা বাজছে এবং তাদের প্রতিধ্বনি ফিরে আসছে ওঙ্কারধামের গগনস্পর্শ শিখরে প্রতিহত হয়ে।

সকলে তখন একটি পাথরে গড়া প্রকাণ্ড চত্বরের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল!

অমলবাবু যেন আপন মনেই বললেন, 'রাজা ইন্দ্রবর্মণের পুত্র যশোবর্মণ ছিলেন একজন মহামানুষ! তাঁর দেহ ছিল দানবের মতন প্রকাণ্ড, জনতার অনেক উচ্চে জেগে থাকত তাঁর গর্বিত মাথা! আর তাঁর বলবীর্যও ছিল অসাধারণ! তিনি নাকি নিরস্ত্র হয়েও খালি হাতে হস্তী ও ব্যাঘ্র সংহার করেছিলেন!

'তাঁর কীর্তিও তেমনি অতুলনীয়! সিংহাসনে আরোহণ করে মাত্র এগারো বৎসরের ভিতরেই তিনি এখানকার বিরাট নগর গড়ে সম্পূর্ণ করে ফেলেছিলেন, বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগেও যা অসম্ভব বলেই মনে হয়!

'আমরা এখন যেখান দিয়ে যাচ্ছি, এইখানেই মহারাজ যশোবর্মন যে-বীরত্ব আর অসমসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা অমানুষিক বললেও চলে।

'ওঙ্কারধামের বয়স তখন পুরো এক বৎসরও হয়নি। ভারত রাহু সম্বুদ্ধি নামে এক রাজা বিদ্রোহী হয়ে হঠাৎ একরাত্রে সসৈন্যে প্রাসাদ আক্রমণ করলেন।

'প্রাসাদের বাহিরে যেসব প্রহরী ছিল তারা সকলেই মারা পড়ল। বিদ্রোহীরা সিংহদ্বার দিয়ে ভিতরে ঢুকতে লাগল পঙ্গপালের মতো দলে দলে। ভিতরের প্রহরীরা প্রাণভয়ে কে কোথায় সরে পড়ল তার কোনো সন্ধানই মিলল না।

'বিদ্রোহীদের জয়ধ্বনিতে মহারাজ যশোবর্মনের ঘুম ভেঙে গেল। তিনি তাড়াতাড়ি উলঙ্গ তরবারি নিয়ে প্রাসাদে ঢোকবার সংকীর্ণ এক পথের উপরে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর পাশে রইল দুই জন মাত্র সাহসী যোদ্ধা।

'বিদ্রোহীরা দলে খুব পুরু ছিল বটে, কিন্তু একসঙ্গে দুই-তিন জনের বেশি লোকের পক্ষে সেই সংকীর্ণ পথে প্রবেশ করা সম্ভবপর ছিল না। মহারাজ যশোবর্মণ বিপুলবপু নিয়ে সেই পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে নিজের প্রাণ ও রাজ্য রক্ষার জন্যে উন্মত্তের মতো অসিচালনা করতে লাগলেন -বিদ্রোহীরা এগিয়ে আসছে আর গোড়াকাটা কলা গাছের মতো মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ছে!

'যশোবর্মণের দুই সঙ্গী রাজার জন্যে প্রাণ দিলে, কিন্তু মহারাজের সতর্ক তরবারি এড়িয়ে তবু কেউ ভিতরে ঢুকতে পারলে না।

'বিদ্রোহীদের নেতা ভারত তখন মহাবিক্রমে যশোবর্মণকে আক্রমণ করলেন-দুই বীরের মুক্ত তরবারি বারবার পরস্পরের আলিঙ্গন ধরা পড়তে লাগল।

'যুদ্ধ যখন শেষ হল তখন দেখা গেল, বিদ্রোহী ভারতের মৃতদেহের উপরে সগর্বে দাঁড়িয়ে, শূন্যে রক্তাক্ত তরবারিতে বিদ্যুৎ খেলিয়ে মহারাজ যশোবর্মণ সিংহনাদ করছেন! বাকি বিদ্রোহীরা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেল!'

হাতি সিং ও আর চার জন অনুচর প্রত্যেকেই এক-একটা পেট্রলের লণ্ঠন নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, এবং সেই প্রচণ্ড আলোকের তীব্রতায় ভয় পেয়ে দূরে সরে সরে যাচ্ছে ছায়াময় অন্ধকার।

সেই আলোতে কোথাও স্পষ্ট এবং কোথাও অস্পষ্ট ভাবে দেখা গেল, বিরাট সব দানবের প্রস্তরমূর্তি বহুমুণ্ড সর্পদের ধরে পাশাপাশি বসে আছে! উপবিষ্ট অবস্থাতেই প্রত্যেক দানবের উচ্চতা আট ফিটের কম হবে না। কোনো কোনো দানব শতাব্দী ধরে প্রকাণ্ড শিলাসর্পের গুরুভার আর বইতে না পেরে যেন শ্রান্ত হয়েই নীচের খালের ভিতরে গড়িয়ে পড়ে গেছে!

অমলবাবু বললেন, 'আগে এমনি পাঁচ-শো চল্লিশটি দানব এখানকার পাঁচটি সিংহদ্বারের কাছে পাহারায় নিযুক্ত থাকত। এখানে কোথাও ক্ষুদ্রতা কি অপ্রাচুর্য নেই! যা দেখবে সবই বিরাট! ওঙ্কারধামের প্রধান মন্দির চূড়ার উচ্চতা হচ্ছে দু-শো পঞ্চাশ ফুট-অর্থাৎ কলকাতার গড়ের মাঠের মনুমেন্টের চেয়ে তা দু-গুণ বেশি

উঁচু! আর তার অন্য চারটি শিখরও বড়ো কম যায় না, কারণ তাদের প্রত্যেকের উচ্চতা হচ্ছে দেড়-শো ফুট করে! আর চারিদিক ঘিরে ওই যে খাল চলে গেছে, তাও চওড়ায় দু-শো ত্রিশ ফুট!'

সর্পমূর্তি চোখে পড়ে চতুর্দিকেই। এর দুই কারণ থাকতে পারে। প্রথম, সাপ হচ্ছে শিবের প্রিয় জীব এবং ওঙ্কারধাম হচ্ছে আসলে শিবেরই লীলানিকেতন। দ্বিতীয়, ওঙ্কারধামের প্রথম রাজা কম্বু বিবাহ করেছিলেন নাগরাজের কন্যাকেই। এবং এ স্থানটা হচ্ছে নাগরাজ্যেরই অংশবিশেষ।

যেখানেই ভারত শিল্পীর বাটালি পড়েছে সেখানেই জন্মলাভ করেছে অসংখ্য হাতির মূর্তি। এখানেও তাই। সর্বত্রই এত হাতি যে দেখলে অবাক হতে হয় এবং অধিকাংশ মূর্তিই জীবন্ত হাতির মতোই মস্ত বড়ো! এমন বৃহৎ সব মূর্তি এত অজস্র পরিমাণে গড়তে যে কত যুগের দরকার হয়েছিল তা ভাবলেও অবাক হতে হয়! কিন্তু ভারতের শিল্পী হয়তো পরিশ্রম ও কালের হিসাব রাখতে জানত না-তাদের ধৈর্যের পরমায়ু ছিল অক্ষয়! যেন তারা জন্মজন্মান্তর ধরে মূর্তি বা মন্দির গড়তেও নারাজ ছিল না! এবং কঠিন পাথর ছিল তাদের হাতে যেন নরম ভিজে বেলেমাটির মতো! তাদের হাতের মায়া-ছোঁয়া পেলে পাথর যেন বেঁকে-নুঁয়ে-দুমড়ে অতি সহজেই শিল্পীর ইচ্ছামতো যেকোনো আকার ধারণ করতে বাধ্য হত! এ বিষয়ে ভারত শিল্পের কাছে পৃথিবীর আর সব দেশের শিল্পই ম্লান হয়ে যাবে!

দেয়ালের গায়ে গায়ে পাথরে খোদা ছবিই বা কত! সেই ছবির পর ছবির সারি মাপলে নিশ্চয়ই এক মাইলের কম হবে না। কোথাও মস্ত হস্তীরা ধেয়ে চলেছে, কোথাও দেবতা, দানব, মানবের জনতা, কোথাও রামায়ণের দৃশ্যের পর দৃশ্য, কোথাও গম্ভীর অরণ্যে বন্য জন্তুরা বিচরণ করছে, কোথাও সাগরে সামুদ্রিক জীবরা সাঁতার কাটছে, কোথাও রন্ধনশালায় রান্না হচ্ছে, বাজারে নানা জিনিসের বিকিকিনি চলছে, বাজিকররা হরেকরকম খেলা দেখাচ্ছে এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ঘোড়ায় চড়ে পোলোর মতন কী এক খেলায় নিযুক্ত হয়ে আছেন! রাজা-প্রজা, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, দেবদাসী, রাজকুমারী, সুয়োরানি-দুয়োরানি, সখীর দল, বাঁদি ও তীর্থযাত্রী-কিছুরই অভাব নেই! দ্বন্দ্বযুদ্ধ, স্থলযুদ্ধ, জলযুদ্ধ, রাজসভা, কুচকাওয়াজ শোভাযাত্রা, উৎসব, পূজা, নাচ, ঘরসংসার,-শিল্পীর বাটালি কোনো কিছুরই প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করেনি! মহাকালের অদৃশ্য হস্ত কত শতাব্দীর রহস্যময় যবনিকা হঠাৎ এখানে সরিয়ে দিয়েছে, তাই হাজার বছর পরেও এখানে এসে বিংশ শতাব্দী বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে দেখছে সেকালের সমস্ত সুখ-দুঃখমাখা বিচিত্র জীবনযাত্রার চিত্র। প্রথম দর্শনে সন্দেহ হয় এক মুহূর্ত পূর্বেও এরা সবাই জীবন্ত গতির লীলায় চঞ্চল হয়ে অতীত নাট্যলীলার পুনরাভিনয় করছিল, বর্তমানের ক্ষুদ্র মানুষদের পদশব্দ পেয়ে এখন স্তম্ভিত হয়ে গেছে আচম্বিতে!

আসলে কিন্তু সমস্তই অতীত! যোদ্ধাদের ধনুকগুলো নুয়ে আছে, কিন্তু তির আর ছুটবে না! মায়ের কোলে শুয়ে পাথুরে শিশুরা স্তন্যপান করছে, কিন্তু তারা বালক বা যুবক হতে পারবে না! শিলাহস্তীর দল তাদের যে-সব পা শূন্যে তুলেছে, সেগুলো আর কখনো মাটিতে পড়বে না! সৈন্যদল যুদ্ধযাত্রায় বেরিয়েছে যাদের বিরুদ্ধে, সেই বিদেশি শত্রুদের সঙ্গে তাদের আর কোনোদিন দেখা হবে না, রাজসভার জনতার মধ্যে সিংহাসনের উপরে ছত্রের তলায় মহারাজ বসেছেন বিচারে, কিন্তু তাঁর মুখ আর কথা কইবে না! এরা এখন সবাই আড়ষ্ট, সবাই চির বোবা! আরও কত যুগ আসবে, আবার চলে যাবে, কিন্তু সেই মৃত জাতির লুপ্ত সভ্যতার এই কালজয়ী স্মৃতি তখনও এমনি স্তম্ভিত ও আড়ষ্ট হয়েই এখানে বিরাজ করবে।

সুন্দরবাবু সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'হুম! এ যে পাথরের সিনেমা! কত গল্পের ছবিই এখানে রয়েছে!'

অমলবাবু বললেন, 'সত্যিই তাই! সেকালের অধিকাংশ লোকই তো পড়তে জানত না, প্রাচীন শিল্পীরা তাই মন্দিরের গায়ে সমস্ত বিখ্যাত কাব্যের আর ইতিহাসের ছবি খুদে রাখতেন। নিরক্ষর লোকরাও সেগুলো দেখে শিক্ষালাভ করত।'

মানিকও এই শিলাময় নতুন জগতে এসে বিস্মিত হয়েছিল, কারণ ভারত শিল্পীর এই নতুন স্বদেশে এসে বিস্মিত না হয়ে থাকতে পারে কে? কিন্তু সে বিস্ময় তাকে বেশিক্ষণ অভিভূত করে রাখতে পারেনি। তার মাথায় ঘুরছে কেবল জয়ন্তের কথা এবং তার মন ক্রমাগত হা-হা করে উঠছে!

অমলবাবুর কোনো উক্তিই ভালো করে তার কানে ঢুকছিল না, শূন্য দৃষ্টিতে চারিদিকের শিল্পকাজের দিকে তাকাতে তাকাতে সে হনহন করে এগিয়ে চলল,-লণ্ঠনের আলোকরেখাগুলো যে তার পিছনে অনেক দূরে পড়ে রইল, সে খেয়ালও তার রইল না!

একজায়গায় মোড় ফিরে সে যেখানে এসে দাঁড়াল সেখানে কেবল চাঁদের আধফোটা আলোতে চারিদিক থমথম করছে। অস্পষ্টভাবে দেখা গেল মস্ত মস্ত পাথরের হাতির পর হাতি সার গেঁথে কোথায় কতদূরে নিবিড় তিমিরের ভিতর হারিয়ে গিয়েছে, তার কোনো ঠিকঠিকানাই নেই!

হঠাৎ তার হুঁশ হল, এর পরে কোনদিকে যেতে হবে তা সে জানে না এবং ভুল পথে গেলে সঙ্গীদের সঙ্গে হয়তো আর দেখা হবে না। মানিক সেইখানেই দাঁড়িয়ে পড়ে সঙ্গীদের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

তারা-ছড়ানো আকাশ তখন যেন তন্দ্রাময়। খানিক তফাতে অরণ্যের কালিময় বুকের তলা থেকে ভেসে আসছে যেন রাত্রি-দানবীর ফিসফিস কানাকানি! জীবন্ত জগতের আর কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

চতুর্দিকের নিস্তব্ধতা আচম্বিতে, আর যেন চুপ করে থাকতে না পেরে, পাগল হয়ে গর্জন করে উঠল-গুড়ুম, গুড়ুম!

চমকে উঠে মানিক ফিরে দাঁড়াল বিদ্যুতের মতো!

পিছনে অনেক লোকের গোলমাল! আবার দু-বার বন্দুকের শব্দ, তারপরই দূর থেকে সুন্দরবাবু চিৎকার শোনা গেল-'মানিক! মানিক!'

মানিক ফিরে দৌড়োবার উপক্রম করছে, হঠাৎ বৃহৎ একটা গুরুভার তার পিঠের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং কোনো কিছু বোঝবার আগেই বিষম এক ধাক্কায় সে একেবারে মাটির উপরে উপুড় হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল!

তারপরই কে তার পিঠের উপরে চেপে বসল এবং দু-খানা বড়ো বড়ো চ্যাটালো হাতে প্রাণপণে তাঁর গলা চেপে ধরল!

সেই অজ্ঞাত শত্রুকে পিঠ থেকে ঠেলে ফেলে দেবার জন্যে মানিক তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করল, কিন্তু কিছুই করতে পারল না! দশটা লোহার মতন কঠিন আঙুলের চাপে তার সমস্ত জ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেল।

যুদ্ধের আয়োজন

কতক্ষণ পরে তার জ্ঞান ফিরে এল মানিক তা জানে না, কিন্তু চোখ মেলে দেখলে সুন্দরবাবু ও অমলবাবু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখে তার দেহের দুই পাশে বসে আছেন এবং হাতি সিং বসে আছে তার মাথাটা নিজের কোলের উপরে টেনে নিয়ে।

প্রথমটা কিছুই মনে পড়ল না। কিন্তু সে উঠে বসবার চেষ্টা করতেই অমলবাবু বলে উঠলেন, 'না, না, আপনি আরও খানিকক্ষণ শুয়ে থাকুন!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম, বিপদে পড়লুম আমরা, লড়াই করলুম আমরা, শত্রুদের তাড়ালুম আমরা। কিন্তু তুমি খামোকা অজ্ঞান হয়ে গেলে কেন বাপু?'

তখন মানিকের সব স্মরণ হল এবং তার কণ্ঠদেশ যে বেদনায় টনটন করছে এটাও অনুভব করতে পারলে। সে বললে, 'সুন্দরবাবু, পিছন থেকে হঠাৎ আক্রমণ করে কে আমার গলা টিপে ধরেছিল! আপনারা কি এখানে এসে কারুকে দেখতে পাননি?'

-'হুম, তুমি বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিল। স্বপ্ন দেখে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে। এখানে এসে আমরা একটা টিকটিকির ল্যাজ পর্যন্ত দেখতে পাইনি। পেয়েছি কি অমলবাবু?'

-'না।'

মানিক বললে, 'আমার গলায় ভয়ানক ব্যথা! সুন্দরবাবু, এটাও কি স্বপ্নদেখার ফল?'

-'কই দেখি! তাই তো হে মানিক, তোমার গলার ওপরে যে অনেকগুলি আঙুলের লাল লাল দাগ রয়েছে! কে তোমার গলা টিপে ধরেছিল? কেন ধরেছিল? সে বেটা গেল কোথায়?'

অমলবাবু বললেন, 'ব্যাপার তো কিছুই বুঝতে পারছি না! তোমাকে আক্রমণ করারও মানে হয় না, আমাদেরও আক্রমণ করার মানে হয় না।'

-'আপনাদের কে আক্রমণ করেছিল?'

-'অনেকগুলো লোক। আক্রমণ করেছিল বললে ঠিক হয় না, কারণ তারা আমাদের কাছে আসেনি। তুমি তো এগিয়ে এলে, আমি সুন্দরবাবু সঙ্গে কথা কইতে কইতে আসছিলুম! হঠাৎ দূরে বনের ভিতর থেকে চার-পাঁচ জন লোক বেরিয়ে আমাদের দিকে ছুটে আসতে লাগল। আমরা বন্দুক ছুড়তেই তারা আবার অদৃশ্য হল! মিনিট খানেক পরে পথের আর একদিকে আবার চার-পাঁচ জন লোকের আবির্ভাব, আবার আমাদের বন্দুক ছোড়া-আবার তাদেরও অন্তর্ধান!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আমার মনে হল, তারা আমাদের আক্রমণ করতে চায় না, কেবল আমাদের ভয় দেখাতে চায়!'

মানিক ধড়মড়িয়ে উঠে বসে তাড়াতাড়ি জামার বোতাম খুলে ভিতর দিকে হাত চালিয়ে দিয়ে কী যেন অনুভব করলে, তারপর আশ্বস্ত ভাবে বললে, 'নাঃ, ঠিক আছে!'

সুন্দরবাবু বিস্মিত কণ্ঠে শুধোলেন, 'কী ঠিক আছে, মানিক?'

'সেই চাবিটা। আমার জামার ভিতর দিককার পকেটে সেই চাবিটা রেখে পকেটের মুখটা সেলাই করে দিয়েছি। শত্রুরা কোনোগতিকে সন্দেহ করেছে চাবিটা আমার কাছেই আছে। এটা হাতাবার জন্যেই তারা আমাকে একলা পেয়ে মারবার, আর আপনাদের ভয় দেখাবার চেষ্টা করেছিল।'

অমলবাবু বললেন, 'তার মানে?'

-'মানে খুব সহজ। আমি বোকার মতো এগিয়ে আপনাদের চোখের আড়ালে এসে পড়েছিলুম। তখন এক জন কি দু-জন শত্রু অতর্কিতে আমাকে আক্রমণ করতে আসে। সেই সময়টায় আপনাদের অন্যমনস্ক রাখার জন্যে বাকি শত্রুরা আপনাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা খেলছিল!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'মানিক, তোমার কথাই ঠিক বলে মনে হচ্ছে! কিন্তু তোমাকে গলা টিপে অজ্ঞান করে ফেলেও তারা ওই চাবিটা নিয়ে গেল না কেন?'

-'এর একমাত্র কারণ হতে পারে, হয়তো চাবিটা খুঁজতে তাদের দেরি হয়েছিল। আপনারা এসে পড়াতে তারা পালিয়ে যায়।'

-'খুব সম্ভব তাই।'

এমন সময়ে হাতি সিং জমির উপর থেকে কী একটা ছোটো চকচকে জিনিস তুলে নিয়ে মানিককে বললে, 'বাবুজি, আপনি উঠে বসতেই এটা আপনার বুক থেকে মাটির ওপরে পড়ে গেল!'

সেই জিনিসটার দিকে তাকিয়েই সকলের দৃষ্টি যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতন হয়ে গেল। সেটা আর কিছু নয়, সেই নকশা আঁকা সোনার চাকতি!

কী অদ্ভুত রহস্য! চাকতি ছিল আগে হতভাগ্য জয়ন্তের কাছে, তারপর তাকে হত্যা করে শত্রুরা নিশ্চয়ই এই চাকতিখানাকে হস্তগত করেছিল, কিন্তু যে অমূল্যনিধির জন্যে এত খোঁজাখুজি, এত হানাহানি এমন অরক্ষিত অবস্থায় সেই জিনিসটাই মানিকের বুকের উপরে অযাচিতভাবে এসে পড়ল কেমন করে?

তাড়াতাড়ি চাকতিখানা নিয়ে লণ্ঠনের আলোতে ভালো করে পরীক্ষা করে মানিক হতবুদ্ধির মতো বললে, 'এ যে সেই চাকতি, তাতে আর কোনোই সন্দেহ নেই! কিন্তু-কিন্তু, নাঃ, আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম, আমিও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাচ্ছি!'

খানিকক্ষণ সকলেই বিস্ময়ে স্তব্ধ! তারপর অমলবাবু ধীরে ধীরে বললেন, 'হয়তো মানিককে যে আক্রমণ করেছিল, ধস্তাধস্তির সময়ে চাকতিখানা তার অজান্তেই পড়ে গিয়েছে!'

মানিক বললে, 'আপাতত তাই মনে করা ছাড়া উপায় নেই! কিন্তু এ বড়ো আশ্চর্য?'

আচম্বিতে সুন্দরবাবু কী দেখে বেজায় চমকে উঠলেন। তাড়াতাড়ি একটা লণ্ঠন তুলে ধরে জমির দিকে দৃষ্টিপাত করে বিপুল বিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'হুম! এ আবার কী?'

মানিক অবাক হয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলে, তার পাশের জমির উপরে অনেকখানি রক্ত পড়ে রয়েছে,-খালি রক্ত নয়, সেই সঙ্গে রয়েছে একখানা বড়ো ছোরা বা ছোটো তরবারির মতো অস্ত্র এবং মানুষের হাতের সদ্য-কাটা আঙুল!

অমলবাবু এরকম ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন না, তিনি শিউরে উঠে দু-হাতে মুখ ঢেকে ফেললেন!

সুন্দরবাবু মানিকের দুই হাতের উপরে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'মানিক, তোমার হাতের একটা আঙুলও তো হারিয়ে যায়নি দেখছি! তবে এ বেওয়ারিস আঙুলের অর্থ কী?'

মানিক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ ধরে আঙুলটা দেখে বললে, 'আঙুলটা কিরকম লম্বা আর মোটা দেখছেন তো! এ আঙুল যারই হোক, তাকে খুব ঢ্যাঙা আর বলিষ্ঠ বলেই মনে হয়!'

অমলবাবু সচকিত কণ্ঠে বললেন, 'শত্রুদের দলে চ্যান আছে কি না জানি না, কিন্তু খুব ঢ্যাঙা আর বলিষ্ঠ লোক বললে চ্যানকেই আমার মনে পড়ে!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'ধরে নেওয়া যাক, চ্যান সকলের চোখে ধুলো দিয়ে কোনোরকমে এক জাহাজেই আমাদের সঙ্গে এসেছে! ধরে নেওয়া যাক, চ্যানই গলা টিপে মানিককে অকালে স্বর্গে পাঠাবার চেষ্টা করেছিল! কিন্তু চ্যানের আঙুল বলি দিলে কে? মানিক, অজ্ঞান হবার আগে তুমি কি লড়াই করেছিলে?'

মানিক বললে, 'লড়াই করব কী, কে আমাকে আক্রমণ করেছিল তাও দেখতে পাইনি! আর দেখছেন না, ছোরাখানাও রক্তমাখা! নিশ্চয়ই ওই ছোরাতেই আঙুলটার উচ্ছেদ হয়েছে! ওরকম দু-ধারে ধার দেওয়া ছোরা কখনো আমার কাছে ছিল না! ও ছোরা কার? ওর মালিক ওখানা ফেলে রেখে গিয়েছে কেন? আমাকে বাঁচাবার জন্যেই সে যদি আমার শত্রুকে ছোরা নিয়ে আক্রমণ করে থাকে, তবে সেও পালিয়ে গেল কেন? তাকে তো আমরা বন্ধু বলে পরম সমাদর করতুম! আর এই অজানা মুল্লুকে বন্ধুই বা পাব কোত্থেকে, বন্ধু তো আকাশ থেকে খসে পড়েনি!'

অমলবাবু বললেন, 'এক হতে পারে, পদ্মরাগ বুদ্ধের লোভে ওই সোনার চাকতিখানার জন্যে শত্রুরা নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করেছিল!'

সুন্দরবাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, 'ওসব বাজে কথা! শত্রুরা নিজেদের মধ্যে কাটাকাটি করতে পারে, কিন্তু মানিককে বাঁচাবার জন্যে তাদের কারুরই মাথাব্যথা হতে পারে না! হুম, এসব হচ্ছে ডাহা ভূতুড়ে কাণ্ড। এ জায়গাটা হচ্ছে হাজার বছরের পুরোনো একটা মরা জাতের গোরস্থানের মতো! এখানকার আনাচেকানাচে ভূতের আড্ডা আছে!'

মানিক বিষণ্ণ কণ্ঠে বললে, 'এ যদি ভূতুড়ে কাণ্ড হয় আমি তাহলে বলব, জয়ন্তের প্রেতাত্মাই আমাকে আজ বাঁচিয়েছে, আর নিজের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিয়েছে!'

সুন্দরবাবু তখনি টপ করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আর এখানে থাকা উচিত নয়। আমি অবশ্য জয়ন্তকে অত্যন্ত ভালোবাসি, কিন্তু তার প্রেতাত্মাকে ভালোবাসবার ইচ্ছে আমার নেই। আমার বাবা-মা স্বর্গে গিয়েছেন, কিন্তু তাঁদের প্রেতাত্মা এলেও আমি আর দেখা করব না! ওঠো মানিক, উঠুন অমলবাবু!'

মানিক গাত্রোত্থান করে বললে, 'হ্যাঁ, এখানে আর দেরি করে লাভ নেই। এই গভীর রহস্যের কিনারা না করেই আমাদের তাড়াতাড়ি যাত্রা করতে হবে।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'খালি ভূত নয়, এখানে চারিদিকে শত্রুরাও লুকিয়ে আছে। তারা আমাদের সমস্ত গতিবিধিই লক্ষ করছে! তারা যে সাহস করে আমাদের আক্রমণ করতে পারছে না, তার কারণ হচ্ছে আমরা সবাই সতর্ক আর আমাদের হাতে আছে চার-চারটে বন্দুক। . . . আরে গেল, এই হাতি সিং! তোমার নাম

গাধা সিং হওয়া উচিত! তোমার বন্দুকের মুখনল আমার ভুঁড়ির দিকে নামিয়ে রেখেছ কেন? যদি ফস করে আওয়াজ হয়ে যায়? অমন করে বন্দুক ধরতে নেই, ওটা কাঁধে তোলো!'

আলোয়-ছায়ায়, মাঠে-জঙ্গলে, পথে-বিপথে আবার সবাই এগিয়ে চলল। রাত পোয়াল, উষার সিঁথায় দিবসবধূ সিঁদুর-লেখা লিখলে, মাঠ-ঘাটের উপর দিয়ে তপ্ত দুপুরে-হাওয়া তেষ্টায় হা-হা করে গহনবনের ঠান্ডা বুকের ভিতর গিয়ে নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে পড়ল, সন্ধ্যার মেঘ-মন্দিরে সূর্যচিতার রক্তশিখা জ্বলে উঠল, রাত্রি আবার তার অন্ধ কুঠুরির দরজা খুলে ছায়া-অনুচরদের পৃথিবী ভ্রমণে পাঠিয়ে দিলে! মাঝে মাঝে দেখা দেয় মাটির উপর চির-চলন্ত বৃহৎ জলসর্পের মতো নদী। তখন ওঠে নদী পার হবার সমস্যা! মাঝে মাঝে বিপুল অরণ্য বাহুবিস্তার করে পথ রুদ্ধ করে দাঁড়ায়। তখন কুঠার নিয়ে বনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। মাঝে মাঝে গিবন-বানরের দল গাছের নীচের ডাল থেকে মগডালে লাফ মেরে কিচিমিচির ভাষায় কী বলে ওঠে এবং কৌতূহলী চোখে নীচের দিকে তাকিয়ে এই নির্জন বনরাজ্যে প্রথম মানুষদের দেখে, আর বোধ করি আশ্চর্য হয়ে ভাবে-'এরা আবার কোন দেশি বানর? এদের ল্যাজ নেই, গায়ে লোম নেই, এরা গায়ে জড়িয়ে থাকে কী কতকগুলো সাদা সাদা জিনিস, দু-পা দিয়ে হাঁটে, এরা আবার কোন দেশি বানর?' মাঝে মাঝে বাঁশ বন দুলে দুলে ওঠে, মড়মড় করে শব্দ হয়, বোঝা যায় হাতির দল ওখানে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছে! মাঝে মাঝে ধারাবাহিক ঝোপঝাপের উপর দিয়ে তীব্র একটা গতির রেখা সশব্দে চলে যায়-একটা চাপা গর্জনও শোনা যায়, বনের মধ্যে অশান্তিকর অনাহূত অতিথি দেখে বাঘ বা অন্য হিংস্র জন্তু দূরে সরে গেল! মাঝে মাঝে মানুষের ঘৃণ্য পায়ের শব্দে ঘাসের ভিতরে গোখরো সাপের ঘুম ভেঙে যায়, ফোঁস করে ফণা তোলে, তীক্ষ্ণ চক্ষে জ্বলন্ত হিংসার স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে পড়ে এবং পরমুহূর্তেই বিদ্যুতের মতো অদৃশ্য হয়। . . . এবং সর্বক্ষণ সারা বনে জেগে থাকে যাদের দেখা যায় না, বোঝা যায় না, তাদের অশ্রান্ত অস্তিত্বের ধ্বনি! কে যেন নিরালায় কানাকানি করছে; কে যেন আড়াল থেকে উঁকি মেরে দেখে ফিসফিস করে কথা বলছে; কে যেন শুকনো পাতা মাড়িয়ে অতি সন্তর্পণে পিছনে আসছে আবার থেমে পড়ছে, আসছে আবার থেমে পড়ছে।

গভীর দূর-বিস্তৃত নানা শব্দময় প্রত্যেক অরণ্যই মানুষের পক্ষে ভয়াবহ! কোনো অরণ্যই আধুনিক নগরবাসী মানুষকে সাদর সম্ভাষণ জানায় না! বনবাসী কোনো জীবই মানুষকে বন্ধু বলে মনে করে না। কল্পনায় নির্জনতাকে মিষ্টি লাগে, কিন্তু অরণ্যের এই সশব্দ নির্জনতা মনকে দেয় দমিয়ে। পদে পদে বিপদের সম্ভাবনায় মানুষ চমকে ওঠে! বোধ হয়, প্রত্যেক শব্দই আসছে লুকানো মৃত্যুর কণ্ঠ থেকে! সমস্ত অরণ্যকেই বিরাট একটা প্রেতাত্মা বলে সন্দেহ হয়। সূর্যালোক তাকে কতকটা বন্ধুর ছদ্মবেশ পরাতে চেষ্টা করে বটে, কিন্তু রাত্রির ঘোর অন্ধকারে মানুষের মন সেখানে ভয়ে কুঁকড়ে পড়ে এবং অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে?-অরণ্যের মতো ভয়ংকর তখন আর কিছুই নেই! কারণ কেবল কানে তখন সন্দেহজনক শব্দ শোনা যায় না, চোখও তখন সভয়ে দেখে কাছে, দূরে, শত শত বিভীষিকাময় আনাগোনা! বিজন অরণ্যে চন্দ্রালোকের চেয়ে অন্ধকার সহনীয়!

আর একটা দুঃস্বপ্নময় রাত্রির পরে এল স্নিগ্ধ শান্ত প্রভাত।

অমলবাবু বললেন, 'আমরা খুব তাড়াতাড়ি চলছি। আজ সন্ধ্যার আগেই ভাঙা মন্দিরের কাছে পৌঁছোতে পারব।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কিন্তু শত্রুদের আর কোনো সাড়াশব্দ নেই।'

মানিক বললে, 'কিন্তু তারা যে আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই আছে, এটা সর্বদাই মনে রাখবেন। আমরা সশস্ত্র আর সাবধান বলেই তারা এখনও সামনে আসছে না। . . . কাল রাত্রেই আমি তাঁবুর বাইরে পায়ের শব্দ শুনেছি। কে যেন পায়চারি করে বেড়াচ্ছিল। বাইরে বেরিয়ে তাকে ধরতে পারলুম না বটে, কিন্তু বেশ দেখলুম, একটা ছায়া ছুটে জঙ্গলের ভিতরে মিলিয়ে গেল!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কী আশ্চর্য, তুমি আমাদের ডাকলে না কেন? এক বেটার আঙুল কাটা গেছে, এ বেটাকে ধরতে পারলে আমি এর নাকটা কচ করে কেটে নিতুম!'

মানিক বললে, 'তার নাক নিয়ে আপনি কী করতেন, সুন্দরবাবু? যদিও আপনার নাকটি খ্যাঁদা, তবু তার নাক টিকোলো হলেও আপনার অভাব তো দূর হত না?'

সুন্দরবাবু খাপ্পা হয়ে বললেন, 'এরকম ঠাট্টা আমি পছন্দ করি না! আমার নাক খ্যাঁদা? কে বললে তোমাকে? আমার নাক খ্যাঁদা নয়!'

সকলে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে একটা মাইল খানেক চওড়া মাঠের উপর এসে পড়ল! কেবল মাঠ নয়, মাঠের একপাশ দিয়ে ঝিরঝির করে বয়ে যাচ্ছে একটি ছোট্ট নদী এবং তার তীরে তীরে চরে বেড়াচ্ছে একঝাঁক পাখি!

সুন্দরবাবু খুশি গলায় বলে উঠলেন, 'বনমুরগি! এসো মানিক, দেখা যাক ভগবান আজ আমাদের বনমুরগির মাংস খাওয়াতে পারেন কি না!'

মানিক মাথা নেড়ে বললে, 'না সুন্দরবাবু! জয়ন্ত মুরগির মাংস খেতে ভালোবাসত! সে যখন নেই, আমার মুখে ও মাংস আজ আর রুচবে না!'

এদিকে মানুষের সাড়া পেয়ে মুরগিগুলো তখনি উড়ে পালাল! সুন্দরবাবু হতাশভাবে সেই উড়ন্ত, জ্যান্ত খাবারগুলোর দিকে তাকিয়ে ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেললেন।

মানিক বললে, 'দেখুন সুন্দরবাবু, আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে!'

-'হুম! সুবুদ্ধি, না কুবুদ্ধি?'

-'আমাদের পক্ষে সুবুদ্ধি। ইচ্ছা করলে এখনি আমরা দেখতে পারি, শত্রুরা আমাদের পিছু পিছু আসছে কি না? সঙ্গেসঙ্গে তাদের কিঞ্চিৎ শিক্ষাও দিতে পারি!'

-'কী করে শুনি?'

-'এই মাঠটা দেখছেন তো? এর মধ্যে গাছপালা কিছুই নেই। এপারে গভীর বন, ওপারেও গভীর বন! আমরা এখনি ওপারের বনে গিয়ে ঢুকব। তারপর না এগিয়ে ঝোপের আড়ালে বন্দুক বাগিয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থাকব।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'খাসা মতলব এঁটেছ ভায়া! শত্রুরা যদি আমাদের পিছনে লেগে থাকে, তাহলে তাদেরও এই মাঠ পার হতে হবে। এখানে লুকোবার যায়গা নেই, তারা এলেই আমরা দেখতে পাব! তারপরেই আমাদের বন্দুকগুলো গুড়ুম রবে গর্জন করে উঠবে,-কেমন, তাই নয় কি?'

-'ঠিক তাই। কিন্তু আমরা তাদের পা লক্ষ করে গুলি ছুড়ব। নইলে নরহত্যার দায়ে পড়তে হবে!'

-'ওসব শত্রুকে হত্যা করলেও পাপ নেই। ওরা তো আমাদের খুন করতেই চায়, আমরাও আত্মরক্ষা করব না কেন? চলো, এখন তোমার কথামতোই কাজ করা যাক!'

সকলে ওপারের বন লক্ষ করে দ্রুতপদে অগ্রসর হল। মাঠ শেষ হয়ে গেল।

মানিক বললে, 'এখানে বেশিরভাগই বাঁশ বন। গোটাকয়েক বট গাছও আছে। এদিকে বেত বন, নীচে সব জায়গা জুড়ে রয়েছে আগাছার জঙ্গল। এর মধ্যে লুকিয়ে থাকলে কেউ আমাদের দেখতে পাবে না। আসুন, গা-ঢাকা দেওয়া যাক! একটু পরেই হয়তো চ্যান আর ইনের খবর পাওয়া যাবে!'

সকলে একে একে ঝোপের ভিতর অদৃশ্য হল।

সবুজ মাঠ ধু-ধু করছে। ওদিককার বনরেখার উপর থেকে এই অভিনব নাট্যলীলার দর্শকরূপে সূর্যদেব রাঙামুখে তাকিয়ে রইলেন, তাঁর সোনা হাসি ওপাশের নদীর লহরে লহরে নেচে নেচে খেলতে লাগল। গানের পাখিরাও নীরব হয়ে ছিল না।

হানা দেবালয়ের জীবন্ত পাথর

মানিকের অনুমানও ব্যর্থ হয়নি, তার ফন্দিও ব্যর্থ হল না!

মিনিট পাঁচেক পরেই দেখা গেল, ওধারের বনের ভিতর থেকে কারা যেন বেরিয়ে আসছে। দূর হতে তাদের দেখাচ্ছে খুব ছোটো ছোটো!

সুন্দরবাবু দূরবিনটা তাড়াতাড়ি চোখে লাগিয়ে সোৎসাহে বললেন, 'এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ! হুম, বেটাদের দলে দশ জন লোক আছে। ওরা হনহন করে এইদিকেই আসছে। হুঁ-হুঁ বাবা, ঘুঘুই দেখেছ ফাঁদ তো দেখনি! চলে আয়-চলে আয়, চই চই চই। ওরে বাপরে! ওটা আবার কে রে! কী লম্বা! কী জোয়ান! যেন ঘটোৎকচের বাচ্ছা! ওর পাশে পাশে আসছে এক বেটা গুড়গুড়ে বেঁটেরাম সর্দার, পায়ে হেঁটে চলছে, না ফুটবলের মতো মাটির উপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে?'

-'কই, দেখি দেখি,' বলে সাগ্রহে অমলবাবু দূরবিনটা সুন্দরবাবুর হাত থেকে প্রায় একরকম কেড়েই নিলেন এবং নিজের চোখে লাগিয়েই বলে উঠলেন, 'ওই তো চ্যান! ওই তো ইন! সাতঘাটের জল ঘেঁটে এতদিন পরে স্বচক্ষে আবার প্রভুদের দেখা পেলুম! ওরে ও পাপিষ্ঠ, ওরে ও পিশাচ! সুরেনবাবু আর জয়ন্তবাবু তোদের হাতেই প্রাণ দিয়েছেন! তোরা গোপীনাথকে খুন করেছিস, আমাকেও বধ করতে এসেছিলি! অ্যাঁ: ! চ্যানের বাঁ-হাতে যে ব্যান্ডেজ বাঁধা! তাহলে পরশু রাতে মানিকবাবুকেও ওরা মারতে এসেছিল! হাতি সিং, বন্দুক ছোড়ো! বন্দুক ছোড়ো! হতভাগাদের পাগলা কুকুরের মতো মেরে ফেলো!'

প্রভুর হুকুম পালন করবার জন্যে হাতি সিং তখনি বন্দুক তুললে, কিন্তু মানিক তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললে, 'বন্দুক নামাও হাতি সিং, আমি যখন বলব তখন ছুড়বে! অমলবাবু, আপনি বড়োই উত্তেজিত হয়েছেন, শান্ত হোন! ওদের আরও কাছে আসতে দিন!'

অমলবাবু চেঁচিয়ে বললেন, 'উত্তেজিত হব না-বলেন কী? যমদূতদের দেখলে কি শান্ত হয়ে থাকা যায়?'

সুন্দরবাবু প্রমাদ গুণে বললেন, 'অমলবাবুই সব পণ্ড করবেন দেখছি। অত চ্যাঁচালে ওরা কি আর কাছে আসবে?'

তখন অমলবাবু লজ্জিত হয়ে বললেন, 'মাপ করুন, আর আমি কথা কইব না!'

ততক্ষণ মাঠের লোকগুলো অনেকটা এগিয়ে এসেছে, তাদের চেহারাও মোটামুটি দেখা যাচ্ছিল। তারা সবাই হয় বর্মি, নয় শ্যামদেশের লোক এবং তাদের ভিতরে সর্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে চ্যানের দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ দেহ! এবং তাকে দেখেই বেশ বোঝা যায় যে, কাটা আঙুলের যন্ত্রণায় তার অবস্থা বিলক্ষণ কাহিল!

মানিক বললে, 'আসুন, এইবারে বন্দুক নিয়ে আমরা প্রস্তুত থাকি। পায়ের দিকে গুলি করে ওদের অকর্মণ্য করতে পারলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে, নরহত্যায় দরকার নেই-কী বলেন সুন্দরবাবু?'

-'বেশ, তাই সই।'

এইবারে শত্রুরা বন্দুকের নাগালের ভিতরে এসে পড়ল।

সুন্দরবাবু বললেন, 'ওরা যে কেন এতক্ষণ দল বেঁধে আমাদের আক্রমণ করেনি, এইবারে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে! ওদের কাছে আছে মোটে একটা বন্দুক!'

মানিক বললে, 'এইবারে আমাদের চারটে বন্দুক গর্জন করতে পারে,-ওদের আর এগুতে দেওয়া উচিত নয়!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'ওয়ান, টু, থ্রি!'

একসঙ্গে চারটে বন্দুক অগ্নি-উদগার করলে,-সঙ্গেসঙ্গে মাঠের উপরে সর্বপ্রথমে ধরাশায়ী হল ইনের বাঁটকুল দেহ! বাকি সকলে মহা ভয়ে আর্তনাদ করে যেদিক থেকে আসছিল আবার সেইদিকে দৌড়োতে আরম্ভ করলে!

এদিক থেকে দ্বিতীয় বার গুলিবৃষ্টি করা হল। এবারে লোকগুলো ছত্রভঙ্গ হয়ে পাগলের মতো মাঠের নানাদিকে ছুটতে লাগল, আর একজন আহত হয়ে মাটির উপরে আছাড় খেয়েও আবার কোনোরকমে উঠে

ভোঁ দৌড় মারলে! কিন্তু দৌড়োতে পারছিল না কেবল ইন, সে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে আর ভয়ে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে কোনোরকমে একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছিল! তার দুর্দশা দেখে চ্যান আবার ফিরে এল এবং একহাতে ইনের দেহকে সে ঠিক শিশুর দেহের মতোই নিজের কাঁধের উপরে তুলে নিয়ে আবার দৌড়োতে আরম্ভ করলে!

অমলবাবু চ্যানকে টিপ করে বন্দুক ছুড়লেন, কিন্তু গুলি তার গায়ে লাগল না।

আরও দু-একবার গুলিবৃষ্টির পর মানিক বললে, 'যথেষ্ট হয়েছে, আর টোটা নষ্ট করে লাভ নেই! ওরা নানাদিকে দৌড় মেরেছে, আবার বনবাদাড় ভেঙে একসঙ্গে মিলতে ওদের অনেকক্ষণ লাগবে। তার পরেও আজ ওরা আমাদের পিছু নিতে সাহস করবে বলে মনে হয় না।'

সুন্দরবাবু মানিকের পিঠ চাপড়ে বললেন, 'হ্যাঁ, বেটারা যত বড়ো গুলিখোরই হোক, আবার গুলি খাবার জন্যে ওরা শীঘ্র ব্যস্ত হবে বলে মনে হচ্ছে না-জয় মানিকের বুদ্ধির জয়!'

পথ চলতে চলতে মানিক জিজ্ঞাসা করলে, 'আচ্ছা অমলবাবু, এই পদ্মরাগ বুদ্ধের কোনো ইতিহাস জানেন!'

অমলবাবু বললেন, 'ঠিক পদ্মরাগ বুদ্ধের ইতিহাস জানি না বটে, তবে ওঙ্কারধামের ইতিহাসে এরই মতো এক মরকত বুদ্ধের কথা শোনা যায়। ওঙ্কারধাম সাম্রাজ্যের রাজধানী যশোধরপুরে এই মরকত বুদ্ধের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।*

'মরকত বুদ্ধ নিয়ে তর্ক চলছে। কেউ বলেন, এখন এই মূর্তি জাপানে আছে। কেউ বলেন, ফর্মোজা দ্বীপে আছে, কেউ বলেন, জাভায় আছে। ওঙ্কারধামের পতন হয়, শ্যামদেশের দ্বারা। ওদেশের লোক বলে, তাদের রাজধানী ব্যাংকক শহরের মন্দিরে যে সবুজাভ পাথরে গড়া বুদ্ধমূর্তি আছে, সেইটিই হচ্ছে প্রবাদ-প্রসিদ্ধ মরকত বুদ্ধ। কেবল মরকত বুদ্ধ নয়, ওঙ্কারধামে নাকি একটি স্বর্ণময় বিরাট শিবলিঙ্গ ছিল। ওঙ্কারধামের বাসিন্দারা থেইস নামে একটি জাতিকে অত্যন্ত ঘৃণা করত। এই থেইসরা বাস করত বর্তমান শ্যামদেশে। এখনও যারা ওখানে বাস করে তারা ওই থেইসদেরই বংশধর। বারংবার পরাজয়ের পর থেইসরা অবশেষে বিশেষ আয়োজন করে ওঙ্কারধামকে হঠাৎ আক্রমণ করে। একটা বড়ো যুদ্ধে তারা জয়ী হয়। জনৈক ভগ্নদূত সেই খবর নিয়ে ফিরে এল। ওঙ্কারধামের সেনাপতি বললেন, তোমার খবর মিথ্যা হলে তোমার প্রাণদণ্ড হবে। আর তোমার খবর সত্য হলেও তোমার প্রাণদণ্ড হবে। কারণ সবাই যখন বীরের মতো যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছে, তখন তুমি কাপুরুষের মতো পালিয়ে এসেছ! ভগ্নদূতের প্রাণদণ্ড হল, কিন্তু ওঙ্কারধাম রক্ষা পেল না। পুরোহিতেরা নগর রক্ষা অসম্ভব দেখে মরকত বুদ্ধ, স্বর্ণ শিবলিঙ্গ, অন্য অন্য মূল্যবান বিগ্রহ আর রাশি রাশি হিরে-মণি-মুক্তা তখনি সরিয়ে ফেলে গুপ্তস্থানে লুকিয়ে রাখলেন। অনেকেরই দৃঢ়বিশ্বাস, বিজয়ী থেইসরা সেসব গুপ্তধন খুঁজে পায়নি। ওঙ্কারধামের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আজও কত লোক সেই গুপ্তধন খুঁজে বেড়ায়! কিন্তু আজও কেউ তার ঠিকানা আবিষ্কার করতে পারেনি! আমাদের এই পদ্মরাগ বুদ্ধ সেই গুপ্তধনেরই অংশবিশেষ কি না, কে তা বলতে পারে?'

বৈকাল অতীত হয়ে গেছে, সূর্যালোক তখন অরণ্যের মাথার উপরে গিয়ে উঠেছে। দিনের আলোয় চতুর্দিক সমুজ্জ্বল বটে, কিন্তু এমন নির্জন ও নিস্তব্ধ যে, রাত্রির স্তব্ধতার সঙ্গে তুলনা করা চলে! আরও মাইল খানেক পথ পেরিয়ে অমলবাবু উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'ওই সেই সপ্ত তাল গাছ!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'সপ্ত তাল গাছ আবার কী?'

-'ওই হচ্ছে আমাদের পথের শেষ নিশানা। পাশাপাশি ওই যে সাতটা তাল গাছ দেখছেন, ওর পরেই সেই ভাঙা মন্দিরের প্রকাণ্ড বাঁধানো চত্বর-অর্থাৎ আমাদের পথের শেষ!'

কিন্তু পথের শেষে এসে মানিকের মনে জয়ন্তের শোক আরও বেশি করে জেগে উঠল। জয়ন্তের জন্যেই এদেশে আসা, পদ্মরাগ বুদ্ধের জন্যে তার আগ্রহ ছিল অফুরন্ত। জয়ন্ত নেই তবু যে সে এখানে এসেছে, এ কেবল বন্ধুর ব্রত উদযাপন করবার জন্যে! সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে, 'যদি তাদের চেষ্টা সফল হয়, তবে

অমলবাবুর হাতে পদ্মরাগ বুদ্ধকে সমর্পণ করে সে সর্বাগ্রে চ্যান আর ইনকে গ্রেপ্তার করবে। যতদিন এই প্রতিজ্ঞা পালন করতে পারবে না, ততদিন সে স্বদেশে ফেরবার কথা মনেও আনবে না।'

তারা সপ্ত তালের তলায় এসে দাঁড়াল। তারপর একটা বাঁশ বনের প্রাচীর পার হয়েই সকলে সবিস্ময়ে দেখলে, তাদের চোখের সামনেই রয়েছে, চারিদিকে প্রায় দুই মাইল বিস্তৃত একটা মাঠ। সেই মাঠের মাঝখানে পাথরে বাঁধানো একটি প্রকাণ্ড চত্বর এবং চত্বরের মাঝখানে একটি পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর এক কোণ দিয়ে যে রাস্তাটি পশ্চিম মুখে চলে গিয়েছে, তারই প্রান্তে দেখা যাচ্ছে মস্ত একটি পাথরের মন্দিরের কতক অংশ! মন্দিরের বাকি অংশ গাছপালার ভিতরে ঢাকা পড়েছে।

সকলে যখন পুকুরপাড়ে গিয়ে দাঁড়াল, সুন্দরবাবু বললেন, 'এইবার পদ্মরাগ বুদ্ধের সঙ্গে দেখা করতে হবে। হুম, বার করো তো মানিক, তোমার সেই সোনার চাকতিখানা!'

মানিক পকেট থেকে চাকতি বার করে সুন্দরবাবুর হাতে দিয়ে বললে, 'আপনিই তাহলে নকশার পাঠোদ্ধার করে আমাদের বাহবা লাভ করুন!'

সুন্দরবাবু অবহেলা ভরে বললেন, 'পুলিশে চাকরি নিয়ে ঢের ঢের হেঁয়ালি জলের মতো পড়ে ফেলেছি, এ তো সামান্য নকশা মাত্র!

'হুম! নকশায় এই তো রয়েছে পুকুরটা, চারিদিকে এই তো চারটে ঘাটের সিঁড়ি! কিন্তু নকশায় পুকুরের পশ্চিম কোণে এই যে তিনকোনা চিহ্নিত জায়গাটা রয়েছে, আসল পুকুরের পশ্চিম কোণে তেমন ধারা কিছুই তো দেখছি না!'

মানিক হাসতে হাসতে বললে, 'ওকী সুন্দরবাবু, এরই মধ্যে মাথা চুলকোচ্ছেন কেন?'

-'মাথা চুলকোচ্ছি কি সাধে? এ নকশাখানা কেউ ঠাট্টা করে আঁকেনি তো?'

-'বোধ হয় না। আচ্ছা, দিনের আলো থাকতে থাকতে আগে মন্দিরের ভেতর চলুন। সেখানে গেলে হয়তো কোনো হদিস পাওয়া যাবে!'

-'ঠিক বলেছ। তাই চলো।'

দিনের আলো তখন নিবুনিবু হবার সময় এসেছে। পাখিরা বিদায়ী গান গাইতে গাইতে বাসার দিকে ফিরতে শুরু করেছে। সূর্যের কিরণ আর দেখা যাচ্ছে না-যদিও অন্ধকারের ঘুম এখনও ভাঙেনি।

মাঝখানে প্রকাণ্ড এক মন্দির, তার উপর দিকটা ভেঙে পড়েছে। দেখলেই বোঝা যায়, সম্পূর্ণ অবস্থায় এ মন্দিরটা অন্তত এক-শো ফুটের কম উঁচু ছিল না। মন্দিরের আগাগোড়া কারুকার্যে আর ছোটো-বড়ো মূর্তিতে ভরা। কিন্তু তার অধিকাংশই ভেঙে বা লুপ্ত হয়ে গিয়েছে মহাকালের নির্দয়তায়। বড়ো মন্দিরের চার পাশে যে চারিটি ছোটো মন্দির ছিল, এখন তাদের সামান্য চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট আছে। এখানে যেদিকেই তাকানো যায়, কেবলই ধ্বংসের লীলা স্তম্ভিত হয়ে আছে মৃত্যু-স্তব্ধতার কোলে। মন নেতিয়ে পড়ে, প্রাণ হা-হা করে, চোখে বিষণ্ণতা জাগে।

সকলে ধীরে ধীরে মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করল। মন্দিরের ভিতরে তখন আলো-আঁধারের খেলা আরম্ভ হয়েছে, সহজে দূরের জিনিস স্পষ্ট চোখে পড়ে না।

চূড়া ভেঙে পড়েছে বলে উপর পানে তাকিয়ে দেখা গেল, পশ্চিমের আরক্ত রাগে রঞ্জিত নীলাকাশকে।

মন্দিরগর্ভ খুব প্রশস্ত, তার মধ্যে বড়ো বড়ো অনেকগুলো, হলঘরের ঠাঁই হতে পারে। ভিতরের চারিকোণে চারিটি মানুষের চেয়েও ডবল বড়ো অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধের দণ্ডায়মান মূর্তি। একটি মূর্তি কতকটা অটুট আছে, বাকি মূর্তি তিনটির কারুর দেহের উপরিভাগ নেই, কারুর পদযুগল নেই, কারুর মুণ্ড নেই। দেওয়ালেও খোদিত ভাস্কর্য কাজ আছে, কিন্তু অস্পষ্ট আলোতে ভালো করে দেখা যায় না।

মন্দিরের পশ্চিম দেওয়ালের সামনে প্রকাণ্ড একটি মূর্তিশূন্য বেদি রয়েছে কালো পাথরে গড়া। সেইদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে অমলবাবু বললেন, 'ওরই উপরে আমরা সেই ছোট্ট বুদ্ধ মূর্তিটি পেয়েছিলুম।'

মানিক একটু আশ্চর্য হয়ে বললে, 'অতটুকু একটি মূর্তির জন্যে এত বড়ো একটা মন্দিরের এত বড়ো কালো পাথরের বেদি গড়া হয়েছিল! সে মূর্তি কখনো এমন মন্দিরের প্রধান দেবতা হতে পারে না!'

অমলবাবু বললেন, 'আমারও সেই সন্দেহ হয়। বিশেষ, মন্দিরের অপ্রধান মূর্তিগুলিই যখন এমন প্রকাণ্ড! আমার বিশ্বাস, বেদির উপর থেকে প্রধান মূর্তিটিকে হয়তো কোনো কারণে সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। পরে পূজার বেদিতে দেবতার অভাব কতকটা দূর করবার জন্যে কোনো ভক্ত এই মূর্তিটিকে স্থাপন করেছিল।'

-'খুব সম্ভব, তাই।'

সুন্দরববাবু এতক্ষণ নির্বাক ও হতভম্বের মতো নকশার সঙ্গে বেদিটি মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা করছিলেন।

অমলবাবু তাঁর অবস্থা দেখে হেসে বললেন, 'কী সুন্দরবাবু নকশা দেখে কিছুই বুঝতে পারছেন না তো? আমিও পারিনি!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম, এ হচ্ছে একখানা বাজে নকশা! কোনো ধাপ্পাবাজের আঁকা! আমরা সবাই হচ্ছি মহা হাঁদা-গঙ্গারাম, একটুকরো হিজিবিজি দেখে যমালয়ের রাস্তায় ছুটে এসেছি! পদ্মরাগ বুদ্ধ! সোনার পাথরবাটি! যা নয় তাই!'

মানিক চাকতিখানা সুন্দরবাবুর হাত থেকে নিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল।

মন্দিরগর্ভে অন্ধকার তখন আলোকের শেষ আভাটুকুও নিবিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল। সেই মহানির্জনতার স্বদেশে, সেই মান্ধাতার আমলের মন্দিরের প্রাচীন স্তব্ধতা যেন ঘনায়মান ও হিংস্র অন্ধকারের মূর্তি ধরে সকলের প্রাণ মনের উপরে চেপে বসতে চাইছিল! উপরদিকে হঠাৎ ঝটপট ঝটপট শব্দ হল-নিরবচ্ছিন্ন নীরবতার মাঝখানে সেই শব্দগুলোকে শোনাল যেন বন্দুকের আওয়াজের মতো! চমকে এবং দোদুল ভুঁড়ি নাচিয়ে লাফিয়ে উঠে সুন্দরবাবু সভয়ে ঊর্ধ্বমুখে দেখলেন, ভাঙা মন্দিরের ফাঁকে তখনও উজ্জ্বল আকাশপটে কালো কালো চলন্ত দাগ কেটে কী কতকগুলো উড়ে গেল।

অমলবাবু বললেন, 'বাদুড়!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'না, অন্ধকারের কালো বাচ্ছা!'

মানিক নিজের মনেই বললে, 'নকশায় বেদির গায়ে সিঁড়ি আঁকা রয়েছে। কিন্তু এখানে কোথায় সিঁড়ি?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'প্রতিধ্বনিও বলবে-কোথায় সিঁড়ি? ও সিঁড়ি-ফিড়ি কিছুই পাওয়া যাবে না, আমাদের কাদা ঘেঁটে মরাই সার হল, জয়ন্ত বেচারা বেঘোরে প্রাণ দিলে, এখান থেকে পালাই চলো মানিক।'

-'পালাব কেন?'

-'এ জায়গাটা ভালো নয়! আমার বুক ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ করছে! হুম, আমার বুক অকারণে ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ করে না, এটা নিশ্চয়ই হানা মন্দির!'

মানিক হেসে উঠল-তার হাস্যধ্বনি মন্দিরের অন্ধকার ভরা কোণে কোণে প্রতিধ্বনি তুললে, শোনাল ঠিক অন্ধকারের হাসির মতো!

সুন্দরবাবু অস্বস্তিপূর্ণকণ্ঠে বললেন, 'তুমি হেসো না মানিক। এমন অস্বাভাবিক স্তব্ধতা তুমি কখনো অনুভব করেছ? এক মাইল দূরে একটা আলপিন পড়লেও যেন শোনা যায়! এ স্তব্ধতা যেন নিরেট, হাত দিয়ে ছোঁয়া যায়! এ স্তব্ধতা যেন ওজনে ভারী-বুকে জাঁতাকলের মতো চেপে বসে! এ যেন স্তব্ধতার মহাসাগর,-আমাদের কথাগুলো যেন মুখ থেকে বেরিয়েই এই স্তব্ধতার অতলে তলিয়ে যাচ্ছে!'

মানিক কোনো কথায় কান না পেতে মন্দিরের বেদির উপরে হাত বুলোতে লাগল। তারপর ফিরে বললে, 'অমলবাবু, এ বেদির গায়ে কখনো যে কোনো সিঁড়ি ছিল, তার চিহ্নটুকুও দেখছি না! অথচ নকশায় সিঁড়ি আঁকা রয়েছে! এর মানে কী?'

-'আমার বোধ হয় এ নকশাখানা অন্য কোনো জায়গার!'

-'অসম্ভব! নকশার সঙ্গে এখানকার বাকি সমস্তই হুবহু মিলে যাচ্ছে! এই সিঁড়ির হয়তো কোনো গুপ্ত অর্থ আছে।'

-'থাকতে পারে। কিন্তু আমরা কেউ তা জানি না। সুতরাং আমাদের পক্ষে ও গুপ্ত অর্থ থাকা-না-থাকা দুই-ই সমান।'

হঠাৎ সুন্দরবাবু আঁতকে বলে উঠলেন, 'মানিক, মানিক! কে যেন এখানে চাপা হাসি হাসছে!'

মানিক বললে, 'কই?'

-'হাসি আবার থেমে গেল!'

-'ও আপনার মনের ভুল। আমি কোনো হাসি শুনিনি।'

-'অমলবাবু, আপনিও শোনেননি?'

-'না। কে আবার হাসবে, এখানে আমরা তিন জন ছাড়া আর কেউ নেই।'

-'হুম, শুনিনি বললেই হল? আমি স্পষ্ট শুনেছি! কে যেন লুকিয়ে লুকিয়ে হাসি চেপে রাখবার চেষ্টা করেও পারলে না!'

-'তাহলে আপনার পিছনে ওই যে বুদ্ধদেব দাঁড়িয়ে আছেন, ওঁকে জাগ্রত বলে মানতে হয়! আপনার ভয় দেখে উনিই হেসে ফেলেছেন!'

সুন্দরবাবু তাড়াতাড়ি দু-পা পিছিয়ে এসে ফিরে তাকালেন।

আসন্ন সন্ধ্যায় আবছায়া মেঘে প্রকাণ্ড অবলোকিতেশ্বর দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর প্রস্তরচক্ষুর প্রশান্ত দৃষ্টি যেন সুন্দরবাবু মুখের পানেই তাকিয়ে আছে এবং তাঁর ওষ্ঠাধর স্নিগ্ধহাস্যে বিকশিত!

সুন্দরবাবু বিস্ফারিত আড়ষ্ট চোখে দেখলেন, আচম্বিতে বুদ্ধমূর্তি জ্যান্ত হয়ে টলমলিয়ে নড়ে উঠল! 'হুম, বাপ!' বলে সুন্দরবাবু সুদীর্ঘ এক লাফ মেরে একেবারে মানিকের ঘাড়ের উপরে এসে পড়লেন!

অমলবাবু উত্তেজিত স্বরে বললেন, 'বুদ্ধদেব নড়ে উঠেছেন মানিক! আমি স্বচক্ষে দেখেছি!'

মানিক বিস্মিতভাবে তাকিয়ে দেখলে, মূর্তি যেমন স্থির ছিল তেমনই রয়েছে! সে ভর্ৎসনার স্বরে বললে, 'আপনারা দু-জনেই পাগল হলেন নাকি?'

সুন্দরবাবু ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'পাগল এখনও হইনি মানিক, কিন্তু পাগল হতে আর বেশি বিলম্বও নেই! পাথরের মূর্তি হাসে, পাথরের মূর্তি নড়ে, এমন ব্যাপার কেউ কখনো দেখেছে?'

মানিক এগিয়ে বুদ্ধমূর্তির গায়ে হাত রেখে বললে, 'এই দেখুন, আমি মূর্তির গায়ে হাত দিয়েছি! একেবারে জড়পাথর, এর মধ্যে কোনো প্রাণ নেই!'

হঠাৎ সেই প্রস্তরমূর্তি একখানা জীবন্ত ও বলিষ্ঠ বাহু বাড়িয়ে সবলে মানিকের হাত চেপে ধরল!

আকস্মিক আতঙ্কে আচ্ছন্ন হয়ে মানিক প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল, 'সুন্দরবাবু! অমলবাবু।'

নূতন বিপদ

যদিও দূর থেকে অন্ধকারে কিছু দেখা গেল না। তবু সাহসী মানিককে অমন ভাবে আর্তনাদ করে উঠতে দেখে সুন্দরবাবু তখনি বুঝে নিলেন যে, ভয়ংকর ভূতুড়ে কোনো ঘটনা ঘটেছে! মানিককে সাহায্য করবেন কী, তিনি নিজেই প্রায় মূর্ছিত হয়ে সেইখানে বসে পড়লেন, পালাবার শক্তি পর্যন্ত রইল না!

অমলবাবুর অবস্থাও তথৈবচ!

মানিক দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজের হাতখান ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করলে, কিন্তু পারলে না! যে-হাতখানা এমন বজ্রমুষ্টিতে তার হাত চেপে ধরেছে তা কিন্তু পাথরের নয়, রক্তমাংসে গড়া মানুষের হাত!

মানিক তাড়াতাড়ি বাঁ-হাতে নিজের কোমরবন্ধ থেকে ধারালো ছুরিখানা বার করে ফেললে!

এবং সঙ্গেসঙ্গে সুপরিচিত স্নিগ্ধ কণ্ঠে শোনা গেল, 'মানিক, ছুরি দিয়ে কি তুমি আমার হাতখানা কেটে ফেলতে চাও?'

বিষম বিস্ময়ে মানিক চেঁচিয়ে উঠল, 'জয়ন্ত!'

-'হ্যাঁ বন্ধু, আমি সেই পুরাতন জয়ন্তই-আপাতত যমালয়ের ফেরতা মানুষ,' বলতে বলতে বুদ্ধমূর্তির পিছন থেকে স্বশরীরে সকলের চোখের সামনে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল হাস্যমুখে জয়ন্ত!

অমলবাবু একেবারে থ হয়ে গেলেন। এ যে জয়ন্তের প্রেতাত্মা সে সম্বন্ধে সুন্দরবাবুর কোনোই সন্দেহ রইল না! তিনি প্রায় কাঁদো-কাঁদো মুখে দুই হাতে নিজের চোখ ঢেকে ফেললেন, কারণ তাঁর পক্ষে এমন স্বচক্ষে প্রেতদর্শন অসম্ভব!

মানিক বিস্ময়ে, আনন্দে ও উচ্ছ্বাসে প্রায় অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, 'জয়! জয়! তুমি বেঁচে আছ!'

-'এক ভালো গনতকার হাত দেখে বলেছিল, আমার পরমায়ু আশি বৎসর। অসময়ে মরিনি বলে বিস্মিত হচ্ছ কেন ভাই!'

-'কিন্তু তোমার সেই গুলিতে ছ্যাঁদা টুপি, জমির উপরে দু-জায়গায় রক্তের দাগ, তোমার অন্তর্ধান,-এসবের অর্থ কী!'

-'মানিক, এতদিন আমার সঙ্গে থেকেও তোমার পর্যবেক্ষণ শক্তি যে বাড়ল না, এ বড়ো দুর্ভাগ্যের কথা! জমির উপরে রক্তের দাগ আর ছ্যাঁদা টুপি দেখেই হাল ছেড়ে দেওয়া তোমার উচিত হয়নি। তুমি আমার পায়ের মাপ জানো! যেখানে আমার টুপিটা পড়ে ছিল, সেখানে তুমি যদি আমার পদচিহ্ন পরীক্ষা করতে, তাহলে স্পষ্ট দেখতে যে আমি দু-পায়ে হেঁটে পাশের জঙ্গলের ভিতর গিয়ে ঢুকেছি! আর, যেখানে অনেকটা রক্ত ছিল, সেখানটা খুঁজলে তুমি আমার পায়ের দাগ দেখতেই পেতে না, কারণ সেখানে আমি একবারও যাইনি!'

-'তবে!'

-'আমি যখন বাংলোর দিকে ফিরছিলুম, তখন শত্রুরা অতর্কিতে আমাকে আক্রমণ করে। প্রথমেই বন্দুক ছুড়ে আমি তাদের এক জনকে মাটিতে পেড়ে ফেলি বটে, কিন্তু পর মুহূর্তেই তাদের বন্দুকের একটা গুলি আমার টুপি ভেদ করে মাথার খানিকটা ছাল তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল। আমি তৎক্ষণাৎ আত্মরক্ষার জন্য মাটিতে আছড়ে পড়ে চির-পুরাতন কৌশল অবলম্বন-অর্থাৎ মৃত্যুর ভান করলুম। তারপর দশ-এগারো জন লোক আমার কাছে ছুটে এল! আমার জামা হাতড়ে সেলাই করা পকেট কেটে সোনার চাকতিখানা বার করে নিলে। এমন সময় তোমাদের পায়ের শব্দ পেয়ে তারা তাদের মৃত বা আহত সঙ্গীকে মাটি থেকে তুলে নিয়ে পালিয়ে গেল। আমিও উঠে জঙ্গলের ভিতরে অদৃশ্য হলুম।'

-'কেন?'

-'আমি জানতুম, তোমরা এই মন্দিরের দিকে আসবেই, আর শত্রুরা তোমাদের পিছু নেবে-কারণ চাবি তারা পায়নি। স্থির করলুম, আমিও লুকিয়ে তাদের উপরে পাহারা দেব, যাতে তারা তোমাদের অনিষ্ট করতে না পারে। তারা জানে আমি বেঁচে নেই সুতরাং আমি যে তাদের পিছু নিয়েছি, এ সন্দেহ তারা করবে না। তোমাদের সঙ্গে থাকলে আমার এ সুবিধা হত না, আমিও জানতে পারতুম না যে, রাত-আঁধারে বন-বাদাড়ে বিপদ আসবে কোন দিক থেকে!'

-'এতক্ষণে বুঝলুম, চ্যানের হাত থেকে কে আমাকে বাঁচিয়েছে!'

-'হ্যাঁ, ওঙ্কারধামে চ্যান যখন তোমার গলা টিপে ধরে, আমি ছুটে গিয়ে বন্দুকের কুঁদোর বাড়ি তার মাথায় মারি। সে তখন ছোরা বার করে আমাকে আক্রমণ করতে আসে। আমি যুযুৎসুর এক প্যাঁচ কষতেই সে জমি আশ্রয় করলে-আর পড়বার সময়ে চ্যানের নিজেরই ধারালো ছোরায় তার বাঁ-হাতের একটা আঙুল গেল উড়ে। সেই সময়েই তার কাছ থেকে সোনার চাকতিখানা আমি আবার কেড়েনি। চ্যান বেগতিক দেখে চম্পট দেয়। সোনার চাকতি তোমাদের দরকার হবে বুঝে সেখানা তোমার বুকের উপর রেখে আমিও অদৃশ্য হই! আমি জানতুম, তোমাদের দলের কেউ-না-কেউ সেখানে দেখতে পাবেই!'

-'কিন্তু জয়ন্ত, তুমি কি অনাহারে আছ?'

-'মোটেই না। এখানকার নদী জলহীন আর গাছ ফলহীন নয়! . . . হ্যাঁ, ভালো কথা! এইবার আমার একটা জিজ্ঞাসা আছে। সেই মাঠে শত্রুদের গতিরোধ করবার বুদ্ধি তোমাদের কার মাথায় প্রথমে আসে?'

-'প্রস্তাব করেছিলুম আমি, সমর্থন করেছিলেন সুন্দরবাবু।'

-'বাহবা, চমৎকার! মানিক তুমি যে চাল চেলেছ, তা অতুলনীয়! এই এক চালেই তোমরা নিরাপদ হয়েছ। আমিও তারপরেই তোমাদের চেয়েও দ্রুতপদে এগিয়ে এই মন্দিরে এসে গা-ঢাকা দিয়েছিলুম।'

সুন্দরবাবু অপ্রসন্ন মুখে বললেন, 'হুম, বেশ করেছিলে! কিন্তু আমাদের ভয় দেখাচ্ছিলে কেন?'

-'মোটেই ভয় দেখাইনি। আপনার ছেলেমানুষি ভয় দেখে আমি হাসি চাপতে গিয়েও পারলুম না, আর তাই শুনেই আপনি একেবারে খেপে গেলেন।'

-'খামোকা খেপিনি। পাথরের বুদ্ধ জ্যান্ত হলে কে না-'

-'মূর্তিটাই নড়বড়ে। কতকালের পুরোনো ভাঙা মূর্তি, হাত দিলেই নড়ে। বিশ্বাস না হয়, আপনিও একবার হাত দিয়ে ঠেলে দেখুন না!'

-'না, আমি হাত দিয়ে ঠেলে দেখতে চাই না, আমি এখান থেকে পালাতে চাই!'

-'সেকী, এখনি পালাবেন কোথায়? এখনও যে পদ্মরাগ বুদ্ধ লাভ হয়নি!'

-'হেঃ, সে লাভের আশায় গয়া! সে নকশার কোনো মানে হয় না! এখন লাভে ব্যাং অপচয়ে ঠ্যাং করেই আমাদের মুখ শুকিয়ে ঘরপানে ফিরতে হবে!'

-'সুন্দরবাবু, নকশার মানে আমি বুঝেছি বলেই কলকাতা থেকে এত দূরে ছুটে এসেছি!'

অমলবাবু সবিস্ময়ে বললেন, 'নকশার মানে বুঝেই আপনি এখানে এসেছেন?'

-'হ্যাঁ অমলবাবু! কলকাতাতেই যখন আমি আপনার মুখে শুনলুম যে, নকশায় সিঁড়ি আছে অথচ বেদির গা বেয়ে কোনো সিঁড়ি আপনি দেখেননি, তখনি তার অর্থ বোঝবার চেষ্টা করেছিলুম! এখন দেখা যাক, আমার আন্দাজ ঠিক কি না! . . . (উচ্চস্বরে) ওহে হাতি সিং তোমার লোকজন নিয়ে মন্দিরের ভিতরে এসো! বড়ো অন্ধকার, আগে আলোগুলো জ্বালো!'

হাতি সিং সদলবলে বাহির থেকে ভিতরে এল। চারটে পেট্রলের লণ্ঠন জ্বালা হল। এই প্রাচীন মন্দির হয়তো রাত্রে কখনো এত উজ্জ্বল আলো দেখবার সৌভাগ্যলাভ করেনি!

সুন্দরবাবু হাঁপ ছেড়ে বললেন, 'অঃ আলো দেখে ধড়ে প্রাণ এল! এখন দেখছি বাইরেই অন্ধকার! হুম, আমি আর বাইরে পা বাড়াচ্ছি না!'

জয়ন্ত বললে, 'বেদিটা এখানে এসেই আমি দেখে নিয়েছি। মানিক, তুমি যদি বন্দুকের কুঁদো দিয়ে ঘা মেরে পরীক্ষা করতে, তাহলে বেদিটা যে ফাঁপা, এটা বুঝতে তোমার কোনোই কষ্ট হত না! . . . হাতি সিং! তোমার লোকজনদের কুড়ুল নিয়ে এই বেদিটা ভেঙে ফেলতে বলো!'

হাতি সিং-এর অনুচরেরা তখনি বেদি ধ্বংসে প্রবৃত্ত হল-অন্য সকলে বিপুল কৌতূহলে আগ্রহদীপ্ত চক্ষে তাদের কাণ্ড দেখতে লাগল।

জয়ন্ত বললে, 'পাথরের বেদি যখন ফাঁপা, তখন ভিতরে নিশ্চয়ই কোনো রহস্য আছে!'

ঠং ঠঙা ঠং, ঠং ঠঙা ঠং-কুড়ুলের পর কুড়ুলের ঘা, অতি নিস্তব্ধ মন্দির ঘন ঘন শব্দে পরিপূর্ণ হয়ে যেন গমগম করে উঠল! শব্দের চোটে সেই নড়বড়ে বুদ্ধমূর্তি আবার কাঁপতে শুরু করেছে দেখে সুন্দরবাবুর গায়ে কাঁটা দিলে!

বেদিটা গাঁথা ছিল কয়েকখানা বড়ো বড়ো পাথর দিয়ে। এক-একখানা পাথর সরানো হয় আর বেদির ফাঁকা, কিন্তু অন্ধকার-ভরা গর্ভ ক্রমেই বড়ো হয়ে উঠছে!

জয়ন্ত বললে, 'ব্যাস, আর পাথর সরাতে হবে না! হাতি সিং, একটা লণ্ঠন উঁচু করে তুলে ধরো তো!'

হাতি সিং ভাঙা বেদির গর্তের উপরে একটা হাজার-বাতি লণ্ঠন তুলে ধরলে!

উঁকি মেরে দেখা গেল, গর্তের ভিতর দিয়ে একসার পাথরের সিঁড়ি নীচের দিকে সোজা নেমে গিয়েছে!

জয়ন্ত উৎফুল্ল কণ্ঠে বললে, 'এখন বুঝতে পারছ তো মানিক, যে রহস্য চোখে দেখা যায় না, সোনার চাকতির নকশা তাই এঁকে রেখেছে? আমি গোড়াতেই এটা বুঝতে পেরেছিলুম। নকশা যদি বাজে হত, তাহলে অত সাবধানে, অত গোপনে, অত যত্ন করে বুদ্ধমূর্তির মধ্যে রক্ষা করা হত না! পদ্মরাগ বুদ্ধকে যদি প্রণাম করতে চাও, তাহলে আমার সঙ্গে এই সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামবে চলো!'

অমলবাবু অভিভূত কণ্ঠে বললেন, 'জয়ন্তবাবু, আশ্চর্য আপনার বুদ্ধি!'

জয়ন্ত বললে, 'বুদ্ধি হচ্ছে স্বাভাবিক, তা আশ্চর্য নয়। সব মানুষ যে তা ব্যবহার করতে পারে না, এইটেই হচ্ছে আশ্চর্য!'

সুন্দরবাবু খুঁতখুঁত করতে করতে বললেন, 'তাইতো, এ যে আবার নূতন বিপদ দেখছি! ওই পাতালের ভিতরে ঢুকলে আবার বেরুতে পারব তো? ওখানে কোন ভয়ংকর ওঁত পেতে আছে, কে তা জানে!'

মানিক বললে, 'তাহলে আমরা নীচে নামি, আপনি এইখানে বসে বিশ্রাম করুন।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'একলা? বাপরে, তাও কি হয়! পড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে! আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকব-যা থাকে কপালে। হুম!'

জয়ন্ত বললে, 'আমাদের সঙ্গে আটটা পেট্রলের লণ্ঠন আছে। সবগুলোই জ্বেলে ফেলো। পাতালের অন্ধকারে যত আলো তত ভালো।'

সামনে, মাঝখানে, পিছনে প্রদীপ্ত লণ্ঠন নিয়ে সকলে একে একে সেই নিম্নগামী সোপানশ্রেণি দিয়ে নামতে লাগল। পরে পরে কুড়িটি ধাপ নেমে সিঁড়ি শেষ হল। তারপর দেখা গেল, একটি সমতল পথ সোজা এগিয়ে দূরের অন্ধকারের ভিতরে হারিয়ে গিয়েছে। পথটাও পাথরে বাঁধানো এবং নিতান্ত অপ্রশস্ত নয়, তিন জন লোক পাশাপাশি চলতে পারে!

গুহাপথের সেই যুগে যুগে সঞ্চিত নিবিড় তিমির সহসা আজ আলোকের আঘাতে যেন মৌন চিৎকারে আর্তনাদ করে পায়ে পায়ে দূরে সরে যেতে লাগল, সভয়ে! সেখানকার বহুকালব্যাপী নিদ্রিত স্তব্ধতাও আজ এতগুলো আধুনিক জুতার খট খট শব্দে যেন অত্যন্ত যাতনায় ধড়ফড় করতে করতে মরে গেল!

সুন্দরবাবু সংকুচিত সন্দেহে গুহাপথের বদ্ধ হাওয়া সশব্দে শুঁকতে শুঁকতে বললেন, 'হুম! আলিপুরের চিড়িয়াখানায় গিয়ে যে গন্ধ পাই, এখানেও আমি যেন সেইরকম দুর্গন্ধই পাচ্ছি।'

অমলবাবু বললেন, 'এ গুহাপথ কতকাল বন্ধ আছে তা কে জানে! হয়তো আপনি বিষাক্ত বাষ্পের গন্ধ পাচ্ছেন!'

-'উহু, এ বাষ্প-টাষ্পর গন্ধ নয়!'

মানিক বললে, 'তাহলে এটা বোধ হয় ভূতের গায়ের দুর্গন্ধ!'

সুন্দরবাবু চটে বললেন, 'ঠাট্টা কোরো না মানিক, ওরকম ঠাট্টা আমি পছন্দ করি না! হুম! এখানে যে ভূত নেই তা কী করে জানলে? ভূতের পক্ষে এটা হচ্ছে অতি মনোরম স্থান! আলো নেই, হাওয়া নেই, শব্দ নেই, এখানে থাকবে না তো ভূত কোথায় থাকবে?'

মানিক আবার টিপ্পনি কাটলে, 'কেন আপনার মাথার ভিতরে! আপনার মাথাটি হচ্ছে ভূতের স্বদেশ! ওখানে নিত্যনূতন ভূতের জন্ম হয়!'

জয়ন্ত সর্বাগ্রে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে পড়ে গম্ভীর স্বরে বললে, 'সাবধান! আর কেউ এগিয়ো না!'

প্রত্যেকেই সচমকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, কেবল সুন্দরবাবু পায় পায় পিছু হটতে লাগলেন এবং একেবারে সকলের পিছনে না গিয়ে আর থামলেন না!

মানিক বললে, 'কী ব্যাপার, জয়?'

-'কীরকম একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে!'

মানিক কান পেতে শুনতে লাগল। হ্যাঁ, একটা অদ্ভুত শব্দ শোনা যাচ্ছে বটে! কেবল অদ্ভুত নয়, ভয়াবহ!

-'ও কীসের শব্দ, জয়?'

-'ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না! পাথরের উপর দিয়ে কারা যেন অনেকগুলো বস্তা টেনে নিয়ে যাচ্ছে! . . . না, যাচ্ছে নয়, টানতে টানতে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে!'

সুন্দরবাবু মাথার ঘাম মুছতে মুছতে কাতরভাবে মনে মনে বললেন, 'হা ভগবান! এই ডানপিটে ছোঁড়াগুলোর সঙ্গে এদেশে এসে কী ভুলই করেছি! আর কি দেশে ফিরতে পারব? হুম!'

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি

একটা অজ্ঞাত, অপার্থিব বিপদের আশঙ্কায় সকলের হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল!

এতকালের বদ্ধ আলোহারা বায়ুহারা সুড়ঙ্গপথ, সমাধির চেয়েও যা সুরক্ষিত ও সুদুর্গম, তার মধ্যে বস্তা টেনে শব্দের সৃষ্টি করছে কে বা কারা? আর এদিকেই বা এগিয়ে আসছে কেন? যার মধ্যে জীবন্ত জীবের আবির্ভাব অসম্ভব, সেখানে এ কী অভাবিত ব্যাপার?

জয়ন্ত চুপিচুপি বললে, 'মানিক, ব্যাপার বড়ো সুবিধার নয়, বন্দুক তৈরি রাখো!' সুড়ঙ্গপথের ভিতরে তার চুপিচুপি কথাই শোনাল চিৎকারের মতো!

সুন্দরবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, বন্দুকই তৈরি রাখবে বটে! এই পাতালপুরে কোন কুম্ভকর্ণের বেটা কত শত বৎসর ধরে ঘুমিয়ে ছিল, মজার মজার স্বপ্ন দেখে আরাম করছিল, এখন অসময়ে এখানে অনধিকার প্রবেশ করে আমরা তার ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম! বন্দুক ছুড়ে করবে কী? বন্দুকের গুলিও তো হজমি গুলির মতো কপ কপ করে গিলে ফেলবে!'

জয়ন্ত ও মানিক কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল!

বস্তা টানার মতো শব্দ ক্রমেই বেড়ে উঠেছে! সেই সঙ্গে আরও একটা বেয়াড়া আওয়াজ শোনা যেতে লাগল। কে যেন মাটির উপরে দুম দুম করে খুব ভারী ভারী জিনিস আছড়ে ফেলছে অত্যন্ত অধীর ভাবে!

জয়ন্ত এসব শব্দের হদিস খুঁজে পেলে না! এ যেন কার আস্ফালনের শব্দ!

অমলবাবু রুদ্ধশ্বাসে বললেন, 'জয়ন্তবাবু, সেকালে গুপ্তধন রক্ষা করবার জন্যে যক রাখা হতে বলে প্রবাদ শুনেছি! তা কি তবে সত্য? যে আসছে সে কি যক?'

জয়ন্ত বললে, 'পদ্মরাগ বুদ্ধ হচ্ছেন অহিংসার দেবতা! এখানে যক রাখা মানে একটি জীবের প্রাণবধ করা। কোনো বৌদ্ধ পুরোহিত সে মহাপাপ করতে পারেন না। যকের কথা সত্য কি না জানি না,-সত্য না হওয়াই সম্ভব, তবে সত্য হলেও এখানে যক কেউ রাখেনি।'

-'তবে ও কে আসছে?'

-'ভগবান জানেন!'

এইবার ভীষণ একটা গর্জন শোনা গেল! বদ্ধ সুড়ঙ্গের আবহাওয়ায় বিকৃত হয়ে সেই ভয়াবহ ধ্বনি এমন অদ্ভুত শোনাল যে, সেটা কীসের গর্জন কিছুই বোঝা গেল না।

সুন্দরবাবু হাল ছেড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'হুম ক্রমাগত চমকে চমকে আজ মারা পড়ব নাকি? আমার আর সহ্য হচ্ছে না-চললুম আমি উপরে! এর চেয়ে ওপরের অন্ধকারে বসে ভয় পাওয়া ভালো, বনের বাঘ-ভাল্লুকের পেটে যাওয়া ভালো!' তিনি সুড়ঙ্গমুখের দিকে চোঁচা দৌড় মারলেন।

সুড়ঙ্গপথের অনেক দূরে, যেখানকার নিরেট অন্ধকারের গায়ে ঠেকে লণ্ঠনের আলো ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে, সেইখানে ফুটে উঠল বিদ্যুৎখণ্ডের মতো দুটো জ্বলন্ত চক্ষু! সে বিচিত্র চোখ নিষ্পলক, তার আগুন একবারও নিবছে না!

জয়ন্ত বললে, 'আজ আর গোঁয়ারতুমি করা নয়! মানিক আজ আমাদের ফিরতেই হবে-এখনও সময় আছে! সকলে মিলে পরামর্শ করে কাল সকালে আবার ফিরে আসা যাবে! চলো, আমরা বাইরে যাই!'

-'কিন্তু ওসব কীসের শব্দ, ও কার গর্জন ও কার চোখ কিছুই তো বোঝা গেল না!'

-'বুঝতে গেলে প্রাণ দিতে হয়! শিগগির উপরে চলো!'

সকলে দ্রুতপদে উপরে উঠে দেখলে, ভাঙা বেদির গায়ে হেলান দিয়ে মড়ার মতো হলদে মুখে সুন্দরবাবু চুপ করে বসে আছেন।

মানিক বললে, 'সুন্দরবাবু, আজ আপনারই জয়জয়কার! পলায়নে আপনি হয়েছেন আমাদের পথপ্রদর্শক।'

সুন্দরবাবু তখন উত্তর দেবারও শক্তি ছিল না।

জয়ন্ত বললে, 'আমাদের এখানে থাকাও নিরাপদ নয়। সুড়ঙ্গের মুখ খোলা, দপদপে চোখ দিয়ে যে আমাদের দেখেছে সে এখানেও খুঁজতে আসতে পারে! চলো, আমরা মন্দিরের পিছনে বনের ভিতরে যাই। আজকের রাতটা গাছের উপরে উঠেই কাটাতে হবে!'

অমলবাবু বললেন, 'তার চেয়ে পাথরগুলো আবার যথাস্থানে রেখে গর্ত আবার বন্ধ করে দিলে কি হয় না?'

-'না। পাথর তো এখন আর গেঁথে দেওয়া সম্ভব নয়! সুড়ঙ্গে যার সাড়া পেয়েছি তার আকার নিশ্চয়ই অসাধারণ! ওই আলগা পাথরগুলো তার এক ধাক্কায় হুড়মুড় করে ঠিকরে পড়বে!'

সুন্দরবাবু এতক্ষণে ভাষা পেয়ে বললেন, 'জয়ন্তের প্রস্তাবই যুক্তিসংগত। পথ খোলা পেলে ও দানবটা হয়তো গর্ত ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে যেতেও পারে!'

জয়ন্ত বললেন, 'ভগবান করুন, আপনার অনুমানই যেন সত্য হয়! ও পাপ বিদেয় হলে তো সব ল্যাঠা চুকে যায়!'

সুড়ঙ্গের গর্ভ ভেদ করে আবার একটা বুকের-রক্ত-ঠান্ডা-করা গভীর গর্জন বাইরে ছুটে এল!

সে গর্জনের সঙ্গে জড়ানো রয়েছে যেন বিষম ক্রোধ ও বিপুল ক্ষুধার ভাব! যেন আসন্ন মৃত্যুর গর্জন, শুনলেই বুকের ভিতরে জীবনের স্পন্দন স্তম্ভিত হয়ে যায়!

জয়ন্ত সচকিত কণ্ঠে বললে, 'সে আসছে, সে আসছে! তোলো সব তল্পিতল্পা, ছোটো বনের দিকে!'

রাত তখন বেশি নয়, কিন্তু এরই মধ্যে বনবাসিনী নিশীথিনীর নিদুটিমন্ত্রে চতুর্দিকের নির্জনতা যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। আকাশে চাঁদ নেই, অন্ধকারের সাম্রাজ্য আজ অপ্রতিহত। বাতাস যেন কাঁদতে কাঁদতে বয়ে আনছে দূর বনের আর্তধ্বনি।

মন্দিরের পিছনে একটি ছোটো মাঠ। তারপর আবার অরণ্য।

সেইদিকে এগুতে এগুতে জয়ন্ত বললে, 'মানিক, ভাগ্যিস বুদ্ধি করে সঙ্গে বিষাক্ত বাষ্পের বোমা এনেছিলুম!'

-'কেন বলো দেখি?'

-'কাল সকালে সুড়ঙ্গের মধ্যেই বোমা ছুড়ে দেখব কোনো ফল হয় কি না।'

-'যদি ফল না হয়? যদি ওটা কোনো জীব না হয়?'

-'মানে?'

-'ওঠা কোনো ভৌতিক কাণ্ড হওয়া কি অসম্ভব?'

-'মানিক, শেষটা তুমিও কি সুন্দরবাবুর দলে ভিড়তে চাও?'

-'ওই সুড়ঙ্গের মধ্যে পৃথিবীর কোনো জীব বাঁচতে পারে?'

-'না পারাই স্বাভাবিক। কিন্তু ও যে পেরেছে, হয়তো তারও এমন কোনো স্বাভাবিক কারণ আছে, যা আমাদের অজানা। ভূতের কথা মনেও এনো না মানিক! ভূতের গল্প পড়তে ভালো লাগে, কারণ অসম্ভবের দিকে মানুষের টান থাকে। কিন্তু ভূত নেই।'

বোধ হয় তখন শেষ-রাত। আকাশে চাঁদের আভাস জেগেছে মাত্র। গাছের উপরে সকলে বসেছিল অর্ধনিদ্রিত ও অর্ধজাগ্রত অবস্থায় কিন্তু তা সত্ত্বেও সুন্দরবাবু নাসিকা রাত্রির স্তব্ধতা দূর করবার জন্যে কম চেষ্টা করছিল না। এমনকী মানিকের মত হচ্ছে, তাঁর নাকের ডাকাডাকিতে ভয় পেয়ে সে গাছের সব পাখি

ও বানর তো দূরের কথা, এমনকী ভূত-পেতনিরাও নাকি অন্য গাছের সন্ধানে পালিয়ে গিয়ে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে!

আচম্বিতে উপর-উপরি দু-দু-বার বন্দুকের শব্দে সকলের তন্দ্রা গেল ছুটে!

সুন্দরবাবু বেজায় চমকে বিনা বাক্যব্যয়ে ঝুপ করে ডাল থেকে পড়ে গেলেন। কিন্তু তিনি বিলক্ষণ হুঁশিয়ার ব্যক্তি বলে ধরাতলে অবতীর্ণ হবার আগেই খপ করে আর একটা ডাল ধরে ফেলে শূন্যে দুলতে ও ঝুলতে লাগলেন।

রাতের মর্ম ভেদ করে নানা কণ্ঠের চিৎকার ও আর্তনাদ দূর থেকে ভেসে এল! কারা যেন ভয়ানক আতঙ্কে চিৎকার করছে এবং দারুণ যাতনায় কাঁদছে।

-'জয়! জয়!'

-'কী মানিক?'

-'শুনেছ?'

-'হুঁ!'

-'আমাদের এখন কী করা উচিত?'

-'চুপ করে এইখানে বসে থাকা উচিত। এ অরণ্য এখন মৃত্যুর রাজ্য, নীচে নামলেই মরব।'

-'কিন্তু ও কীসের গোলমাল?'

-'কাল সকালে বুঝতে পারব। এখন আর কথা কয়ো না। কথা কইলেই হয়তো বিপদকে ডেকে আনা হবে।'

নীচের ডাল থেকে করুণস্বরে শোনা গেল, 'হুম! কিন্তু আমাকে যে কথা কইতেই হবে! গাছের ডাল ধরে আমি ঝুলছি। তোমরা সাহায্য না করলে আমি আর বেশিক্ষণ পারব না!'

অমলবাবুর সঙ্গে মানিক কোনোরকমে ডাল বেয়ে সুন্দরবাবুর কাছে-অর্থাৎ মাথার উপরে গিয়ে হাজির হল! মানিক বললে, 'বৈজ্ঞানিকের মতে, আমাদের পূর্বপুরুষরা গাছের ডাল ধরে ঝুলতে পারতেন। সে অভ্যাস ভুলে গিয়ে আপনি ভালো করেননি সুন্দরবাবু!'

ডাল ধরে ঝুলতে ঝুলতে সুন্দরবাবু বললেন, 'মানিক, তোমার ঠাট্টা শুনলে অঙ্গ জ্বলে যায়! নাও, এখন আমাকে টেনে তুলবে, না বচন শোনাবে?'

উপর থেকে জয়ন্তের বিরক্ত ও গম্ভীর স্বর শোনা গেল, 'ফের কথা কয়!'

দূরের কোনো গোলমাল আর শোনা যায় না। শব্দগুলো যেন স্তব্ধতা সাগরের মধ্যেই কয়েক খণ্ড ইষ্টকের মতো পড়েই ডুবে কোথায় তলিয়ে গেল! এখন শুধু কালো রাত করছে থমথম, মুখর ঝিল্লি করছে ঝিমঝিম, বনের গাছ করছে মরমর! এবং ম্লান খণ্ড চাঁদ নিবুনিবু চোখে করছে উষার কোলে মৃত্যুর অপেক্ষা! . . .

গাছে গাছে পাখির দল বনভূমির সবুজ জগতে দিকে দিকে উচ্ছ্বসিত আনন্দে রটিয়ে দিলে-জাগো লতাপাতা, জাগো ফলফুল, জাগো অলি-প্রজাপতি! পূর্বের শোভাযাত্রায় দিবারানির সোনার মুকুট দেখা দিয়েছে! জাগো সবাই!

সকালের প্রথম আলো কী শান্তিময়! সকালের নতুন বাতাস কী মিষ্টি! এই পৃথিবীতে কখনো যে কালো-কুৎসিত ভয়ময় রাত ছিল, তার কথা যেন মনেও পড়ে না!

সকলে একে একে গাছ ছেড়ে আবার মাটি-মায়ের কোল পেয়ে আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলে।

সুন্দরবাবু বললেন, 'আগে স্টোভে চড়িয়ে দাও চায়ের কেটলি! কী জানি বাবা, যে জায়গায় যাচ্ছি, জীবনে হয়তো আর চা খেতে হবে না! ওহে, এয়ারটাইট টিনে তোমরা রসগোল্লা আর সন্দেশ এনেছিলে না? হুম, ক্ষমা-ঘৃণা করে গোটা দশ-বারো আমার দিকে ছুড়ে মেরো!'

জয়ন্ত বললে, 'ঠিক কথা, আমি সুন্দরবাবুকে সমর্থন করি। ভালো ব্রেকফাস্ট মানুষের সাহস আর শক্তিকে দু-গুণ করে তোলে! মানিক, নিয়ে এসো রসগোল্লা-সন্দেশের টিন!'

জয়ন্তের কাঁধে হাত রেখে সুন্দরবাবু বললেন, 'জয়ন্ত ভায়া, এইজন্যেই তো তোমার সঙ্গে আমার বেশি ভাব! খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে তোমার মতো মনের মানুষ দুর্লভ!' . . .

প্রাতরাশ শেষ করে সকলে আবার ভাঙা মন্দিরের দিকে অগ্রসর হল, সুন্দরবাবু আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে বার কয়েক 'দুর্গা দুর্গা' বলে চেঁচিয়ে নিলেন!

মানিক বললে, 'সুন্দরবাবু, শ্রীদুর্গার কান দু-টি কালা নয়, অমন বিকটস্বরে না চ্যাঁচালেও তিনি শুনতে পাবেন!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'এই! ঠাট্টা শুরু হল তো? আচ্ছা মানিক, তুমি আমার পিছনে এত লাগো কেন বলো দেখি?'

মানিক মুচকি হেসে বললে, 'আপনাকে বেশি ভালোবাসি কিনা!'

জয়ন্ত তার প্রিয় বাঁশের বাঁশিটি বার করেছে এবং ভৈরবী রাগিনীর লীলায় প্রভাতকে আরও সুন্দর করে তুলে মাঠের উপর দিয়ে সবার আগে এগিয়ে চলেছে!

মাঠে ফুটেছে অজস্র ঘাসের ফুল-কেউ সাদা, কেউ হলদে। আশেপাশে ঘুরে ফিরে ডানা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে খুব ছোটো জাতের একরকম প্রজাপতি। মাঝে মাঝে তাদের কাছে বাহাদুরি নেবার মতলবে গঙ্গাফড়িং হাই জাম্পের নানান কায়দা দেখাচ্ছে!

মাঠ পার হয়ে বাঁশি বাজাতে বাজাতে জয়ন্ত মন্দিরের দরজার উপরে উঠল। বাঁশিতে বাজছিল তখন কোনো গানের অন্তরা, কিন্তু হঠাৎ তার সুর বোবা হয়ে গেল একেবারে!

মানিক দূর থেকেই লক্ষ করলে, জয়ন্ত বাঁশিটি তাড়াতাড়ি পকেটে পুরে, পিঠে বাঁধা বন্দুকটা নামিয়ে নিলে! দেখেই সে ঝড়ের বেগে ছুটল!

সুন্দরবাবু বুঝলেন, আবার কোনো অঘটন ঘটেছে! একটা দুঃখের নিশ্বাস ফেলে সঙ্গীদের দিকে ফিরে বললেন, 'তোমরাও ছুটে এসো!' -বলেই তিনি দৌড়োতে লাগলেন!

অমলবাবু একান্ত নাচারের মতন বললেন, 'হে ভগবান, আবার কী হল? আর যে পারি না!'

মন্দিরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সকলে যে বীভৎস দৃশ্য দেখলে, ভাষায় তা ঠিকমতো বর্ণনা করা অসম্ভব!

মন্দিরের মেঝের উপরে অনেকখানি জায়গা জুড়ে পড়ে রয়েছে বিরাট এক অজগর সাপ! এত বড়ো অজগর দেখা যায় না বললেই হয়-লম্বায় সে হয়তো ত্রিশ ফুটের কম হবে না এবং দেহও তার অসম্ভব রকম মোটা!

কিন্তু এই ভয়াবহ দৃশ্য অধিকতর ভয়ংকর হয়ে উঠেছে আর এক অভাবিত কারণে! অজগরের বিপুল কুণ্ডলীর ভিতরে প্রায় রক্তাক্ত মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়ে রয়েছে দুটো মানুষের মৃতদেহ! . . . তৃতীয় একটা দেহ অজগরের ল্যাজের কাছে মেঝের উপরে হাত-পা ছড়িয়ে আড়ষ্ট হয়ে আছে-তার মাথাটা একেবারে চুর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে এবং তার পাশে পড়ে একটা ভাঙা বন্দুক!

অজগরটাও বেঁচে নেই-তারও মাথা ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেছে।

মন্দিরের ভিতরে যেদিকে তাকানো যায় সেইদিকে রক্ত আর রক্ত! কোথাও পড়ে আছে চাপ চাপ রক্ত, কোথাও আঁকাবাঁকা রক্তের ধারা! রক্তের ফিনকি মন্দিরের দেওয়ালেও গিয়ে লেগেছে! এত রক্ত অমলবাবু এক জায়গায় কখনো দেখেননি,-তাঁর মাথা ঘুরে গেল, প্রায় অজ্ঞানের মতো তিনি ধপাস করে বসে পড়লেন!

অনেকক্ষণ স্তম্ভিতের মতন দাঁড়িয়ে থাকবার পর জয়ন্ত ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললে, 'তাহলে কাল আমরা এই অভাগাদেরই আর্তনাদ শুনেছিলুম?'

মানিক বললে, 'তা ছাড়া আর কী!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কিন্তু কে এরা?'

জয়ন্ত বললে, 'বুঝতে পারছেন না? এরা যে আমাদেরই বন্ধু! আপনাদের গুলি খেয়েও এদের আশ মেটেনি, পদ্মরাগ বুদ্ধের উপরে এদের এত ভক্তি যে, আমরা কী করছি দেখবার জন্যে রাত্রে মন্দিরে এসে

ঢুকেছিল!'

অমলবাবু ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, 'আমি চ্যান আর ইনকে চিনতে পেরেছি। বন্দুকের পাশের লোকটা হচ্ছে ইন, আর অজগরের কুণ্ডলীর ভিতরে মুখ খিঁচিয়ে রয়েছে চ্যান। অন্য লোকটাকে চিনি না।'

জয়ন্ত বললে, 'সমস্ত ব্যাপারটাই বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। . . . সাপ কখনো গর্ত খোঁড়ে না, অন্য জীবের খোঁড়া গর্তে সে আশ্রয় নেয়। কোনো জন্তু উপর থেকে গর্ত খুঁড়ে পদ্মরাগ বুদ্ধের সুড়ঙ্গে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। অজগর মহাপ্রভু সেই গর্ত দিয়ে ভিতরে ঢুকে তাকে ফলার করেন আর তারপর থেকে মনের সুখে সুড়ঙ্গেই বাস করতে থাকেন। কাল রাত্রে উনিই আমাদেরও ফলার করবার চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু আমরা আত্মত্যাগে রাজি না হওয়াতে উনি বেরিয়ে এসে আমাদের অভদ্রতায় অত্যন্ত বিরক্ত আর ক্রুদ্ধ হয়ে মন্দিরের ভিতরেই বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিলেন, বা কোনো কোণ বেছে নিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়েছিলেন। তারপর তখন চ্যান আর ইন কোম্পানির রঙ্গালয়ে প্রবেশ। তাদের চোখ তখন আমাদের জন্যেই ব্যস্ত, অজগরকে তারা দেখতে পায়নি, কিন্তু অজগর তাদের দেখেই আক্রমণ করলে! চ্যান আর তার একজন সঙ্গী প্রথম আক্রমণেই তার কুণ্ডলীর ভিতরে ধরা পড়ল, ইনের হাতে ছিল বন্দুক, সে অব্যর্থ লক্ষ্যে অজগরের মাথা টিপ করে দু-বার বন্দুক ছুড়লে, সঙ্গেসঙ্গে অজগরের বিষম ল্যাজের ঝাপটায় তার মাথা আর হাতের বন্দুক গেল গুঁড়িয়ে! বাকি যারা ছিল তারা করলে সবেগে পলায়ন! ব্যাপারটা বোধ হয় অনেকটা এইরকমই হয়েছিল। . . . অর্থাৎ আমাদের মানুষ শত্রুর দল নিজেরাই আত্মবলি দিয়ে আমাদের অজগর শত্রুকে বধ করে আমাদের পথ সাফ করে দিয়েছে! ভগবানকেও ধন্যবাদ, চ্যান অ্যান্ড ইন কোম্পানিকেও ধন্যবাদ! আর ধন্যবাদ দিই পদ্মরাগ বুদ্ধদেবকে! তিনি সত্যই যদি থাকেন, তবে আমদের হস্তগত হলে তিনি বোধ করি খুশি হবেন!'

সুন্দরবাবু এতক্ষণ পরে ভরসা করে মন্দিরের ভিতরে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'হুম! বেটা অজগর! তুমি আমাদেরই জলযোগ করবার ফিকিরে ছিলে বটে!'-বলেই তিনি মৃত অজগরের কুণ্ডলীর উপরে বন্দুক দিয়ে একটা আঘাত করলেন।

এবং যেমন আঘাত করা, অমনি সঙ্গেসঙ্গে অজগরের মৃতদেহটা কুণ্ডলী পাকিয়ে লাফিয়ে উঠল!

সুন্দরবাবু মৃত অজগরের এমন কল্পনাতীত ব্যবহার আশা করেননি, তিনি ভয়ানক ভড়কে হঠাৎ পিছিয়ে আসতে গিয়ে টাল সামলাতে না পেরে মস্ত ব্যায়ামবীরের মতো আশ্চর্য এক ডিগবাজি খেয়ে মেঝের উপরে সশব্দে আছাড় খেয়ে পড়লেন এবং ষাঁড়ের মতো স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওরে বাবারে, অজগরটা এখনও জ্যান্ত আছে যে রে, আমার প্রাণ গেল রে!'

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি সুন্দরবাবুকে অতি অনায়াসে মাটি থেকে শূন্যে তুলে নিয়ে সরে এল এবং তাঁকে আবার সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিলে!

অজগরের দেহটা তখন ফুলে ফুলে উঠছে এবং কুণ্ডলীর পর কুণ্ডলী পাকাচ্ছে।

সুন্দরবাবু মহা ভয়ে আর একবার সেইদিকে তাকিয়েই বেগে পলায়ন করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু জয়ন্ত হাত ধরে তাঁকে টেনে রাখলে।

সুন্দরবাবু পাগলের মতন বলে উঠলেন, 'আমাকে ছেড়ে দাও জয়ন্ত, আমাকে ছেড়ে দাও! আমি অজগরের খোরাক হতে চাই না!'

জয়ন্ত হেসে বললে, 'সুন্দরবাবু, শান্ত হোন!'

-'শান্ত হব? জ্যান্ত অজগরের সামনে শান্ত হব? হুম হুম হুম!'

-'ভয় নেই সুন্দরবাবু! অজগরের প্রাণ না থাকলেও তার দেহ ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে নড়েচড়ে, কুণ্ডলী পাকায়! অবশ্য তখনও ওই কুণ্ডলীর ভিতরে গিয়ে ঢুকলে কোনো জীবেরই রক্ষা নেই, কিন্তু সে আর তেড়ে এসে কারুকে ধরতে পারে না!'

সুন্দরবাবু দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে অজগরটার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বটে, বটে, বটে? তাহলে আমি আর পালাব না! কিন্তু আমার ভয়ানক লেগেছে! আমি ডিগবাজি খেয়ে পাথরের মেঝের ওপর আছাড় খেয়েছি-ঃউ!'

জয়ন্ত একপাশ দিয়ে এগিয়ে ভাঙা বেদির সুড়ঙ্গমুখের কাছে গিয়ে প্রসন্ন কণ্ঠে বললে, 'এখন দূরে যাক সমস্ত দুঃস্বপ্ন, চোখের সামনে জেগে উঠুক পদ্মরাগ বুদ্ধের প্রতিমা! হাতি সিং, সকালেই আবার জ্বালো রাতের আলো-কেননা পাতালে দিনও নেই রাতও নেই, আছে শুধু রন্ধ্রহীন অন্ধকার!'

হাতি সিংয়ের লোকজনেরা আলো জ্বাললে, সকলে আবার পাতালপুরীর সোপান দিয়ে নীচে নামতে লাগল-সঙ্গে সঙ্গে রবিকরোজ্জ্বল প্রভাতের সমস্ত রং আর সুর আর গন্ধের সঙ্গে ঘটল বিচ্ছেদ!

সুড়ঙ্গের সুদূর অন্ধকারের পানে তাকিয়ে সুন্দরবাবুর কানে কানে মানিক বললে, 'আচ্ছা, অজগরের বিধবা বউ যদি ওখানে থাকে, তাহলে আপনি কী করবেন?'

সুন্দরবাবু চমকে উঠে খুব সন্দেহের সঙ্গে সুমুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'আমাকে আর নতুন ভয় দেখিয়ো না মানিক!'

অজগরের বিধবা বউয়ের সঙ্গে কারুর আর দেখা হল না বটে, কিন্তু নতুন এক নিরাশায় ভেঙে পড়ল সকলের মন।

সোজা পথ, কোনো শাখা-প্রশাখা নেই। কিন্তু খানিকপরেই পথ গেল ফুরিয়ে। সুমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক নিথর পাথরের দেওয়াল!

সকলে খানিকক্ষণ হতভম্বের মতো পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল।

অমলবাবু ভাঙা ভাঙা গলায় বললেন, 'এই পাথরের দেওয়ালে মাথা ঠুকে আমাদের সকল আশার আজ অস্ত হল!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'শেষটা যে এই হবে, আমি তা জানতুম! হুম, পদ্মরাগ বুদ্ধ না অশ্বডিম্ব বুদ্ধ! ধাপ্পা বাবা, ধাপ্পা!'

মানিক বললে, 'তাহলে অকারণে এত কষ্ট করে এই সুড়ঙ্গ কাটা হয়েছিল কেন?'

অমলবাবু বললেন, 'এ হচ্ছে নাগরাজ্য, নাগ ছিল এখানকার প্রতীক! ওঙ্কারধামের ভাস্কর্যে সর্বত্রই তাই নাগমূর্তির ছড়াছড়ি! ভারতের অনেক তীর্থক্ষেত্রে যেমন পবিত্র কুমির পোষা হয়, বাংলাদেশে যেমন বাস্তুসাপকে ঠাঁই দেওয়া হয়, এই মন্দিরেও তেমনি সুড়ঙ্গ কেটে পবিত্র অজগরকে রাখা হয়েছিল!'

জয়ন্ত ভাবতে ভাবতে মাথা নেড়ে বললে, 'উঁহু আপনার যুক্তি মনে লাগছে না! যে অজগরকে মনে করা হয় পবিত্র, ভক্তরা সুড়ঙ্গের মুখ বন্ধ করে তাকে কখনো কবর দিয়ে জ্যান্ত মারবার ব্যবস্থা করত না! . . . আমার মনে একটা সন্দেহ জাগছে! হাতি সিং, তোমার লোকজনদের এগিয়ে আসতে বলো! ভেঙে ফেলুক তারা এই পাথরের দেওয়াল! দেখা যাক দেওয়ালের ওপাশে কী আছে?' বলেই সে রুপোর শামুকের নস্যদানি বার করে ঘন ঘন নস্য নিতে লাগল।

মানিক জানত, জয়ন্ত খুশি হলে নস্য না নিয়ে পারে না! কিন্তু আপাতত আনন্দের বদলে সে আশঙ্কার কারণই খুঁজে পেলে। তাড়াতাড়ি বললে, 'জয়, সেই পুকুরের কথা তোমার মনে অছে তো? পুকুরের কোণ থেকে যে পথটা মন্দিরে গিয়ে পৌঁছেছে, এই সুড়ঙ্গ আছে ঠিক তার নীচে। সুতরাং আমরা এখন হয়ত সেই পুকুরের পাশে বা নীচে এসে দাঁড়িয়েছি। দেওয়াল ভাঙলে সুড়ঙ্গের ভিতর হুড়হুড় করে জল ঢুকতে পারে! তখন আমাদের কী দশা হবে?'

জয়ন্ত বললে, 'সব দেওয়াল তো একসঙ্গে ভাঙা হবে না, জল ঢুকলে পালাবার ঢের সময় পাওয়া যাবে। . . . ভাঙো দেওয়াল!'

দেওয়ালের উপর পড়তে লাগল কুড়ুলের পর কুড়ুলের ঘা! শক্ত দেওয়াল! সহজে ভাঙা যায় না। অনেক কষ্টে একখানা পাথর সরানো হল।

কিন্তু জল-টল কিছুই ভিতরে ঢুকল না। জয়ন্ত সেই ফাঁকটার ভিতরে হাত চালিয়ে অল্পক্ষণ কী অনুভব করলে। তারপর মহা উৎসাহে বলে উঠল, 'চালাও কুড়ুল! সরাও পাথর! আমার সন্দেহ মিথ্যে নয়! এ সুড়ঙ্গ অকারণে কাটা হয়নি!'

মানিকও তাড়াতাড়ি সেই ফাঁকের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে সানন্দে চেঁচিয়ে উঠল, 'দেওয়ালের ওপাশে কাঠের মতো কী হাতে ঠেকছে! বোধ হয় দরজা!'

সুন্দরবাবু বিপুল কৌতূহলে বললেন, 'অ্যাঁ :? বল কী! দরজা? আলিবাবার চল্লিশ দস্যুর রত্নগুহা চিচিং ফাঁক, চিচিং ফাঁক!'

ঠকাং! ঠকাং! ঠকাং! চলল সমানে কুড়ুলের পর কুড়ুল! খসে পড়ছে, ভেঙে পড়ছে পাথরের পর পাথর! এক-একখানা পাথর খসে, আর নেচে নেচে ওঠে সকলের প্রাণ! . . .

দরজাই বটে! খুব বড়ো দরজা নয় ছোটো দরজা! তিন ফুটের বেশি উঁচু নয় কিন্তু বিলক্ষণ মজবুত! আগাগোড়া লোহার কিল মারা! পাথরের চেয়ে কঠিন! আর সেই দরজায় লাগানো রয়েছে একটা পুরোনো মস্ত পিতলের কুলুপ!

জয়ন্ত বললে, 'কুলুপের ভিতরে বেশ করে তেল ঢেলে দাও! বহুকাল ও কুলুপে চাবি ঢোকেনি, তেলে না ভিজলে খুলবে না!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'তেল তো ঢালছ, কিন্তু চাবি কোথায়?'

মানিক বললে, 'আমার কাছে! নিশ্চয় সেই চাবিটা ওই কুলুপে লাগবে?'

জয়ন্ত রুপোর শামুকের নস্যদানি বার করে ঘন ঘন নস্য নিয়ে বললে, 'কুলুপটা ভালো করে তেলে ভিজুক! ততক্ষণে আমরা আর-একবার চা তৈরি করলে নিশ্চয়ই কারুর আপত্তি হবে না? সন্দেশ আর রসগোল্লার টিন আর একবার বার করলে আপনি কি রাগ করবেন সুন্দরবাবু?'

সুন্দরবাবু ভুঁড়ির উপরে স্নেহভরে হাত বুলোতে বুলোতে একগাল হেসে বললেন, 'রাগ! আমার এ ভুঁড়ি পর্বতপ্রমাণ সন্দেশ-রসগোল্লার স্বপ্ন দেখে! এ ভুঁড়ি কখনো পরিপূর্ণ হয় না! বিশ্বাস না হয়, আজকেই পরখ করে দেখতে পারো-হুম!'

মানিক স্বহস্তে দ্বিতীয় দফা চা তৈরি করতে বসল।

অমলবাবু বললেন, 'এইবারে পদ্মরাগ বুদ্ধের সব রহস্য টের পাওয়া যাবে!'

জয়ন্ত বললে, 'হ্যাঁ, পদ্মরাগ মণির সঙ্গে বুদ্ধদেবের সম্পর্ক কী, এইবারেই তা জানতে পারব! অবশ্য এটা আমার জানা আছে যে, পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ভালো পদ্মরাগ মণি ব্রহ্মদেশ ছাড়া আর কোথাও জন্মায় না! পৃথিবীতে সবচেয়ে কঠিন বস্তু হচ্ছে হীরক, তারপরেই পদ্মরাগের স্থান। কিন্তু সমান ওজনের হীরকের চেয়ে পদ্মরাগ মণি বেশি মূল্যবান!'

চায়ের পিয়ালা যখন খালি হল, সন্দেশ-রসগোল্লা যখন ফুরল, তখন মানিক সগর্বে বার করলে তার পকেটের চাবি এবং সেই চাবি ঢুকল কুলুপের গর্ভে এবং একবার ঘোরাতেই কুলুপ গেল খুলে!

সমস্ত গুহা চিৎকার-শব্দে পরিপূর্ণ করে জয়ন্ত বললে, 'জয়, পদ্মরাগ বুদ্ধের জয়!'

দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে দেখা গেল, ছোটো একটি ঘর। তার মেঝে, তার দেওয়াল, তার ছাত সব পাথরে গড়া। সুতীব্র আধুনিক আলোকের আঘাতে কতকাল পরে সেখানকার প্রাচীন ও নিবিড় অন্ধকারের মৃত্যু হল, তার হিসাব কেউ জানে না! ঘরে আর কোনো আসবাব নেই, কেবল মাঝখানে রয়েছে কোনো ধাতু দিয়ে গড়া একটি মাঝারি সিন্দুক!

জয়ন্ত ঘরের চারিদিক তাকিয়ে বললে, মানিক, দেখো! পাথরের ঘর, তবু স্যাঁৎসেতে। পাথরের জোড়ের ভিতর দিয়ে জল গড়াচ্ছে! ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছ?'

-'পারছি, জয়! এই ঘরটা আছে সেই পুকুরের নীচে।'

-'এখন এটাও বুঝতে পারছ তো, নকশায় পুকুরের পশ্চিম কোণে সেই চিহ্নিত জায়গাটা কেন আঁকা হয়েছে? পুকুরের তলায় এই ঘরটা আছে, মন্দিরগামী রাস্তার তলায় এই সুড়ঙ্গটা আছে, বেদির তলায় সিঁড়ির সার আছে, নকশা দিয়েছে তারই ইঙ্গিত! সাধারণ লোকে নকশা দেখলেও কিছু বুঝতে পারত না-কিন্তু আমরা হচ্ছি অসাধারণেরও চেয়ে অসাধারণ! কারণ অসাধারণ লোক নকশার রহস্য বুঝতে পারলেও সুড়ঙ্গের দরজা ঢাকা পাথরের দেওয়াল দেখে ফিরে যেতে বাধ্য হত, কিন্তু আমরা ফিরে যাইনি। অতএব অনায়াসেই গর্ব করতে পারি! এখন তোলো ওই সিন্দুকের ডালা!'

সিন্দুকের ডালা তুলেই সকলে অবাক বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল! . . . সিন্দুকের ভিতরে লণ্ঠনের আলো পড়বার আগেই তার মধ্য থেকে বেরিয়ে এল যেন একটা সুতীব্র রক্তজ্যোতির ঝটকা! তারপরেই দেখা গেল টকটকে লাল ও জ্বলজ্বলে পাথরের তৈরি একটি অতি আশ্চর্য ও অতুলনীয় বুদ্ধমূর্তি সেখানে কারুকার্যে বিচিত্র সুবৃহৎ স্বর্ণপাত্রে শোয়ানো রয়েছে! মূর্তিটি দৈর্ঘ্যে একহাতের কম হবে না!

জয়ন্ত বিস্ময়-বিহ্বল স্বরে বললে, 'মূর্তির সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন লাল আলো ঠিকরে পড়ছে, চোখে লাগছে ধাঁধা! এ মণিময় মূর্তি না হয়ে যায় না! না জানি এর দাম কত কোটি টাকা! মানিক মানিক! এ কি সত্য, না অসম্ভব স্বপ্ন?'

মানিক আবেগে নিরুত্তর হয়ে মূর্তির মণিময়, দীপ্ত ও মসৃণ গায়ে হাত বুলিয়ে দেখতে লাগল।

দুই চক্ষু ছানাবড়ার মতন করে সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম! পদ্মরাগ মণি কেটে এত বড়ো মূর্তি তৈরি করা হয়েছে? পদ্মরাগ মণি এত বড়ো হয়!'

মানিক বললে, 'না সুন্দরবাবু, অনেকগুলো পদ্মরাগ মণি একসঙ্গে জুড়ে শিল্পী এই মূর্তি গড়েছে। কিন্তু এমনি তার হাতের কায়দা যে, কোথাও জোড় ধরবার উপায়ই নেই!'

জয়ন্ত কিছু বললে না, অভিভূত প্রাণে মূর্তিটাকে সযত্নে তুলে সিন্দুকের উপর বসিয়ে দিলে। অপার্থিব আনন্দের মতো ঘোররক্তবর্ণ সেই মহামানব মূর্তির প্রভা যেন আধুনিক সমুজ্জ্বল আলোগুলোকেও লজ্জা দিতে লাগল!

সেই জ্যোতির্ময় মূর্তির সামনে দুই হাত জোড় করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে অমলবাবু ভক্তিভরে বলে উঠলেন, 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি! ধর্মং শরণং গচ্ছামি! সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি!'

---

* ওঙ্কারধাম সম্বন্ধে এ উপন্যাসের আগে বা পরে যা বলা হয়েছে ও বলা হবে, তা লেখকের কপোলকল্পিত নয়। অধিকাংশই প্রমাণিত ঐতিহাসিক সত্য। -ইতি লেখক

* 'And in Yasodharpura, which is the Great Capital of the Khmer people and the finest city in all of Asia, there is a statue of the Lord Buddha sitting upon the coiled cobra which is the emblem of that race. And this statue was fashioned out of emeralds so cunningly matched and cemented together that the whole work sums as one solid emerald and shines with a green light so intense that none but faith may look upon it.'

কে ?

নতুন মামলা

সবে ফুটিফুটি করছে ভোরের আলো। কলকাতার গড়ের মাঠ।

গাছে গাছে বিহঙ্গদের ঐক্যতান। এখানে-ওখানে অশ্বচালনা করছে পাঞ্জাবি ঘোড়সওয়াররা। প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছে আরও অনেকে এবং তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে আমাদের পরিচিত তিনটি মানুষকে-সখের গোয়েন্দা জয়ন্ত আর মানিক ও পুলিশ-কর্মচারী সুন্দরবাবু।

শরৎ ঋতুর জন্যে আসর ছেড়ে দেবার আগে শেষ বর্ষা যথেষ্ট বিক্রম প্রকাশ করে গিয়েছে গতকল্য রাত্রে। সারা শহরটা ঘণ্টা কয়েক ধরে স্নান করেছে এমন ঘন বৃষ্টিধারায় যে, পথের আর মাঠের অনেক জায়গাতেই এখনও থইথই করছে ঘোলাটে জল। রাত দুটোর পরে বৃষ্টি থেমেছে বটে, কিন্তু গড়ের মাঠ এখনও প্রাতর্ভ্রমণের উপযোগী হয়ে ওঠেনি।

তবু প্রভাতি ভ্রমণে যারা অভ্যস্থ এ সময়টায় তারা ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দি হয়ে থাকতে চায় না। জয়ন্ত আর মানিক হচ্ছে এই জাতীয় জীব। কেবল সূর্যোদয়ের আগে নয়, সূর্যাস্তের পরেও একবার করে মুক্ত আকাশ-বাতাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে না পারলে তারা যেন আত্মস্থ হতে পারে না।

এ বাতিক কোনোদিনই ছিল না সুন্দরবাবুর। কিন্তু ইদানীং তাঁর উদরদেশের বিপুলতা এতটা বেড়ে উঠেছে যে, চিকিৎসকরা পরামর্শ দিয়েছেন, নিয়মিতভাবে প্রত্যহ কিঞ্চিৎ ব্যায়াম-অর্থাৎ অন্তত মাইল দুয়েক পদব্রজে ভ্রমণ করতে। তাই ইচ্ছার বিরুদ্ধেও আজকাল তাঁকে হতে হয়েছে জয়ন্তদের ভ্রমণের সঙ্গী।

ভুঁড়ির দ্বারা ভারাক্রান্ত সুন্দরবাবু কিছুক্ষণ পদচালনা করবার পর শ্রান্ত স্বরে বললেন, 'মানিক, পথের আর মাঠের অবস্থা দেখছ তো?'

-'দেখছি।'

-'আজ আমি কিছুতেই বেড়াতে আসতুম না।'

-'তবে এলেন কেন?'

-'তোমাদের উৎপাতের দায়ে পড়ে। ভোর হতে-না-হতেই, কাক-চিল না ডাকতেই, বাসায় ঢুকে তুমি গাধার মতো যা ডাকাডাকি শুরু করলে। বাড়িতে ডাকাত পড়েছে ভেবে ছেলে-মেয়েরা পর্যন্ত চমকে জেগে উঠল। তোমার গর্ধভ কণ্ঠকে রুদ্ধ করবার জন্যই আজ আমাকে তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে আসতে হয়েছে।'

মানিক মুখ টিপে হাসতে হাসতে বললে, 'আমাকে গাধা বলে আপনি যদি খুশি হন, আমি আপত্তি করব না। কিন্তু বাইরে এসে কি দেখছেন না, আজকের দিনটির বিশেষত্ব?

-'হুম! বিশেষত্বের মধ্যে তো দেখছি কেবল জল, কাদা আর পিছল পথ।'

-'আর কিছু দেখছেন না?'

-'উঁহু।'

-'তাহলে আপনার চোখের দোষ হয়েছে।'

-'চোখের কিছু দোষ হয়নি। তাহলে আমি চশমা পরতুম।'

মানিক এদিক-ওদিক অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললে, 'দেখছেন?'

সুন্দরবাবু এদিকে-ওদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে হতভম্বের মতো বললেন, 'কিছুই দেখছি না তো!'

-'ভালো করে চেয়ে দেখুন, মাঠের যেখানে যেখানে জল জমেছে, সেইখানে স্বর্গ নেমে এসেছে মাটির কোলে।'

-'মানে?'

-'স্বর্গ বললে আমরা কোনদিকে তাকাই? আকাশের দিকে। দেখুন মাঠের যেখানে যেখানে জল জমেছে, সেইখানে নেমে এসেছে টুকরো আকাশের সুন্দর নিলীমা। একটু পরেই দেখতে পাবেন ওখানে সাঁতার কাটছে কচি রোদের কাঁচা সোনালি আভা। আবার সন্ধ্যার পরে হয়তো ওখানে ফুটে উঠবে নতুন চাঁদের রুপোলি জ্যোৎস্নাও।'

সুন্দরবাবু দুই ভুরু তুলে বললেন, 'উঃ ভয়ংকর কাব্যি!'

জয়ন্ত এতক্ষণ নির্বাক মুখে অগ্রসর হচ্ছিল। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, 'সুন্দরবাবু!'

তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে সুন্দরবাবু সচমকে বললেন, 'কী জয়ন্ত?'

আঙুল দিয়ে একদিকে দেখিয়ে জয়ন্ত বললে, 'ওই গাছতলায় কী পড়ে আছে দেখছেন?'

-'একটা মানুষ শুয়ে আছে বলে মনে হচ্ছে! না, না, ওটা যে রক্তাক্ত দেহ!'

-'হুঁ। খুব সম্ভব ওটা মৃতদেহ! গড়ের মাঠে এমনধারা দৃশ্য নতুন নয়। এগিয়ে চলুন, ব্যাপারটা কী দেখা যাক!'

সুন্দরবাবু একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'ব্যাপার আর কী, ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভাঙে। মানিক এতক্ষণ আমাকে গড়ের মাঠে মাটির উপরে স্বর্গ দেখাবার চেষ্টা করছিল। এখন সামলাও বাবা স্বর্গের ঠেলা, স্বর্গের বদলে ঘাড়ে হয়তো চাপল একটা নতুন খুনের মামলা!'

মানিক বললে, 'সত্যি সুন্দরবাবু, আপনার সঙ্গে আমিও সহানুভূতি প্রকাশ করছি। এমন বৃষ্টিস্নাত প্রভাত, মনে মনে করছিলুম কাব্যালোচনা, চোখের সামনে দেখছিলুম মাটির ফ্রেমে-বাঁধানো জলের পটে নিলীমার ছবি, হঠাৎ কিনা রক্তাক্ত মৃত্যু এসে এক মুহূর্তে বিলুপ্ত করে দিলে সমস্ত সৌন্দর্য। নিয়তির পরিহাস আর কাকে বলে!'

সকলে তখন গাছতলায় এসে দাঁড়িয়েছে। সেখানে মাটির ওপরে হাত-পা ছড়িয়ে চিত হয়ে পড়ে রয়েছে একটা মানুষের নিশ্চেষ্ট দেহ। প্রথম দৃষ্টিতেই বোঝা যায়, সেটা মৃতদেহ ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ, তার মুখের অস্তিত্ব নেই বললেই হয়-কপালের তলা থেকে চিবুক পর্যন্ত মুখের সমস্ত অংশটা একেবারে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে, দেখা যাচ্ছে কেবল চাপ-বাঁধা রক্তের মধ্যে খানিকটা ছিন্নভিন্ন মাংস! বীভৎস দৃশ্য!

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম, আত্মহত্যার নয়, হত্যার মামলা।

জয়ন্ত বললে, 'কেউ ছররা ভরা শটগান ছুড়ে এই বেচারার মুখ উড়িয়ে দিয়েছে। আর বন্দুকটা ছোড়া হয়েছে কাছ থেকেই, নইলে মুখটা অমনভাবে উড়ে যেত না।' সে বসে পড়ে মৃতদেহের ওপর হাত রেখে আবার বললে, 'দেহটা এখনও একেবারে ঠান্ডা হয়ে যায়নি। খুব সম্ভব এর মৃত্যু হয়েছে ঘণ্টা খানেক আগেই।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'চারিদিকে কত রক্ত দেখেছ?'

-'তার মানে একে হত্যা করা হয়েছে এইখানেই। ঘটনাটা ঘটেছে বৃষ্টি থামবার পরে কোনো একসময়ে। নইলে কালকের প্রবল বৃষ্টিপাতে মৃতদেহের সমস্ত রক্ত ধুয়ে-মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। রাত দুটোর আগে বৃষ্টি থামেনি। আমরা ঘটনাস্থলে এসেছি সকাল সাড়ে পাঁচটার পর। হত্যাকারী কাজ সেরেছে এরই মধ্যে।'

সুন্দরবাবু বললে, 'এটা হচ্ছে যুবকের লাশ। জুতা আর পরনের কাপড় দেখলেই বোঝা যায় ভদ্রবংশের যুবক। কিন্তু ওর গায়ে রয়েছে কেবল একটা গেঞ্জি। গভীর রাত্রে কেবল গেঞ্জি পরে ভদ্রবংশের কোনো যুবক কি গড়ের মাঠে বেড়াতে আসে?'

-'হত ব্যক্তিকে বোধ হয় কোনো গাড়িতে করে এখানে আনা হয়েছিল? হত্যাকাণ্ডের পর হয়তো তার উপরকার জামাটা অপরাধী খুলে নিয়ে গিয়েছে।'

-'কেন?'

-'সহজে যাতে শনাক্ত করা না যায়।'

হেঁট হয়ে মাটির উপর থেকে একখানা খাম তুলে নিয়ে তার উপরে চোখ বুলিয়ে বলল, 'কিন্তু খুব সম্ভব হত্যাকারী দেখতে পায়নি যে এই খামখানা মৃত ব্যক্তির জামার পকেট থেকে এখানে পড়ে গিয়েছে।'

-'খামের উপরে কারুর নাম আর ঠিকানা আছে?'

-'হ্যাঁ। শ্রীযুক্ত মণিমোহন বসু। দশ নম্বর বলাই শীল স্ট্রিট। কলিকাতা।'

জয়ন্ত বললে, 'এটা একটা বড়ো সূত্র। ওটা হয় হত ব্যক্তির, নয় হত্যাকারীর নাম আর ঠিকানা! খামের ভিতর কোনো চিঠি আছে?'

-'আছে। এই যে!' চিঠিখানা পড়ে মানিক বললে, 'বাজে চিঠি।' শালিখায় পঁচিশ নম্বর সুন্দর সেন রোড থেকে এক চন্দ্রনাথ রায় মণিমোহনকে তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে অনুরোধ করেছে।'

-'বাজে চিঠি নয়, ওটাও কাজে লাগবে। সুন্দরবাবু, আপনার পায়ের কাছে একটা মানিব্যাগ পড়ে আছে না?'

সুন্দরবাবু সেটা কুড়িয়ে নিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ। কিন্তু ব্যাগের ভিতর খালি, ঢুঁঢুঁ।'

জয়ন্ত আশেপাশের জমি পরীক্ষা করতে করতে বললে, 'দেখছি বৃষ্টিভেজা মাটির উপরে তিন জন লোকের আলাদা আলাদা পায়ের ছাপ আছে। ধরলুম তিন জনের এক জন হচ্ছে নিহত মণিমোহন! তাহলে আর দু-জন কে? নিশ্চয়ই হত্যাকারী। সুন্দরবাবু, পদচিহ্নগুলোর প্লাস্টারের ছাপ তোলবার ব্যবস্থা করতে হবে।'

সুন্দরবাবু খুশি মুখে বললেন, 'প্রথমেই যখন এতগুলো সূত্র পাওয়া গেল, তখন মামলাটার কিনারা করতে বেশি বেগ পেতে হবে না বোধ হয়!'

জয়ন্ত বললে, 'আরও একটা কথা বোঝা যাচ্ছে। ঘটনাস্থলে কোনো ধস্তাধস্তির চিহ্ন নেই। হত ব্যক্তি নিশ্চয়ই তার সঙ্গীদের চিনত, তাদের বিশ্বাস করত, নইলে রাত দুটোর পর গড়ের মাঠে এমন নির্জন জায়গায় তাদের সঙ্গে বিনা বাধায় আসতে রাজি হত না! আপাতত এই পর্যন্ত। সূর্য উঠেছে, চারিদিকে লোকের ভিড়, চলো মানিক স্থানান্তরে প্রস্থান করি।'

হেঁয়ালির মামলা

মণিমোহন বসু। দশ নম্বর বলাই শীল স্ট্রিট।

সুন্দরবাবু যথাস্থানে গিয়ে হাজির হয়ে দরজার কড়া নাড়তে লাগলেন।

বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। সুন্দরবাবুর ধরাচূড়া পরা চেহারা দেখেই চমকে উঠল তাঁর দুই চক্ষু।

সুন্দরবাবু শুধোলেন, 'এ বাড়িতে মণিমোহন বসু বলে কেউ থাকে?'

-'থাকে। মণি আমার ছেলে।'

-'আপনার নাম কী?'

-'মহেন্দ্রমোহন বসু।'

-'মণিবাবুর সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই।'

-'মণি কাল থেকে বাড়িতে ফেরেনি। তার জন্যে আমরা বড়ো ভাবছি। সে তো না বলে বাইরে কখনো রাত কাটায় না!'

-'বটে। আপনার ছেলের বয়স কত?'

-'আঠাশ।'

-'গায়ের রং?'

-'উজ্জ্বল শ্যাম।'

-'একহারা, কিন্তু বলিষ্ঠ দেহ?'

-'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

-'বাইরে যাবার সময়ে সে কীরকম পোশাক পরেছিল?'

-'সিল্কের পাঞ্জাবি। সরু কালোপেড়ে মিলের ধুতি। পায়ে ব্রাউন রঙের জুতো।'

-'আপনি অনুগ্রহ করে আমার সঙ্গে একটু আসবেন।'

-'কোথায়?'

-'মর্গে।'

মহেন্দ্রের দুই চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠল। সবিস্ময়ে বললেন, 'মর্গে?'

-'আপনার জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে। কিন্তু না বলেও আর উপায় নেই। আজ আমরা একটা লাশ পেয়েছি। সেটা আপনার ছেলের দেহও হতে পারে!'

মহেন্দ্রবাবু টলে পড়ে যাচ্ছিল, সুন্দরবাবু তাড়াতাড়ি দু-হাতে তাকে ধরে ফেললেন তারপর বললেন, 'স্থির হোন মহেন্দ্রবাবু। আসুন আমার সঙ্গে। আমাদের অনুমান হয়তো সত্য নয়!'

শবাগারে গিয়ে সন্দেহ কিন্তু সত্য বলেই প্রমাণিত হল। যদিও শবের মুখ চেনবার উপায় নেই, তবু দেহটা পরীক্ষা করেই মহেন্দ্র সক্রন্দনে বলে উঠল, 'এ আমার মণিমোহন।'

খানিক পরে শোকের প্রথম ধাক্কাটা সে যখন কতকটা সামলে নিলে, সুন্দরবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার ছেলে কী কাজ করত?'

-'মার্চেন্ট আপিসে চাকরি করত, কিন্তু আপাতত বেকার হয়ে বসেছিল।'

-'দেখুন মহেন্দ্রবাবু, আমাদের ধারণা, মণিমোহন যাদের হাতে মারা পড়েছে, সে তাদের চিনত। সে কীরকম লোকের সঙ্গে মেলামেশা করত, আপনি কি তা জানেন?'

-'যতদূর জানি, আমার ছেলের অসৎ সংসর্গ ছিল না। সে নিজেও ছিল শান্তশিষ্ট, অতি ভদ্র, মেলামেশাও করত সেইরকম সব লোকের সঙ্গে।'

-'তার কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে আপনি চেনেন?'

-'চিনি। তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠতা ছিল একজনের সঙ্গে, তার নাম নন্দলাল মিত্র।'

-'ঠিকানা?'

-'পাঁচ নম্বর রায় রোড।'

-'তার সম্বন্ধে আরও কিছু বলতে পারেন?'

-'নন্দ বড়ো ভালো ছেলে। মণিরই সমবয়সি। কে. সরকারের বিখ্যাত জুয়েলারি ফার্মের ক্যাশিয়ার।'

-'হুম। মণিমোহনের আর কোনো বন্ধুর কথা বলতে পারেন?'

-'বিশেষ কিছু খবর রাখি না। নন্দের মতো ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলে আর কাউকে আমি জানি না। তবে হালে . . .'

-'বলুন, থামলেন কেন?'

-'হালে মণির সঙ্গে একটি লোকের আলাপ হয়েছে বটে। লোকটিকে আমার ভালো লাগত না।'

-'ভালো লাগত না কেন?'

-'প্রকৃতির কথা জানি না, তবে আকৃতি ছিল তার বিরুদ্ধে। অত্যন্ত কাঠখোট্টা চেহারা।'

-'তার নাম?'

-'চন্দ্রনাথ রায়।'

নাম শুনেই সুন্দরবাবু জাগ্রত হয়ে উঠলেন অধিকতর। ঘটনাস্থলে যে পত্র পাওয়া গিয়াছে, তারও লেখকের নাম চন্দ্রনাথ রায়। তিনি বললেন, 'চন্দ্রনাথ কি শালিখার পঁচিশ নম্বর সুন্দর সেন রোডে থাকে?'

-'ঠিক ঠিকানা জানি না, তবে সে শালিখাতেই থাকে বটে।'

-'তার দেহের একটু বর্ণনা দিন।'

-'রং কালো। আর এক পোঁচ বেশি কালো হলেই সে আফ্রিকার কাফ্রিদের দলে গিয়ে ভিড়তে পারত। মাথায় ছয় ফুটের কাছাকাছি রীতিমতো বলবান দোহারা দেহ। খ্যাঁদা নাক, খুদে খুদে চোখ, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। গোঁফদাড়ি কামানো। সর্বদাই কোট-প্যান্ট পরে আর হাতে থাকে একগাছা মোটা বাঘমারা লাঠি। বাঁ-হাতের কড়ে আঙুলের আধখানা নেই।'

-'হুম! যে বর্ণনা পেলুম, ভিড়ের ভিতর থেকে চন্দ্রনাথকে চিনে নিতে দেরি লাগবে না। আচ্ছা মহেন্দ্রবাবু, কেবল চেহারার জন্যই কি আপনার চন্দ্রনাথকে ভালো লাগত না?'

-'না। তার গলার আওয়াজ যেমন কর্কশ, কথাবার্তাও তেমনি রুক্ষ! তার সঙ্গে মেলামেশার পর থেকেই মণির প্রকৃতিও যেন একটু একটু বদলে গিয়েছিল।'

-'কীরকম?'

-'তার হাবভাব ব্যবহার কিঞ্চিৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছিল।'

-'তার মানে?'

-'সে যেন সর্বদাই কী চিন্তা করত! বাড়ির কারুর সঙ্গে বেশি কথা কইত না, আমাকেও যেন এড়িয়ে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করত! আমরা ভাবতুম, বেকার বসে আছে বলেই সে এমন মনমরা হয়ে আছে।'

-'তাও অসম্ভব নয় তো।'

-'খুব সম্ভব তাই, কিন্তু মণির আরও একটা পরিবর্তন আমরা লক্ষ করেছিলুম।'

-'বলুন।'

-'মণি আগে সন্ধ্যার সঙ্গেসঙ্গেই ফিরে আসত। কিন্তু ইদানীং বাড়ি ফিরতে তার রাত দশ-এগারোটা হয়ে যেত।'

-'কতদিন থেকে এটা লক্ষ করছেন?'

-'চন্দ্রনাথের সঙ্গে মণির আলাপ হওয়ার পর থেকে।'

-'চন্দ্রনাথের আবির্ভাব কত দিন?'

-'সে প্রথমে আমার বাড়িতে আসে মাস পাঁচেক আগে।'

-'মহেন্দ্রবাবু মৃতদেহের মুখ নেই বললেই হয়। ও দেহ যে আপনারই পুত্রের, সেটা ঠিক চিনতে পেরেছেন তো?'

মহেন্দ্র ভগ্ন স্বরে বললে, 'কোনো সন্দেহ নেই-কোনো সন্দেহ নেই। আমি বাপ, নিজের ছেলের দেহ চিনতে পারব না। সেই রং, সেই গড়ন, আঙুলে পলার আংটি, পায়ে সেই জুতো! পরনের কাপড়ের আমাদের ধোপার মার্কা। বেশ বুঝেছি মশাই, আমারই কপাল পুড়েছে।' বলতে বলতে কাঁদো-কাঁদো হয়ে এল তাঁর কণ্ঠস্বর।

সুন্দরবাবু মমতাভরা গলায় বললেন, 'নিয়তি বড়ো নিষ্ঠুর, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে লাভ নেই মহেন্দ্রবাবু। আপাতত আমার আর কোনো জিজ্ঞাস্য নেই, আপনি বাড়ি যেতে পারেন।'

মহেন্দ্রের প্রস্থান। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুন্দরবাবুর চিন্তা: হুম! শালখের চন্দ্রনাথ। রঙে কাফ্রি, নামে চন্দ্র-কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন। আকৃতি প্রকৃতি নাকি সন্দেহজনক! এইবার তোমার দিকেই আমি পদচালনা করব। . . .

কিন্তু সুন্দরবাবুকে বেশি দূর পদচালনা করতে হল না। শবাগারের বাইরে আসতেই তিনি দেখলেন, একখানা মোটর এসে দাঁড়াল এবং গাড়ির ভিতর থেকে নেমে পড়ল একটি যুবক। তার মুখের ভাব উদবিগ্ন।

সে বললে, 'আপনিই তো সুন্দরবাবু?'

-'হুম!'

-'আমি আপনার কাছেই এসেছি।'

-'কেন?'

-'আমার ছোটো ভাই নন্দলাল কাল সন্ধ্যার সময়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, এখনও ফেরেনি। থানায় সেই খবর দিতে গিয়ে শুনলুম, আপনারা নাকি একটা মৃতদেহ পেয়েছেন। আমি দেহটা একবার দেখতে চাই।'

সুন্দরবাবু শুষ্ক কণ্ঠে বললেন, 'সেটা দেখে কী হবে?'

-'দেহটা যদি নন্দের হয়?'

-'অসম্ভব! তা শনাক্ত হয়ে গিয়েছে।'

-'কে শনাক্ত করেছে?'

-'যার লাশ, তার বাপ নিজে।'

-'ভগবান করুন, ও দেহ যেন অন্যেরই হয়। তবু দয়া করে আমাকে কি একটি বার দেখবার সুযোগ দেবেন না?'

-'আরে বাবা, খুনের মামলা-যা আমার চোখের বালি। আমার মগজে এখন বোঁ বোঁ করে চরকি ঘুরছে, এসব বাজে ব্যাপার ভালো লাগছে না, আমি চললুম।' বিরক্ত মুখে সুন্দরবাবু প্রস্থানোদ্যত হলেন।

যুবক হাত জোড় করে মিনতি করে বললে, 'দয়া করুন, একটি বার দেখতে দিন।'

সুন্দরবাবু নাচারভাবে বললেন, 'আপনি তো ভারি ছিনেজোঁক দেখছি। বেশ চলুন, নয়ন সার্থক করুন।'

মৃতদেহের উপরে অর্ধমিনিটকাল চক্ষু বুলিয়েই যুবক চিৎকার করে কেঁদে উঠল।

সুন্দরবাবু বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, 'আরে গেল, খামোকা কান্নাকাটি কেন?'

-'এই তো আমার ভাই নন্দলালের দেহ! যা ভেবেছি তাই, আমাদের সর্বনাশ হয়েছে!'

-'আরে, আপনি পাগল নাকি!'

-'আমি পাগল নই মশাই, পাগল নই! বিশ্বাস না হয়, ওর কাপড় তুলে দেখুন, জানুর উপরে দুই ইঞ্চি লম্বা কালো জড়ুল-এর দাগ আছে।'

অবিশ্বাস ভরে সুন্দরবাবু এগিয়ে গেলেন! কাপড় সরানো হল। জানুর উপরে সত্য সত্যই রয়েছে দুই ইঞ্চি লম্বা কালো জড়ুলচিহ্ন।

ধাঁ করে তাঁর মাথায় জাগল একটা নতুন সন্দেহ। আগ্রহের সঙ্গে তিনি শুধোলেন, 'আপনার ভাইয়ের নাম নন্দলাল?'

-'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

-'নন্দলাল মিত্র?'

-'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

-'বাড়ি পাঁচ নম্বর রায় রোডে?'

-'হ্যাঁ।'

-'তার এক বিশেষ বন্ধুর নাম মণিমোহন বসু?'

-'হ্যাঁ।'

সুন্দরবাবুর টুপি খুলে নিজের টাক চুলকাতে চুলকাতে হতভম্বের মতো বললেন, 'এ কী কাণ্ড রে বাবা! এটা খুনের মামলা, না হেঁয়ালির মামলা?'

চন্দ্রনাথ রায়

প্রভাতি চায়ের আসরের জন্যে দু-জনে প্রস্তুত হচ্ছে, এমন সময়ে হন্তদন্তের মতো সুন্দরবাবুর প্রবেশ-

জয়ন্ত শুধোলে, 'এ কী সুন্দরবাবু, হাঁফাচ্ছেন কেন?'

-'দৌড়ে দৌড়ে আসছি যে!'

-'দৌড়ে দৌড়ে?'

-'প্রায়! পাছে চা-পানের মাহেন্দ্রক্ষণটি উতরে না যায়, সেই ভয়ে সবেগে পদচালনা করেছিলুম! গেল তিন দিন তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়নি, ভয় হল আসর থেকে বুঝি নাম কাটা যায়!'

-'তাহলে গেল তিন দিন বাড়িতে বসে চা-পান করেছেন?'

-'পাগল! আমার বাড়ির চা ছুঁই না। সে যেন নালতের মতো, আর দোকানের চা-ও খাই না, সে যেন ঘোলাটে গঙ্গাজল! আজ তিন দিন চা খাওয়াই হয়নি।'

-'ব্যাপার কী?'

-'গড়ের মাঠের সেই হত্যাকাণ্ডের ঠেলা। হন্তদন্তের মতো খালি তদন্ত আর তদন্ত করতে হচ্ছে। সূত্রও পেয়েছি ঢের, কিন্তু সব সুত্র জোট পাকিয়ে গিয়েছে।'

-'আচ্ছা, আগে চেয়ারসীন হোন, উদরদেশের চায়ের দুর্ভিক্ষ নিদারণ করুন। তারপর সব কথা শুনব।'

সুন্দরবাবু আসন গ্রহণ করে বললেন, 'আজ চায়ের সঙ্গে নতুন কোনো বিশেষত্ব আছে না কি?'

-'বিশেষ কিছুই নয়। আমেরিকান ব্রেকফাস্ট। বিস্কুট, টোম্যাটো ওমলেট আর কড়াইশুঁটির কচুরি।'

-'ব্যস, ব্যস। ওইতেই আমি খুশি হতে পারব। সত্যি বলতে কী ভায়া বাড়ির চা আর ভালো লাগে না কেন জানো? তোমাদের বউদিদিটি দ্রৌপদী নন, নতুন পুরাতন যেকোনো রন্ধনে তিনি একেবারে মূর্তিমতী নিরাশা। হুম, কথায় বলে চা-টা! চায়ের সঙ্গে কিছু কিছু 'টা' না থাকলে চা কখনো সুখের হয়?'

মানিক বললে, 'সুন্দরবাবু, আমাদের বউদিদি দ্রৌপদী হলে আপনি কি তাকে সহ্য করতে পারতেন?'

-'মানে?'

-'দ্রৌপদীর ছিল পাঁচ জন স্বামী।'

-'ধেৎ, খালি কথার ছল ধরা! আচ্ছা জয়ন্ত, টোম্যাটো ওমলেট পদার্থটা কী?'

-'ওমলেটের ভিতরে মাখনে ভাজা কুচি কুচি পেঁয়াজ আর টোম্যাটো পুর। খুব সহজ রান্না।'

-'কিন্তু খেতে মজা তো? নাম শুনেই জিভে জল আসছে। কোথায় হে শ্রীমধুসূদন, শীঘ্র দেখা দাও।'

ট্রে হাতে মধু ভৃত্যের প্রবেশ। চা পর্ব শেষ হবার আগে সুন্দরবাবু আর বাক্যালাপ করবার চেষ্টা করলেন না।

জয়ন্ত বললে, 'অঃতপর।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'তোমরা মর্গের ব্যাপারটা তো আগেই শুনেছ। বেশ তারপর থেকেই আরম্ভ করি। শালখার চন্দ্রনাথ রায়ের সন্ধানে গিয়েছিলাম। কিন্তু তার বাসা খালি, বাহির থেকে তালাবন্ধ। খবর নিয়ে জানলুম হত্যাকাণ্ডের দিন বৈকালে একখানা কালো রংয়ের বুইক সিডান গাড়িতে চড়ে সে চলে গিয়েছে।'

-'গাড়িখানা তার নিজের?'

-'হ্যাঁ। গাড়ি চালাত নিজেই।'

-'বাসায় কি সে একলা থাকত?'

-'হ্যাঁ, অর্থাৎ চাকর, বামুন, দারোয়ান নিয়ে একলা। কিন্তু তার সঙ্গে আর সকলেও অদৃশ্য হয়েছে। এইটেই সন্দেহজনক।'

জয়ন্ত খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। ধীরে ধীরে বললে, 'অসাধারণ মামলা বটে! মহেন্দ্রবাবু লাশ দেখে বলছেন সেটা তাঁর পুত্র মণিমোহনের মৃতদেহ। আর একজন বলছে, সে দেহটা হচ্ছে তার দাদা নন্দলালের।

দ্বিতীয় ব্যক্তির কথামতো লাশের জানুর কাপড় তুলে দেখা গিয়াছে দুই ইঞ্চি লম্বা কালো জড়ুলের দাগ। মনে হচ্ছে দ্বিতীয় ব্যক্তির কথাই ঠিক! কারণ লাশের মুখ নেই-মহেন্দ্রবাবুর ভ্রম হওয়া অসম্ভব নয়।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'শুনলুম মণিমোহনের আর নন্দলালের দেহের রং উচ্চতা আর গড়ন-পিটন নাকি প্রায় একইরকম!'

-'এখানে প্রশ্ন ওঠে অনেকগুলো। ধরলুম হত ব্যক্তি হচ্ছে নন্দলাল। তাহলে হত্যাকারী কে? মণিমোহন? কিন্তু মহেন্দ্রের মুখে প্রকাশ, নন্দ ছিল তার সবচেয়ে বড়ো বন্ধু। সে অমন বন্ধুকে হত্যা করবে কেন? ঘটনাস্থলে আর এক ব্যক্তির পদচিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। সেই-ই বা কে? শালিখার চন্দ্রনাথ? সে এখানে কোন ভূমিকায় অভিনয় করছে? নিশ্চয়ই মহাত্মার ভূমিকায় নয়, কারণ সেও গা-ঢাকা দিয়েছে। হ্যাঁ, ভালো কথা, যে তিন জন লোকের পায়ের দাগ পাওয়া গিয়াছে, তার প্লাস্টারের ছাঁচ তোলা হয়েছে?'

-'হয়েছে?'

-'তারপর?'

-'একজোড়া ছাপের সঙ্গে হত ব্যক্তির-অর্থাৎ নন্দের জুতো অবিকল খাপ খেয়ে গিয়েছে। মণিমোহনের বাসার থেকে জুতোও সংগ্রহ করেছি। তার জুতোও মিলে গিয়েছে আর এক জোড়া ছাপের সঙ্গে। কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তিকে পাইনি, তাই ছাপের সঙ্গে তার জুতোও মেলানো হয়নি।'

-'কিন্তু আপনি আরও কিছুদূর অগ্রসর হতে পেরেছেন। পদচিহ্নের ছাপ বিশেষভাবে প্রমাণিত করেছে দুটো সত্য। প্রথমত ঘটনাস্থলে মণিমোহনের উপস্থিতি। দ্বিতীয়ত হত ব্যক্তি নন্দ ছাড়া আর কেউ নয়। মামলাটা অনেকখানি হালকা হয়ে এল না কি?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কিন্তু মামলাটার আর একদিক আরও ভারী হয়ে উঠেছে।'

-'কীরকম?'

-'বলেছি তো, নন্দ ছিল কে. সরকারের বিখ্যাত জুয়েলারি ফার্মের ক্যাশিয়ার। সেখানে এক নতুন কাণ্ড হয়ে গিয়েছে!'

-'বুঝেছি। চুরি।'

সুন্দরবাবু সবিস্ময়ে বললেন, 'কেমন করে বুঝলে?'

জয়ন্ত রুপোর ডিবে বার করে এক টিপ নস্য গ্রহণ করলে। মানিক কৌতূহলী চোখে তার দিকে তাকাল। সে জানে, এই নস্য গ্রহণটা হচ্ছে তার বন্ধুর বিশেষ আনন্দের লক্ষণ।

সুন্দরবাবু আবার বললেন, 'কেমন করে বুঝলে তুমি?'

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, 'এটা আমার আন্দাজ মাত্র।'

-'বা রে, এমন যুক্তিহীন আন্দাজের কোনো কারণ নেই!'

-'কারণ আছে বই কী। আমার আন্দাজ মোটেই যুক্তিহীন নয়। লোকে অকারণে নরহত্যা করে না। কিন্তু গোড়া থেকেই এই হত্যাকাণ্ডের মধ্যে আমি কোনো উদ্দেশ্য খুঁজে পাচ্ছিলাম না। এখন বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, নন্দ মারা পড়েছে ওই টাকার জন্যেই। যদিও হত ব্যক্তি বিখ্যাত এক জুয়েলারি ফার্মের ক্যাশিয়ার শুনে একটা সন্দেহ আমার মনে উঁকি মারছিল! এখন জানা গেল, আমার সন্দেহ অমূলক নয়। সুন্দরবাবু, আন্দাজে আমি আরও একটা কথা বলতে পারি।'

-'পারো নাকি? বলে ফেলো।'

-'কে. সরকারের ফার্ম থেমে মোটারকম চুরি হয়ে গিয়েছে, আর চুরির জন্যে দায়ী ওই হত নন্দলাল।'

সুন্দরবাবু বিস্ফারিত চক্ষে তালে তালে তিন বার তালি দিয়ে বললেন, 'ঠিক! ঠিক! বা রে আন্দাজ! বা রে জয়ন্ত!'

জয়ন্ত বললে, 'এখন আসল ব্যাপারটা খুলে বলুন দেখি।'

-'কে. সরকার নিজে থানায় অভিযোগ করতে এসেছিল।'

-'কীসের অভিযোগ?'

-'চুরি বলেই ধরে নাও। চুরিটা হয়েছে হত্যাকাণ্ডের দিনেই। কে. সরকারের বসতবাড়ি আর দোকান এক জায়গায় নয়। তাঁর দোকান বন্ধ হত সন্ধ্যার মুখে। সেদিন দোকান বন্ধ হবার আগেই জরুরি কাজের জন্য তাঁকে বাড়িতে ফিরতে হয়েছিল। কথা ছিল, দোকানের ক্যাশ নিয়ে দোকান বন্ধ করে নন্দ তাঁর বাড়িতে জমা দিয়ে আসবে। কিন্তু নন্দ সেদিন ক্যাশ নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়েই একেবারে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।'

-'টাকার পরিমাণ কত?'

-'তেরো হাজার পাঁচ-শো পঞ্চাশ।'

-'নন্দের সম্বন্ধে কে. সরকারের ধারণা কী?'

-'অত্যন্ত উচ্চ। বললে, নন্দ অতিশয় বিশ্বাসী আর সৎচরিত্র। তার দ্বারা কোনরকমে অসৎ কাজ হওয়া অসম্ভব।'

-'ঠিক। আমারও ওই বিশ্বাস।'

-'জয়ন্ত, আরও একটা এমন ব্যাপার জানা গিয়েছে, যা তুমি কিছুতেই আন্দাজ করতে পারবে না।'

-'পদে পদে আন্দাজে ঢিল ছোড়ার অভ্যাস আমার নেই।'

-'লাশের পরনে যে গেঞ্জি আর কাপড় ছিল তা নন্দের নয়, মণিমোহনের।'

-'শুনে বিস্মিত হলুম না। নন্দের পরনে কোট বা অন্য কোনোরকম জামাও ছিল, অপরাধীরা তা খুলে নিয়ে গিয়েছে, প্রথম দিনেই আন্দাজে এ কথাটা আপনাকে বলেছিলাম। সুন্দরবাবু, দোকান থেকে নন্দ সেদিন বাসায় ফিরে এসেছিল?'

-'হ্যাঁ, তার বাসা দোকান থেকে কে. সরকারের বাড়িতে যাবার পথেই পড়ে। বাসায় এসে হাত-মুখ ধুয়ে কিছু খাবার খেয়ে আবার সে বেরিয়ে যায়-'

-'হ্যাঁ, মালিকের বাড়িতে টাকাগুলো পৌঁছে দেবার জন্যে। তারপরের ঘটনাগুলোও আমি কিছু কিছু আন্দাজ করতে পারছি।'

-'হুম, আবার আন্দাজ!'

-'নন্দ পথ দিয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ মণিমোহনের সঙ্গে দেখা। আমার বিশ্বাস, সে ছিল শালিখার চন্দ্রনাথের কালো রঙের বুইক-সিডান গাড়িতে আর গাড়ি চালাচ্ছিল চন্দ্রনাথ নিজেই। মণিমোহনের আহ্বানে নন্দ গাড়িতে এসে ওঠে। নন্দের কাছে কত টাকা আছে প্রকাশ পায়। তারপরের ব্যাপারগুলো ঠিক আন্দাজ করতে পারছি না। নন্দ গাড়িতে ওঠে সন্ধ্যার সময়ে, কিন্তু মারা পড়ে অন্তত রাত দুটোর পরে! মাঝের কয়েক ঘণ্টার হিসাব হত্যাকারী ধরা না পড়লে জানা যাবে না। নন্দকে হত্যা করে চন্দ্রনাথ আর মণিমোহন। আমার বিশ্বাস আসল হত্যাকারী হচ্ছে চন্দ্রনাথই, মণিমোহন বোধ হয় স্বহস্তে বন্ধু হত্যা করেনি। তারপর মৃতদেহের জামাকাপড় খুলে পরিয়ে দেওয়া হল মণিমোহনের জামাকাপড়। লাশের মুখ নিশ্চিহ্ন, তার দৈর্ঘ্য, রং আর গড়ন-পিটন প্রায় মণিমোহনের মতোই, তার পরনেও রইল মণিমোহনের জামাকাপড়। সুতরাং সেটা মণিমোহনের দেহ বলেই শনাক্ত হওয়া স্বাভাবিক, সকলে বুঝবে, কোনো অজানা ব্যক্তি অজানা কারণে মণিমোহনকে হত্যা করেছে। ওদিকে পুলিশ ভাবত নন্দ জুয়েলারি ফার্মের টাকা চুরি করে পলাতক হয়েছে। অপরাধীরা খুব মাথা খেলিয়ে প্ল্যান তৈরি করেছিল বটে, কিন্তু সব ব্যর্থ করে দিলে তুচ্ছ একটা জড়ুল আর কতকগুলো পায়ের দাগ। সুন্দরবাবু, এইবারে আপনার মামলাটা পরিষ্কার হয়ে গেল তো?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'তা তো গেল দেখছি। কিন্তু-'

জয়ন্ত বাধা দিয়ে বলল, 'কিন্তু আমার আর একটা আন্দাজ-এই কাজ হাসিলের পর চন্দ্রনাথ হয়তো মণিমোহনকেও হত্যা করেছে।'

-'হুম, আন্দাজেই তুমি কেল্লা ফতে করবে দেখছি। এখন চন্দ্রনাথকে হস্তগত করবার উপায়টাও আন্দাজে বাতলে দিতে পারো?'

এমন সময় মধু ঘরে ঢুকে বললে, 'শালখে থেকে একটি বাবু দেখা করতে এসেছেন।'

জয়ন্ত সচমকে বললে, 'শালখে থেকে? নাম বলেছে?'

-'আজ্ঞে হ্যাঁ। চন্দ্রনাথ রায়।'

সুন্দরবাবু বাঘের মতো লাফিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, 'হুম।'

অভিনেতা চন্দ্রনাথ

সত্য সত্যই কল্পনাতীত। পলাতক আসামি চন্দ্রনাথ নিজেই দেখা করতে এসেছে তাদের সঙ্গে। মামলাটার গোড়াতেই কোনো গলদ নেই তো? অবাক হয়ে ভাবতে লাগল জয়ন্ত ও মানিক।

সুন্দরবাবু খুশিভরা গলায় বললেন, 'আমাদের ভাগ্য ভালো। শিকার নিজেই জালে পড়তে চায়।'

জয়ন্ত বললে, 'সুন্দরবাবু এখন চন্দ্রনাথকে নিয়ে কী করবেন?'

-'আগে করব গোটা কয় প্রশ্ন। তারপর তাকে থানায় নিয়ে গিয়ে ঘটনাস্থলে পাওয়া তৃতীয় ব্যক্তির পদচিহ্নের সঙ্গে তার জুতো মিলিয়ে দেখব।'

জয়ন্ত বললে, 'মধু, বাবুকে এখানে নিয়ে এসো।'

মধুর প্রস্থান। অনতিবিলম্বেই ঘরের ভিতরে চন্দ্রনাথের আবির্ভাব।

সুন্দরবাবু লক্ষ করে দেখলেন মণিমোহনের পিতার বর্ণনার সঙ্গে তার চেহারা মিলে যায় অবিকল। প্রায় ছয় ফুট লম্বা বলিষ্ঠ ও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দেহ। নাক খ্যাঁদা, কুতকুতে চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। মুখে গোঁফ-দাড়ি নেই। পরনে প্যান্ট-কোট, হাতে বেজায় মোটা লাঠি। বাঁ-হাতে আধখানা কাটা কড়ে আঙুল।

দিব্যি নিশ্চিতভাবে ও সপ্রতিভ মুখে ঘরে ঢুকেই চন্দ্রনাথ বললে, 'আমি সুন্দরবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

-'আমার সঙ্গে? কিন্তু এখানে কেন? এটা কি আমার ডেরা?'

-'মোটেই নয়, মোটেই নয়। কে না জানে বাঘ থাকে বনে, আর পুলিশ থাকে থানায়? আমি থানাতেও ধরনা দিয়েছিলুম। সেখান থেকেই পেয়েছি এখানকার ঠিকানা।'

লোকটার প্রগলভতা দেখে সুন্দরবাবুর মনে হল ক্রোধের সঞ্চার। কিন্তু সে ভাব দমন করে তিনি শুধোলেন, 'আপনার নাম চন্দ্রনাথ রায়?'

-'তাই তো আমি জানি, লোকেও আমাকে ওই বলেই ডাকে বটে।'

তার কথাবার্তার ধরনধারণ বাড়িয়ে তুললে সুন্দরবাবুর ক্রোধের মাত্রা। বেশ একটু ঝাঁঝালো গলায় তিনি বললেন, 'মহাশয়ের পিতৃদেব কি অন্ধ ছিলেন?'

-'উঁহু।'

-'তবে মশাইকে কি স্বচক্ষে দেখে তিনি আপনার নাম রাখেননি?'

চন্দ্রনাথ নীরসকণ্ঠে হেসে উঠল-হা হা হা হা। বললে, 'ঠিক কথা। আমার গায়ের রংটা চাঁদের মতো নয় বটে! হাঁ, বাবার যে ভ্রম হয়েছিল সেকথা অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু কী করব বলুন, পিতা হচ্ছেন দেবতা স্থানীয়, পুত্র হয়ে তাঁর ভ্রম আর শোধরাবার চেষ্টা করিনি।'

-'বেশ, তাহলে বাপের সুপুত্রের মতো ওই চেয়ারখানার উপরে একটু বসুন দেখি, আমি গোটা কয় প্রশ্ন করতে চাই।'

চেয়ারখানা হড়হড় করে সুন্দরবাবুর খুব কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে চন্দ্রনাথ বসে পড়ল। তারপর মোটা লাঠিগাছা পদযুগলের মাঝখানে রেখে তার উপরে দুই হস্ত স্থাপন করে বললে, 'আপনার প্রশ্নগুলো শ্রবণ করবার জন্যে আমার দুই কর্ণ অতিশয় ব্যগ্র হয়ে উঠেছে।'

এ কীরকম ঢ্যাঁটা অপরাধী, পুলিশ দেখে দূরে সরে দাঁড়ানো দূরের কথা, পুলিশের গা ঘেঁষে বসতে ভয় পায় না! ভালো কথা নয় তো, যা দিনকাল পড়েছে, সাবধানের মার নেই। সুন্দরবাবু নিজেই তফাতে সরে গিয়ে দখল করলেন অন্য একখানা চেয়ার।

চন্দ্রনাথ হাসতে লাগল মুখ টিপে টিপে।

সুন্দরবাবু বললেন, 'হঠাৎ আমার সঙ্গে আপনার দেখা করবার শখ হল কেন?'

-'শুনলুম, সেদিন আমার বাড়িতে আপনি বেড়াতে গিয়েছিলেন?'

-'বেড়াতে নয়, আপনাকে খুঁজতে।'

-'বেশ তাই! কিন্তু কেন?'

-'নন্দলাল মিত্র খুন হয়েছে জানেন?'

-'কে নন্দলাল?'

-'একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন যে! মণিমোহন বসুর বিশেষ বন্ধু নন্দলালকে চেনেন না নাকি?'

-'না, আমি কেবল মণিমোহনকেই জানি।'

-'বটে। গেল পঁচিশ তারিখে মণিমোহনের সঙ্গে আপনার দেখা হয়নি?'

-'না।'

-'ওই তারিখে আপনি কোথায় ছিলেন?'

-'সন্ধ্যা পর্যন্ত বাসাতেই ছিলুম। তারপর হঠাৎ এক আত্মীয়ের মারাত্মক অসুখের খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি দেশে চলে যেতে হয়।'

-'চাকর, বামুন, দারোয়ান সবাইকে নিয়ে?'

-'নিশ্চয়ই। একলা মানুষ, আমাকে দেখবে কে?'

-'আপনার দেশ কোথায়?'

-'এখান থেকে চল্লিশ মাইল দূরে ভজনপুর গ্রামে।'

-'আপনার শটগান আছে?'

-'আছে! অন্যরকম বন্দুকও আছে।'

-'মণিমোহন আপনার বন্ধু?'

-'হ্যাঁ। নতুন বন্ধু।'

-'তাকে আপনি একখানা চিঠি লিখেছিলেন, পঁচিশ তারিখে আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে?'

-'হ্যাঁ।'

-'সে আপনার সঙ্গে দেখা করেছিল?'

-'না।'

-'ওই তারিখের পর তার সঙ্গে আপনার আর দেখা হয়েছে?'

-'না।'

-'সে এখন কোথায় আছে?'

-'জানি না।'

-'তার আর কোথায় আসা-যাওয়া আছে?'

-'ভগবান জানেন।'

-'ঘটনাস্থলে তিন জন লোকের পদচিহ্ন পাওয়া গেছে। মণিমোহনের আর নন্দলালের! কিন্তু তৃতীয় পদচিহ্নের অধিকারী কে, তা আমরা আবিষ্কার করতে পারিনি।'

-'শুনে দুঃখিত হলুম।'

-'আপনার দুঃখ নিয়ে আপনি চুলোয় গেলেও আমি দুঃখিত হব না! হুম! আমি এখন ভাবছি, কে এই তৃতীয় ব্যক্তি?'

-'বলতে পারব না, আমি গনতকার নই।'

-'আরে গেল, এ প্রশ্ন কি আপনাকে করছি? আমি কথা কইছি নিজের সঙ্গেই। নিজের মনের ভিতরেই আমি উত্তর খোঁজবার চেষ্টা করছি।'

-'চেষ্টা করুন। আপনার আর কোনো প্রশ্ন আছে?'

-'আপাতত নাই।'

-'তাহলে আমি গাত্রোত্থান করতে পারি?'

-'নিশ্চয়ই! এইবারে আপনাকে গাত্রোত্থান করতে হবেই।'

-'তবে এই গাত্রোত্থান করলুম।'

সুন্দরবাবুও আসন ত্যাগ করে বললেন, 'এইবারে আপনাকে আমার সঙ্গে যাত্রা করতে হবে।'

-'কোথায়?'

-'থানায়।'

চন্দ্রনাথ সভয়ে বলে উঠল, 'থানায় কেন?'

-'যথাসময়েই সেটা জানতে পারবেন।'

-'আপনার সব কথারই জবাব তো দিলুম। আবার আমাকে থানায় টেনে নিয়ে যাবার কারণ কী?'

-'কারণ? জলখাবার খাবার জন্যে নয়! ধরুন অকারণেই।'

এতক্ষণ পরে চন্দ্রনাথ যেন হারিয়ে ফেলল নিজের সমস্ত দৃঢ়তা ও নিশ্চিন্ততা। কাতর কণ্ঠে বললে, 'অকারণে আমাকে থানায় নিয়ে গিয়ে লাভ কী সুন্দরবাবু?'

সুন্দরবাবু নিজের বাহু বিস্তার করে সবলে ধারণ করলেন চন্দ্রনাথের দক্ষিণ বাহু। তারপরে বললেন, 'হুম! এখন সুড়সুড় করে আমার সঙ্গে চলুন তো। পরে ভাবা যাবে লাভ-লোকসানের কথা। আসি জয়ন্ত, আসি মানিক। খানিক পরেই ফোনে তোমাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করব। আসুন, অমাবস্যার দৃশ্যমান চন্দ্র!'

চন্দ্রনাথ কলের পুতুলের মতো চলে গেল সুন্দরবাবুর সঙ্গে।

জয়ন্ত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'মানিক, এইবারে আমরা মতামত বিনিময় করি এসো। চন্দ্রনাথ লোকটাকে তোমার কেমন লাগল?'

-'ভালো লাগল না।'

-'ঠিক। একেবারে পয়লা নম্বরের অপরাধীর চেহারা! আর একটা ব্যাপার লক্ষ করেছ?'

-'কী?'

-'চন্দ্রনাথ যতক্ষণ এখানে ছিল, একবারও সোজাসুজি তোমার আর আমার দিকে তাকায়নি! অথচ সে ছিল আমাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন।কারণ মাঝে মাঝে ওই বড়ো আয়নাখানার দিকে আড়চোখে চেয়ে দেখে নিচ্ছিল আমাদের।'

-'কিন্তু সে এখানে এসেছিল কেন?'

-'অভিনয় করতে।'

-'অভিনয় করতে?'

-'হ্যাঁ। আর সেই সঙ্গে নিজেকে নিরপরাধ বলে প্রমাণিত করতে।'

-'কিন্তু এ ভয় তো তার থাকা স্বাভাবিক যে, ঘটনাস্থলে পাওয়া তৃতীয় ব্যক্তির পদচিহ্নের সঙ্গে তার নিজের পদচিহ্নও মিলে যেতে পারে?'

-'তা পারে। এইখানেই আমার কেমন খটকা লাগছে। এমন সম্ভাবনার কথা যে তারও মাথায় জাগেনি, তাকে তো দেখে একটা নির্বোধ বলে মনে হল না। সুন্দরবাবু তো ওই জন্যেই তাকে থানায় ধরে নিয়ে

গেলেন।'

-'আর থানায় যাবার নামেই সে ভয়ে কীরকম জড়োসড়ো হয়ে পড়ল, লক্ষ করেছ তো?'

-'তা আবার করিনি? কিন্তু তা হচ্ছে অভিনয়, অভিনয়, অভিনয়। আসলে সে এতটুকুও ভয় পায়নি।'

-'কেমন করে জানলে?'

-'এখানে আসবার আগে সে নিজেই সুন্দরবাবুর খোঁজে থানায় গিয়ে হাজির হয়েছিল। সুতরাং থানায় যাবার নামে তার ভয় পাবার কোনোই কারণ থাকতে পারে না। সে ভয় পায়নি, ভয়ের অভিনয় করেছিল।'

-'কেন?'

-'বোধ হয়, সুন্দরবাবুকে সে একেবারে অপদস্থ করতে চায়! আমার মনে হয়, সে ভালো করেই জানে যে থানায় গিয়ে সুন্দরবাবু তার পদচিহ্ন পরীক্ষা করবেন।'

-'বল কী হে?'

-'হ্যাঁ। শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াবে জানো? ঘটনাস্থলের পদচিহ্নের সঙ্গে মিলবে না তার পদচিহ্ন। পুলিশ বনবে বোকা। সে হবে সমস্ত সন্দেহ থেকে মুক্ত। নিশ্চয় এই উদ্দেশ্য নিয়েই সে আজ সুন্দরবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। নইলে তার এই অভাবিত আবির্ভাবের কোনো অর্থই হয় না। যাকগে ওসব কথা। সুন্দরবাবু তো এখনও ফোন করলেন না দেখছি। আপাতত আমরা কী করি বলো তো? দু-এক চাল দাবা বোড়ে খেলবে নাকি?'

-'আপত্তি নেই।'

চলল খেলা। চল্লিশ মিনিট পরে প্রথম চাল খেলা শেষ হল। আর এক চালের জন্যে তারা ঘুঁটি সাজাচ্ছে, এমন সময়ে বেজে উঠল টেলিফোন।

রিসিভারটা তুলে নিয়ে জয়ন্ত বললে, 'হ্যালো?'

-'আমি সুন্দরবাবু।'

-'খবর কী?'

-'হুম, সব গুলিয়ে গেল।'

-'তা তো যাবেই।'

-'মানে?'

-'মানে চন্দ্রনাথের পদচিহ্ন পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হয়নি।'

-'কেমন করে জানলে?'

-'খুব সহজে। দুইয়ে দুইয়ে যোগ দিয়ে দেখলুম, চার হল।'

-'ধেৎ, হেঁয়ালি ভালো লাগে না! দস্তুরমতো অপদস্থ হয়েছি।'

-'ব্যাপারখানা কী?'

-'ঘটনাস্থলে তৃতীয় ব্যক্তির যে জুতোর ছাপ পাওয়া গিয়েছে, চন্দ্রনাথের জুতোর ছাপের চেয়ে তা বড়ো। চন্দুরে রাস্কেলটা আমার মুখের উপরে কলা দেখিয়ে হাড়-জ্বালানো হাসি হাসতে হাসতে চলে গেল।'

-'এটুকু তো তিন-চার মিনিটের ব্যাপার। আমাকে ফোন করতে আপনার এত দেরি হল কেন?'

-'হঠাৎ আরও দুটো খবর পেলুম। দ্বিতীয় খবরটা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।'

-'যথা-'

-'আমার সহকারী সুনীলকে নন্দলালের পাড়ায় তদন্ত করতে পাঠিয়েছিলুম। সে জানালে, ও পাড়ার এক মনিহারি দোকানের মালিক হত্যাকাণ্ডের দিন সন্ধ্যা বেলায় দেখেছিল, নন্দ পথ দিয়ে যাচ্ছে, এমন সময়ে একখানা মোটরগাড়ি তার কাছে এসে থামে। গাড়ির ভিতর থেকে মণিমোহন মুখ বাড়িয়ে নন্দকে ডাকে। নন্দ গাড়িতে ওঠে, গাড়িখানা চলে যায়।'

-'সুন্দরবাবু, আমার আন্দাজের সঙ্গে অনেকটা মিলছে, না?'

-'তা মিলছে।'

-'তারপর?'

-'গাড়ির ভিতর দুই জন লোক ছিল, মণিমোহন আর চালক। দোকানি কিন্তু চালকের দিকে নজর দেয়নি, তাকে শনাক্ত করতে পারবে না।'

-'কালো রঙের বুইক সিডান-গাড়ি?'

-'দোকানি বললে, কালো রঙের সিডান গাড়ি বটে, কিন্তু বুইক কি ফোর্ড কি অস্টিন তা বোঝবার মতো জ্ঞান তার নেই।'

-'গাড়ির নম্বর?'

-'দোকানি দেখেনি।'

-'সুন্দরবাবু, এ খবরে এইটুকু জানা গেল, আমার অনুমান নিতান্ত মিথ্যা নয়। এর ওপর নির্ভর করে আমরা চন্দ্রনাথের কিছুই করতে পারব না, কিন্তু ধাবমান হতে পারব মণিমোহনের পিছনে।'

-'আরও একটা উপায় হয়েছে।'

-'কীরকম?'

-'দ্বিতীয় খবরটা শুনলেই বুঝতে পারবে। আমাদের এক চর এসে খবর দিলে, খিদিরপুর ছাড়িয়ে গঙ্গার ধারে একখানা বাগানবাড়ির ভিতরে স্বচক্ষে সে মণিমোহনকে প্রবেশ করতে দেখেছে।'

-'কবে?'

-'আজই ভোর বেলায়।'

-'এখন কী করতে চান?'

-'বাড়িখানাকে চারদিক থেকে পাহারা দেবার জন্য জনকয় লোক পাঠিয়েছি। আমি সদলবলে যাত্রা করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি। তোমারও আসছ তো?'

-'সেকথা আবার বলতে।'

ভদ্রেশ্বর ভদ্র

খিদিরপুর। গঙ্গার ধার। বেলা প্রায় বারোটা, কিন্তু সূর্যকে ঢাকা দিয়ে রেখেছে মেঘলা আকাশ। মাঝে মাঝে পৃথিবীকে ধুয়ে দিয়ে যাচ্ছে দু-এক পশলা বৃষ্টি।

সদলবলে সুন্দরবাবু একখানি বাগানবাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন। পিছনে পিছনে জয়ন্ত ও মানিক।

পাঁচিলঘেরা প্রকাণ্ড এক বাগানের মাঝখানে সেকেলে বাড়ি। সেকেলে বাড়ি বটে, কিন্তু নিয়মিত সংস্কারের গুণে এখনও অব্যবহার্য হয়ে পড়েনি। বাগানের অংশটা নামেই বাগান, কোথাও ফুল গাছের কোনো চিহ্নও নেই। মধুলোভী মৌমাছি আর প্রজাপতিরা সেখানে উড়ে আসে বটে, কিন্তু হতাশ হয়ে আবার উড়ে পালায়। এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে আছে মোটা মোটা গুঁড়িওয়ালা বুড়ো বুড়ো গাছ-আম, কাঁঠাল, জাম, জামরুল, তাল, নারিকেল প্রভৃতি। আর আছে অগুনতি কলা গাছের ভিড়। আর শাকসবজির ছোটো-বড়ো খেত।

মানিক বললে, 'বাগানের মালিক যে শৌখিন নন, ফুল গাছের অভাবই তা প্রমাণিত করেছে। কিন্তু তিনি যে আমাদের সুন্দরবাবুর মতোই উদার পরায়ণ তাতে আর একটুও সন্দেহ নেই।'

সুন্দরবাবু দুই চক্ষে ফুটল বিস্ফোরণের লক্ষণ। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'একটুও সন্দেহ না থাকার কারণ?'

-'এখানে ফুল গাছ নেই, খালি ফল গাছ। এখানে শাকসবজির খেতে তেমন সুগন্ধ না থাকতে পারে, রন্ধনশালার মালমশলা আছে যথেষ্ট। আপনি কি রন্ধনশালাকে দুনিয়ার সবচেয়ে ভালো জায়গা বলে মনে করেন না?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই না। ওই যে জগন্নাথ আসছে। আমি এখন ওর সঙ্গেই কথা কইতে চাই।'

জয়ন্ত শুধোলে, 'জগন্নাথ কে?'

-'আমাদের চর। সেই-ই তো মণিমোহনকে এই বাড়িতে ঢুকতে দেখেছে।'

জগন্নাথ কাছে এসে নমস্কার করে বললে, 'বড়োবাবু মণিমোহন এখনও ওই বাড়ির ভিতরেই আছে।'

সুন্দরবাবু বললে, 'দেখো জগন্নাথ, আজ সকালেই এক বেটা চন্দুরে আমাকে যে ঠকানোটা ঠকিয়ে গিয়েছে তা আর বলবার নয়। একদিনে আমি দু-দু-বার ঠকতে চাই না। তুমি মণিমোহনকে ঠিক দেখেছ তো?'

-'আজ্ঞে মণিমোহনকে আগে আমি অনেকবার দেখেছি, তার চেহারা কি ভুলতে পারি? তবে আগে তাকে কোনোদিন কোট পরতে দেখিনি, আজ সে কোট পরে আছে।'

-'হুম, পুলিশের চোখে ধোঁকা দেবার চেষ্টা আর কি! আরে বাবা, এত সহজে কি পুলিশকে ফাঁকি দেওয়া যায়?'

মানিক বললে, 'বিশেষ করে আমাদের সুন্দরবাবুকে!'

সে কথা সুন্দরবাবু গায়ে মাখলেন না।

হঠাৎ জগন্নাথ চমকে চাপা গলায় বলে উঠল, 'বড়োবাবু, বড়োবাবু, ওই দেখুন মণিমোহনকে। আমাদের দিকেই আসছে!'

সুন্দরবাবু তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'সবাই গাছ কিংবা ঝোপের আড়ালে গা-ঢাকা দাও। এত সহজে কেল্লা ফতে! বরাত ভালো!'

মণিমোহন নতমুখে অসংকোচে এগিয়ে এল, কোনো সন্দেহ করতে পারলে না। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, একহারা কিন্তু বলিষ্ঠ দেহ। মুখশ্রীও মন্দ নয়।

হঠাৎ চারদিক থেকে পুলিশের দল তাকে ঘিরে ফেলল। ভ্যাবাচাকা খেয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সুন্দরবাবু বললেন, 'বাবাজি এখন ভিজে বেড়ালের মতো আমাদের সঙ্গে সুড়সুড় করে আসবে কি?'

-'কোথায়?'

-'আমাদের পোশাক দেখে বুঝতে পারছ না, আমরা তোমাকে কোথায় নিয়ে যেতে চাই?'

-'আপনারা তো পুলিশ।'

-'আর তুমি তো মণিমোহন বসু?'

-'আজ্ঞে না, এ নাম আমি জীবনে শুনিনি।'

জগন্নাথ এগিয়ে এসে বললে, 'না তুমিই মণিমোহন। তোমাকে আমি খুব চিনি।'

-'আমার নাম ভদ্রেশ্বর ভদ্র।'

-'হুম! আবার নাম ভাঁড়ানো হয়েছে? কিন্তু ও প্যাঁচটা খুবই পুরোনো, ধোপে ট্যাঁকে না। ভদ্রেশ্বর ভদ্র। কোনো আধুনিক ভদ্রলোকই ওরকম নাম ধারণ করতে পারে না। যাক ওকথা। এখন আমার প্রশ্নের জবাব দাও দেখি। এ বাগানবাড়ির মালিক নিশ্চয়ই তুমি নও?'

-'না। আমি ভাড়াটে। বাগানবাড়ির মালিক হচ্ছেন চন্দ্রনাথবাবু।'

-'কে?'

-'বাবু চন্দ্রনাথ রায়। তিনি শালখেয় থাকেন।'

সুন্দরবাবু একটি ছোটোখাটো লাফ মেরে বললেন, 'শুনছ জয়ন্ত? এখানেও আবার সেই অলুক্ষণে চন্দুরে। বাবু ভদ্রেশ্বর, তাহলে তুমি মণিমোহন ছাড়া আর কেউ নও!'

-'আমি ভদ্রেশ্বর ভদ্র।'

-'বেশ তোমার ভদ্রতার দৌড় কত বুঝতে দেরি লাগবে না। গাড়িখানা তুমি ভাড়া নিয়েছ কেন?'

-'আমার মিছরির কারখানা আছে। আর আছে আমার এক বন্ধুর মোটরের গ্যারাজ। সেখানে মোটর মেরামত হয়। আমি তার অংশীদার।'

-'তাই নাকি মণিমোহন? তুমি এখন একজন বিজনেসম্যানের ভূমিকায় অভিনয় করতে চাও।'

মণিমোহন হাসতে লাগল।

সুন্দরবাবু খেপে গিয়ে বললেন, 'কে তোমাকে অমন করে হাসতে শিখিয়ে দিলে? আজ সকালে চন্দুরেটাও ঠিক ওইরকম হাড়-জ্বালানো হাসি হেসে আমাকে ঠাট্টা করেছে। আর তুমি হাসলেই বা কেন? পুলিশ কি হাস্যকর জীব?'

মণিমোহন বললে, 'ভদ্রেশ্বরের ঘাড়ে মণিমোহন নাম চাপিয়ে দিলে ভদ্রেশ্বরের হাসি পাবে না কেন?'

-'তুমি যে মণিমোহন সেটা থানায় গিয়ে আমিই প্রমাণ করে দেব। এই বাড়িতে আরও কত লোক আছে?'

মণিমোহন বললে, 'আজ রবিবার, কারখানা বন্ধ। বাড়ির ভিতর ঝি চাকর রাঁধুনি ছাড়া আর কেউ নেই।'

সুন্দরবাবু তাঁর সহকারী ইন্সপেক্টরকে ডেকে বললেন, 'তুমি লোকজন নিয়ে খানাতল্লাসি করো। বাড়ির ভিতর থেকে কাউকে বাইরে বেরুতে দিয়ো না। আর জগন্নাথ-'

-'আজ্ঞে!'

-'তুমি দশ নম্বর বলাই শীল স্ট্রিটে মণিমোহনের বাড়িতে যাও। মণির বাবা মহেন্দ্রবাবুকে গিয়ে বলবে তাঁর ছেলেকে পাওয়া গিয়েছে। তাঁকে সঙ্গে করে থানায় ফিরে যাবে। চলো মণিমোহন, তুমি কত বড়ো ঘুঘু এইবার সেই পরীক্ষাই হবে। এসো জয়ন্ত, এসো মানিক!'

মণিমোহন বললে, 'বেশ মজা তো! কোন অপরাধে আমাকে থানায় নিয়ে যাবেন, তাও আমি জানতে পারব না?'

-'সব জেনেশুনে ন্যাকা সেজো না মণিমোহন। গেল পঁচিশ তারিখে রাত্রি বেলায় গড়ের মাঠে তুমি আর একজন লোকের সঙ্গে নন্দলাল মিত্রকে খুন করেছ। ঘটনাস্থলে তোমাদের পায়ের ছাপ পাওয়া গিয়েছে।'

মণিমোহন আবার হাসতে লাগল।

-'ফের হাসছ?'

-'পুলিশের মুখে রূপকথা শুনলে কার না হাসি পায়?'

-'রূপকথা মানে?'

-'কে এই নন্দলাল? ডি.এল. রায়ের হাসির কবিতার সেই বিখ্যাত নন্দলাল নয় তো? কিন্তু কে তাকে খুন করলে? তার কথা পড়ে আমরাই তো হেসে খুন হতুম!'

-'আবার রসিকতার চেষ্টা হচ্ছে? সেপাই, এই রসিক ব্যক্তিকে আমার গাড়িতে টেনে নিয়ে যাও তো।'

মণিমোহন বললে, 'টেনে নিয়ে যেতে হবে না। আমি জড়পদার্থ নই, সচল পদযুগলের সাহায্যে নিজেই গাড়িতে গিয়ে উঠতে পারি।'

-'তাই চলো তবে। এসো জয়ন্ত, এসো মানিক।'

জয়ন্ত বললে, 'আমরা যাব না। আমরা এখানকার খানাতল্লাসে যোগ দিতে চাই।'

সুন্দরবাবু বিস্মিত স্বরে বললেন, 'এ আবার কী শখ?'

-'শখ নয়, খেয়াল। মণিমোহনবাবু, আপনার এখানে ফোন আছে?'

-'আছে। কিন্তু কেন?'

-'হয়তো ব্যবহার করবার দরকার হবে!'

মণিমোহনের মুখের উপরে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল একটা দুর্ভাবনার ভাব। সে সহজ স্বরেই বললে, 'বেশ ব্যবহার করবেন। তবে কিনা, যথামূল্যে।'

-'যথামূল্যে কেন, দ্বিগুণ দিতে রাজি আছি। অগ্রিম।'

-'পরে পেলে চলবে। আপাতত আমি সুন্দরবাবুর দ্বারা পরীক্ষিত হবার জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছি। আসুন সুন্দরবাবু, অকারণে বিলম্ব করছেন কেন?'

সুন্দরবাবুর মাথা কেমন গুলিয়ে যেতে আরম্ভ করল। জয়ন্ত কেন এখানে থাকতে চায়-কাকে সে ফোন করতে চায়? আর মণিমোহনটা কি পাঁড়ঘুঘু রে বাবা, খুনের আসামি হয়েও থানায় যাবার জন্যে পুলিশকেই তাড়া লাগাচ্ছে!

এইসব ভাবতে ভাবতে সুন্দরবাবু প্রস্থান করলেন।

পরের দৃশ্য থানায়। চেয়ারাসীন সুন্দরবাবু। দুই জন পাহারাওয়ালার মাঝখানে দণ্ডায়মান মণিমোহন।

মণিমোহন বললে, 'পরীক্ষা শুরু করতে আজ্ঞা হোক।'

-'হুম, ভারি ব্যস্ত যে! তোমার বাবার জন্যেও একটু অপেক্ষা করতে পাচ্ছ না?'

-'আমার বাবা?'

-'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখনি তোমার বাবা এখানে আসবেন।'

-'মশাই কি ভূত নামাতেও জানেন?'

-'তার মানে?'

-'আমার বাবা স্বর্গে। সেখান থেকে কেমন করে তাঁকে এখানে আনবেন?'

-'একটু সবুর করলেই দেখতে পাবে। না, না, তার আগেও আর একটা পরীক্ষা করা যেতে পারে।'

-'করুন মশাই করুন। একটা থেকে এক-শোটা পর্যন্ত পরীক্ষা করতে পারেন। কিন্তু তার বেশি পরীক্ষা আমি দিতে পারব না।'

মনে মনে উত্তপ্ত হয়েও সুন্দরবাবু মুখে কিছু বললেন না। একটা কাগজের মোড়ক খুলে একজোড়া জুতো বার করে শুধোলেন, 'এই জুতোজোড়া চিনতে পারো?'

-'উঁহু। আমার জুতো-চেনা ব্যবসা নয়। আমি মিছরির ব্যাপারী।'

-'ঘটনাস্থলে তোমার পায়ের ছাপ পাওয়া গিয়েছে। বাড়ি থেকেই এই জুতো এনেছি-এ জুতো তোমারই। একবার জুতো জোড়া পায়ে পরো দেখি!'

মণিমোহন জুতোর ভিতর পা গলাবার চেষ্টা করে বলল, 'এ জুতো ছোটো। এর মধ্যে পা ঢোকানো অসম্ভব!'

সুন্দরবাবু ইঙ্গিতে পাহারাওয়ালা দু-জন মণিমোহনের পায়ে জোর করে জুতো পরাবার চেষ্টা করলে। তাদের চেষ্টাও সফল হল না।

সুন্দরবাবু দুই ভ্রূ সংকুচিত। মণিমোহনের কৌতুক-হাস্য।

ঠিক সেই সময়ে জগন্নাথের সঙ্গে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন মণিমোহনের পিতা মহেন্দ্রবাবু।

অকূলে যেন কূল পেয়ে সুন্দরবাবু শুধোলেন, 'মহেন্দ্রবাবু একে চেনেন?'

মণিমোহনের দিকে তাকিয়ে মহেন্দ্রবাবুর চোখ উঠল চমকে। আরও দুই পা এগিয়ে তার কাছে গিয়ে ভালো করে দেখে তিনি বললেন, 'না, এঁকে আমি চিনি না!'

-'এ কি মণিমোহন নয়?'

-'এঁকে প্রায় মণিমোহনের মতো দেখতে বটে, কিন্তু ইনি আমার পুত্র নন।'

সুন্দরবাবুর ভুঁড়ি যেন চুপসে গেল ছ্যাঁদা বেলুনের মতো। এবং ঠিক সেই সঙ্গেই বেজে উঠল টেলিফোন যন্ত্র। বিরক্তিভরে রিসিভারটা তুলে নিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে সুন্দরবাবু বললেন, 'হ্যালো।'

রিসিভারের ভিতর দিয়ে জয়ন্তের কণ্ঠ ভেসে এল-'জাগ্রত হোন সুন্দরবাবু। আসল মণিমোহনকে দেখতে চান তো বায়ুবেগে আবার বাগানবাড়িতে ছুটে আসুন!'

সুন্দরবাবুর চুপসে যাওয়া ভুঁড়ি আবার ফুলে উঠল। একসঙ্গে রিসিভার ও চেয়ার ত্যাগ করে তিনি চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'সেপাই আসামিকে লক-আপে নিয়ে যাও! এ বেটাও এই ঝাঁকের আর একটা ঘুঘু। খুব

হুঁশিয়ার!'

সালখের চন্দুরে

মানিক শুধোলে, 'জয়ন্ত এক যাত্রায় পৃথক ফল হল কেন? আমরাও তো সুন্দরবাবুর সঙ্গেই যেতে পারতুম।'

-'যেতে তো পারতুমই, কিন্তু যাওয়া আর হল কই?'

-'তুমি কি নতুন কোনো সূত্র আবিষ্কার করতে পেরেছ?'

-'কিছুই আবিষ্কার করতে পারিনি।'

-'তবে?'

-'মনে একটা সন্দেহ জাগছে!'

-'কী সন্দেহ?'

-'মণিমোহন স্বেচ্ছায় ধরা দিলে কেন?'

-'স্বেচ্ছায়?'

-'নিশ্চয়। সে খুনের মামলার পলাতক আসামি। এ বাড়িতে টেলিফোন আছে। তার বন্ধু চন্দ্রনাথ পুলিশের কার্যকলাপের কথা নিশ্চয় তাকে জানিয়েছে। এ সময়ে তার কতটা সাবধান হয়ে থাকবার কথা। তুমি কি বিশ্বাস কর, দিনের বেলায় বাগানের ভিতরে সদলবলে পুলিশের আবির্ভাব হল আর অতি জাগ্রত খুনের আসামি মণিমোহন তা জানতে পারেনি? অম্লান বদনে ভেড়ার মতো সুড়সুড় করে এসে সে আত্মসমর্পণ করলে! কেবলই কি আত্মসমর্পণ? তাড়াতাড়ি থানায় যাওয়ার জন্যে তার বিপুল আগ্রহও লক্ষ করলে তো?'

-'হ্যাঁ। কিন্তু তুমি কী বলতে চাও?'

-'এসব অস্বাভাবিক ব্যাপার। আমার দৃঢ় ধারণা, মণিমোহনের ইচ্ছা ছিল তাকে গ্রেপ্তার করেই আমরা এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাই।'

-'এমন অদ্ভুত ইচ্ছা তার হবে কেন?'

-'সে জানে, পুলিশ গ্রেপ্তার করেও তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে।'

-'ধেৎ, তাও কি সম্ভব। চন্দ্রনাথের কাছ থেকে সে নিশ্চয়ই শুনেছে পুলিশের কাছে তার পায়ের ছাপ আছে।'

-'খুব সম্ভব তার জুতোর সঙ্গে সে ছাপ মিলবে না!'

-'কী যে বলছ জয়ন্ত!'

-'খুব সম্ভব সে মণিমোহন নয়, অন্য কেউ!'

-'তুমি পাগল হয়ে গেলে নাকি? পুলিশের চর জগন্নাথ আগে থাকতেই মণিমোহনকে চেনে। সে নিজে তাকে শনাক্ত করেছে।'

-'সে মণিমোহন হলে কিছুতেই যেচে ধরা দিত না। যে খুনের আসামি পুলিশের ভয়ে লুকিয়ে থাকে, সে কখনো হাসতে হাসতে ধরা দেয়? অসম্ভব মানিক অসম্ভব!'

-'কিন্তু জগন্নাথ তাকে শনাক্ত করেছে।'

-'সে মণিমোহন নয় বটে, কিন্তু হয়তো প্রায় মণিমোহনেরই মতো দেখতে!'

মানিক বিস্ময়ে হতবাক।

জয়ন্ত বললে, 'এ ছাড়া এমন ব্যাপারের আর কোনো অর্থই হয় না। এই বাড়ির ভিতর নিশ্চয় কোনো রহস্য আছে, তাই জাল মণিমোহন আমাদের বিপথে চালনা করে এই বাড়ি থেকে দূরে নিয়ে যেতে চায়।'

-'কিন্তু সুন্দরবাবু বিপথগামী হলেও এখনও আমরা যথাস্থানেই বর্তমান আছি।'

-'হ্যাঁ মানিক। রহস্যভেদের ভার গ্রহণ করব আমরাই।'

-'কেমন করে?'

-'তা জানি না। ওই যে সাবইনস্পেকটর পরেশবাবু আমাদের দিকেই আসছেন। ওঁর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে খানাতল্লাসির ফল সন্তোষজনক হয়নি। . . . কী পরেশবাবু কতখানি অগ্রসর হলেন?'

পরেশবাবু হতাশভাবে বললেন, 'অগ্রসর কী মশাই! এখন আমাদের সুন্দরবাবুর পশ্চাদগামী হতে হবে।'

-'খানাতল্লাস করে সন্দেহজনক কিছুই পেলেন না বুঝি?'

-'কিছু না, কিছু না।'

-'তাই থানায় ফিরে যেতে চান?'

-'তা ছাড়া আর কী! এখানে বসে আর অশ্বডিম্বে তা দিয়ে কী হবে? এর চেয়ে বাড়িতে ফিরে ভ্যারেন্ডা ভাজা ভালো।'

-'বাড়ির লোকজনদের পরীক্ষা করেছেন?'

-'করেছি। লোকজন তো ভারি! দুটো বেহারি চাকর, একটা উড়িয়া বামুন, একটা বুড়ি, আর একটা ছুঁড়ি ঝি। ছুঁড়িটা দেশ থেকে নতুন এসেছে। এত লজ্জা যে কথা কইবে কী, মুখের ঘোমটা খুলতেও নারাজ।'

-'আপনার লোকজন কোথায়?'

-'তাদের গাড়িতে বসতে বলে আমি আপনাদের ডাকতে এসেছি।'

জয়ন্ত হঠাৎ সক্রোধে গর্জন করে উঠল, 'পরেশবাবু!'

মানিক চমকে উঠল। জয়ন্ত তো সহজে এমন বিচলিত হয় না। পরেশও হতভম্ব!

-'পরেশবাবু, আপনি অত্যন্ত অন্যায় করেছেন-এসো মানিক, শিগগির। মানিকের হাত ধরে টেনে জয়ন্ত দ্রুতপদে অগ্রসর হল এবং যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে পরেশবাবুকে বলে গেল, 'তাড়াতাড়ি বাড়ির চারদিকে আবার পাহারা বসান।'

পরেশবাবু মাথা চুলকাতে চুলকাতে নিজের মনেই বললেন, 'বড়োবাবু বলেন জয়ন্তবাবুর মাথায় ছিট আছে! কথাটা মিথ্যা নয়। শখের গোয়েন্দা হয়ে কিনা আসল পুলিশকে ধমক দেয়! কী আর করব, বড়োবাবুই ওকে মাথায় তুলেছেন।'

জয়ন্ত ও মানিক বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করল। কয়েক পদ অগ্রসর হয়ে দেখল, দালান ও উঠান এবং দালানের কোণে দ্বিতলে ওঠবার সিঁড়ি।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে তারা দোতলার দালানের উপরে গিয়ে দাঁড়াল। দালানের একপাশে দাঁড়িয়ে কয়েকজন স্ত্রী-পুরুষ জটলা করছিল। তাদের দেখেই তারা একেবারে চুপ মেরে গেল। একটি অল্পবয়স্ক স্ত্রীলোক তাড়াতাড়ি মুখে ঘোমটা টেনে দিয়ে জড়োসড়ো হয়ে রইল।

প্রায় মিনিট খানেক স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে থেকে জয়ন্ত বললে, 'তোমাদের কেউ একবার এদিকে এগিয়ে এসো তো!'

একটা বুড়ি এগিয়ে এল পায়ে পায়ে।

জয়ন্ত শুধাল, 'তুমি কে?'

-'আমি এ বাড়ির পুরানো ঝি।'

-'তোমার নাম কী?'

-'ভালোর মা।'

-'আর ওই মেয়েটি?'

-'ও আমাদের নতুন ঝি। দিন তিনেক হল দেশ থেকে এসেছে।'

-'হ্যাঁগো বাছা নতুন ঝি, তোমার নাম কী?'

সে ফিসফিস করে কী বললে শোনা গেল না।

ভালোর মা বললে, 'ওর নজ্জা বাবু। ওর নাম হরিদাসী।'

-'আচ্ছা ভালোর মা, তোমাদের টেলিফোন আছে কোন ঘরে?'

ভালোর মা দেখিয়ে দিলে অঙ্গুলি নির্দেশে সিঁড়ির ডান পাশে টেলিফোনের ঘর।

-'দেখো ভালোর মা, তোমরা সবাই এইখানে দাঁড়িয়ে থাকো। আমি টেলিফোনের কাজ সেরে তোমাদের সঙ্গে কথা কইব।'

জয়ন্তের সঙ্গে মানিক টেলিফোনের ঘরে গেল। পাঠকদের নিশ্চয় মনে আছে, জয়ন্ত সুন্দরবাবুকে এই কথাই জানিয়ে দিলে যে-জাগ্রত হোন সুন্দরবাবু! আসল মণিমোহনকে দেখতে চান তো বায়ুবেগে আবার বাগানবাড়িতে ছুটে আসুন।

মানিক বিস্মিত কণ্ঠে বললে, 'কোথায় আছে আসল মণিমোহন?'

-'এই বাড়িতেই।'

-'তাকে তুমি দেখেছ?'

-'হ্যাঁ, তুমিও দেখবে এসো।'

দু-জনে আবার দালানে গিয়ে উপস্থিত। ভালোর মা প্রভৃতি তখনও দাঁড়িয়ে আছে।

তাদের উপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে জয়ন্ত বললে, 'ভালোর মা, তোমাদের সকলকেই আমি এইখানেই হাজির থাকতে বললুম না।'

-'আমরা তো হাজির আছি বাবু।'

-'কিন্তু হরিদাসী কোথায়?'

-'সেও আছে।'

-'কোথায় আছে? আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?'

-'সে বাসন মাজতে গিয়েছে।'

-'কোথায়? কলতলায়?'

-'না, খিড়কির পুকুরে।'

-'তোমাদের আবার খিড়কির পুকুর আছে বুঝি? কিন্তু কোন দিক দিয়ে সে গেল? ফোন করতে করতে আমি সিঁড়ির উপরে চোখ রেখেছিলাম, ওখান দিয়ে কেউ যায়নি।'

-'আমাদের অন্দরমহলে আর একটা সিঁড়ি আছে।'

জয়ন্তের মুখে ফুটে উঠল দারুণ হতাশা, কিন্তু সহজ স্বরেই সে বললে, 'আমাকে খিড়কির পুকুরে নিয়ে চলো।'

ছোটো একটা পুকুর। নোংরা জল। ভাঙা ঘাট। চারপাশেই আগাছার ভিড়। কিন্তু সেখানেও হরিদাসীর পাত্তা মিলল না।

জয়ন্ত কঠিন স্বরে বললে, 'এরপর তুমি কী বলতে চাও ভালোর মা?'

ভালোর মা ভয়ে ভয়ে বললে, 'কী জানি বাবু, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না!'

জয়ন্ত তিক্ত স্বরে বললে, 'দেখছ মানিক, নিরেট পরেশটা বাড়ির চারিদিকে এখনও পাহারা বসায়নি? সে-ই হচ্ছে যত অনিষ্টের মূল। তার উপরে নির্ভর করেই আমি হরিদাসীকে ছেড়ে ফোন করতে গিয়েছিলাম।'

-'কিন্তু হরিদাসী কে?'

-'সে কথার জবাব একটু পরে দেব। আপাতত ভালোর মাকে তোমার জিম্মায় রেখে আমি একটু উদ্যান-ভ্রমণ করে আসি।'

জয়ন্ত চলে গেল দ্রুতপদে।

অনতিবিলম্বে ব্যস্তভাবে এসেই সুন্দরবাবু বলে উঠলেন, 'মানিক, তুমি একা কেন?'

-'জয়ন্ত উদ্যান-ভ্রমণে গিয়েছে।'

-'এই কি উদ্যান-ভ্রমণের সময়? কোথায় তোমাদের আসল মণিমোহন?'

-'ওই যে জয়ন্ত আসছে, ওকেই জিজ্ঞাসা করুন।'

-'জয়ন্ত, মণিমোহন কোথায়?'

একখানা শাড়ি আর একটা সেমিজ মাটির উপর নিক্ষেপ করে জয়ন্ত বললে, 'জামাকাপড় আমাদের উপহার দিয়ে মণিমোহন এখান থেকে প্রস্থান করেছে।'

-'আরে হুম! এ তো দেখছি স্ত্রীলোকের জামাকাপড়!'

-'হ্যাঁ সুন্দরবাবু, মণিমোহন স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশেই বাড়ির ভিতরে লুকিয়েছিল। তারপর নারীর খোলস ত্যাগ করে বাগানের পাঁচিল ডিঙিয়ে লম্বা দিয়েছে। এর জন্য দায়ী হচ্ছেন আপনাদের পরেশবাবু। তিনি সেপাইদের সরিয়ে নিয়ে না গেলে এ বিপত্তি ঘটত না।'

রাগে ফুলতে ফুলতে সুন্দরবাবু বললেন, 'বটে, বটে! আচ্ছা, তার সঙ্গে পরে বোঝাপড়া করব। কিন্তু তুমি মণিমোহনকে চিনতে পারলে কেমন করে?'

জয়ন্ত বললে, 'মণিমোহন এখানে দাসী হরিদাসী সেজেছিল। সে নাকি পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, সবে কলকাতায় এসেছে, এখনও লজ্জা ভাঙেনি, বাইরের লোক দেখলেই ঘোমটা টেনে বোবা হয়ে থাকে। আমাদের দেখে ও চট করে ঘোমটা টেনে দিলে, আমিও কিন্তু তার আগেই চট করে হরিদাসীর মুখ দেখে নিলুম। সে মুখ হরিদাসীর মুখ নয় দেখতে প্রায় ভদ্রেশ্বর ভদ্রের মতো।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'মহেন্দ্রবাবু বললেন, ভদ্রেশ্বরের মুখ নাকি প্রায় তাঁর ছেলে মণিমোহনেরই মতো দেখতে। এইজন্যেই জগন্নাথ তাকে মণিমোহন বলে ভ্রম করে আমাদের নাকানিচোবানি খাইয়ে মেরেছে।'

-'হ্যাঁ সুন্দরবাবু, জগন্নাথের ভ্রমের কথা আমি আগেই আন্দাজ করতে পেরেছিলাম। হরিদাসীর পুরুষের দ্বিতীয় প্রমাণ পেলুম তার পা লক্ষ করে। জানেন তো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনাবৃত পা দেখলেই খুব সহজেই ধরা যায় যে, কে নারী আর কে নয়? তার উপরে হরিদাসীর আঙুলে আর গোড়ালিতে ছিল বড়ো বড়ো কড়া। পাড়াগেঁয়ে গরিবের মেয়ে জুতো পরে না, পায়ে কড়া পড়বে কেন? সে কথা কয় ফিসফিস করে, এও সন্দেহজনক। লজ্জার ছুতো বাজে, সে নিজের পুরুষ কণ্ঠ চাপা দিতে চায়। সুন্দরবাবু, আপনার সহকারী পরেশবাবু নিশ্চয় খুব হুঁশিয়ার ব্যক্তি নয়, নইলে এতগুলো প্রমাণ তাঁর নজর এড়িয়ে যায়?'

সুন্দরবাবু দুঃখিতভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'সবই আমার অদৃষ্ট ভাই! জাল ছিঁড়ে মাছ পালিয়ে যাবে বারবার! তার উপরে দেখো না, মন বলছে, শালখের ওই চন্দুরে বেটাই হচ্ছে এই দলের মোড়ল, অথচ তার বিরুদ্ধে একটা প্রমাণও জোগাড় করতে পারছি না।'

জয়ন্ত মুখ টিপে একটু হেসে বললে, 'বিলাতি প্রবাদে বলে, শয়তানের কথা ভাবলেই শয়তানের উদয় হয়! ওই দেখুন কে আসছে!'

সুন্দরবাবু ফিরে বিস্ফারিত চক্ষে দেখলেন হাতের মোটা লাঠিগাছা ঘোরাতে ঘোরাতে, হেলতে হেলতে, দুলতে দুলতে এবং হাসতে হাসতে এগিয়ে আসছে শালিখার চন্দ্রনাথ রায়।

দু-জন বেপরোয়া লোক

আগতপ্রায় চন্দ্রনাথের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে মাথা চুলকোতে চুলকোতে সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম!'

চট করে কী ভেবে জয়ন্ত তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'সুন্দরবাবু, হুম বলে থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন না। শিগগির বাড়ির ভিতর যান।'

-'কেন বলো দেখি? চন্দুরের ভয়ে?'

-'ভয়ে নয়, আপনাকে থানায় একটা ফোন করতে হবে।'

-'কী জন্যে?'

-'সেপাইদের জিম্মায় ভদ্রেশ্বরকে একবার এখানে নিয়ে আসুন, আমি তাকে গুটি কয় প্রশ্ন করব।'

-'উত্তম।'

-'দাঁড়ান। আর একটা কথা। সেই সঙ্গে মণিমোহনের জুতোর ছাঁচও পাঠিয়ে দিতে বলবেন।'

-'এখানে? কেন হে?'

-'সেকথা বলবার সময় নেই। ওই চন্দ্রনাথ এসে পড়েছে।'

সুন্দরবাবুর প্রস্থান। চন্দ্রনাথ বুক ফুলিয়ে কাছে এসে দাঁড়াল। মুখ টিপে হাসতে হাসতে শুধোলে, 'সুন্দরবাবু সরে পড়লেন কেন? আমার চন্দ্রবদন দেখতে রাজি নন?'

মানিক হেসে বললে, 'মশাই কি নিজের বদনকে চন্দ্রবদন বলে সন্দেহ করেন?'

চন্দ্রনাথ আরও জোরে হেসে উঠে বললে, 'না মশাই, তা করি না। পিতার ভ্রমে নামেই আমি চন্দ্রনাথ। আর সত্য কথা বলতে কী, চন্দ্রবদনের মালিক হলে আমি সুখী হতুম না।'

-'দুঃখিত হতেন?'

-'ঠিক তাই। পূর্ণচন্দ্রের বদন আকাশেই মানায়। ওরকম অখণ্ড-মণ্ডলাকার বদন কোনো মানুষকেই সুখী করতে পারে না। যাক সে কথা। এখন আপনারা কে বলুন দেখি, মানিকজোড়ের মতো সর্বদাই সুন্দরবাবুর আশেপাশে বিরাজ করেন?'

-'ঠিক ধরেছেন। আমার নাম মানিকই বটে, আর জয়ন্তও আমার জোড়াই বটে।'

-'নাম তো শুনলুম, এখন পরিচয়টাও দিতে আজ্ঞা হয়।'

-'ওই সুন্দরবাবু আসছেন। আমাদের পরিচয় ওর মুখেই শুনতে পাবেন।'

কিন্তু সুন্দরবাবুর কাছ থেকে জয়ন্ত ও মানিকের পরিচয় জানবার জন্য চন্দ্রনাথ কোনো আগ্রহই প্রকাশ করলে না। হাত জোড় করে নমস্কার করে যেন ব্যঙ্গর স্বরেই বললে, 'আসুন সুন্দরবাবু।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রতিনমস্কার করে সুন্দরবাবু অপ্রসন্ন স্বরে বললেন, 'হুম, এই আমি এসেছি। কিন্তু আপনি এখানে এসেছেন কেন?'

-'কী আশ্চর্য প্রশ্ন!'

-'আশ্চর্য প্রশ্ন?'

-'কেবল আশ্চর্য নয়, যুক্তিহীন প্রশ্ন।'

-'মানে?'

-'আমি এখানে আসব না তো, আসবে কে? আপনি বোধ হয় জানেন না, এ বাড়ির মালিক হচ্ছি আমি।'

-'খুব জানি বাবা, খুব জানি! আর জানি বলেই তো আজ আপনাকে আমি গ্রেপ্তার করব।'

-'গ্রেপ্তার করবেন? আমি এই বাড়ির মালিক বলে আমাকে আপনি গ্রেপ্তার করবেন?'

-'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ!'

-'না, না, না। বাড়ির মালিক হওয়াও অপরাধ নাকি?'

-'যে বাড়ির ভিতরে খুনি আসামি আশ্রয় পায়, তার মালিক হওয়া অপরাধ বই কী!'

-'কে খুনি আসামি?'

-'আপনার সাঙাত মণিমোহন।'

-'তার সঙ্গে এ বাড়ির সম্পর্ক কী?'

-'সে এখানে ছদ্মবেশে লুকিয়েছিল।'

-'আমি একথা বিশ্বাস করি না। আর একথা সত্য হলেও আপনি আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারেন না।'

-'পারি না নাকি!'

-'না। আমি এই বাড়ির মালিক বটে, কিন্তু এখানা ভাড়া দিয়েছি ভদ্রেশ্বরবাবুকে। আজ তাঁর কাছে আমি ভাড়ার টাকা আদায় করতে এসেছি। ভদ্রেশ্বরবাবুর বাড়ির ভিতর কে থাকে, তার কোনো খবরই আমি রাখি না। কোন আইন অনুসারে আপনি আমাকে গ্রেপ্তার করবেন? চুপ করে রইলেন কেন, বলুন? কোন আইন

আনুসারে আপনি আমাকে গ্রেপ্তার করবেন সুন্দরবাবু? এখনও বোবা হয়ে রইলেন? হা হা হা হা! গ্রেপ্তার করবেন! গ্রেপ্তার করলেই হল!'

সুন্দরবাবুর হতাশ ভাব। অসহায়ের মতো তিনি তাকালেন জয়ন্তের মুখের পানে।

জয়ন্ত বললে, 'না চন্দ্রবাবু, আপনাকে কেউ গ্রেপ্তার করতে পারে না, সুন্দরবাবু বলেছিলেন কথার কথা মাত্র। ওকথায় আপনি কান দেবেন না। ওই দেখুন আর একখানা জিপগাড়ি বাগানের ভিতরে এসে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে কে নামছে? ভদ্রেশ্বরবাবু না?'

সুন্দরবাবুর মুখ কিঞ্চিৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিন্তু ওদিকে তাকিয়ে অনুচ্চস্বরে তিনি বললেন, 'ভদ্রেশ্বর বেটাও আসছে ঠিক চন্দুরের মতো বুক ফুলিয়ে বেপরোয়াভাবে। এমন দু-জন বেপরোয়া লোককে সচরাচর একসঙ্গে দেখা যায় না। এ আমি কোথায় এসে পড়েছি বাবা!'

কাছে এসে একগাল হেসে ভদ্রেশ্বর বললে, 'আরে সুন্দরবাবু! মশাই, এত তাড়াতাড়ি আপনি যে আমাকে বাসায় ফিরতে দেবেন, আমি ভাবতেই পারিনি। তারপর? আপাতত এদিককার খবর সব ভালো তো?'

সুন্দরবাবু গুম হয়ে গিয়ে বললেন, 'মোটেই ভালো নয়-অন্তত তোমার পক্ষে।'

ভদ্রেশ্বর চক্ষু বিস্ফারিত করে যেন সভয়েই বললে, 'অ্যাঁ, বলেন কী! খবর আমার বিপক্ষে?'

-'হুম তাই। খবর তোমার বিপক্ষেই বটে।'

-'হায় হায়! কেন এমনটা হল?'

-'তুমি খুনি আসামি মণিমোহনকে এই বাড়ির ভিতরে লুকিয়ে রেখেছিলে।'

-'বটে, বটে, বটে! মণিমোহন নামধেয় সেই কাল্পনিক ব্যক্তিটি এখনও আপনার ঘাড় ছেড়ে নামতে রাজি হয়নি? একটু আগেই আমি ছিলুম মণিমোহন। এখন স্থির করেছেন, মণিমোহন এই বাড়ির ভিতরে লুকিয়ে আছে।'

-'না, এখন সে বাড়ির ভিতর নেই। সে লম্বা দিয়েছে।'

-'আপনার চোখে ধুলো দিয়ে?'

-'এ জন্যেও তুমি দায়ী! মণিমোহনের সঙ্গে তোমার চেহারার খানিকটা মিল আছে। সেই সুযোগ গ্রহণ করে তুমি যদি আমাকে ভুলিয়ে এখান থেকে সরিয়ে না নিয়ে যেতে, তাহলে মণিমোহন কখনোই পালাতে পারত না।'

-'যত দোষ নন্দ ঘোষ। মশাই, আমার আর রূপকথা শোনবার বয়েস নেই। পথ দেখুন কিংবা পথ ছাড়ুন। আমাকে বাড়ির ভিতরে যেতে দিন।'

-'বাড়ির ভিতরে যাবে মানে! মামার বাড়ির আবদার নাকি! তোমাকে আমাদের সঙ্গে আবার থানায় যেতে হবে।'

-'কেন?'

-'কতবার বলব? খুনি আসামিকে তুমি লুকিয়ে রেখেছিলে।'

-'কোথায় সে? প্রমাণ দেখান।'

-'সে এখানে হরিদাসী নাম নিয়ে স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে লুকিয়ে ছিল।'

ভদ্রেশ্বর আগে হা-হা করে খুব খানিকটা হেসে নিলে। তারপর বললে, 'বাহবা! মণিমোহন আগে ছিল শ্রীমান ভদ্রেশ্বর, কিন্তু এখন সে হয়েছে শ্রীমতি হরিদাসী? চমৎকার! মশাই গাঁজা-টাজা খান না তো?'

-'চোপরাও বদমাইশ!'

-'মোটেই চুপ করব না। হরিদাসীকে আগে এখানে নিয়ে আসুন।'

-'পুলিশ দেখে সে পালিয়ে গিয়েছে কেন?'

-'পালিয়ে গিয়েছে বলেই ধরে নিতে হবে সে স্ত্রীলোক নয় পুরুষ, হরিদাসী নয়, মণিমোহন? এটা কোন দেশের যুক্তি? হরিদাসী পাড়াগেঁয়ে ভীতু মেয়ে, নতুন শহরে এসেছে, পুলিশ দেখে সে তো ভয়ে পালিয়ে

যাবেই।'

সুন্দরবাবুর অবস্থা আবার অসহায় হয়ে পড়ল। জয়ন্তকে একটু তফাতে নিয়ে গিয়ে নিম্নস্বরে বললে, 'ভায়া, যেমন ওই চন্দুরেটা, তেমনি এই ভদ্রেশ্বর-দু-বেটাই মাছের মতো পিছল, ধরলেও হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে যায়। তোমার কথাতেই ওকে এখানে নিয়ে এসেছি, এখন তুমিই ওর মুখ বন্ধ করার ব্যবস্থা করো।'

জয়ন্ত বললে, 'বেশ তাই করছি। আমি আর একবার বাড়ির ভিতরে যাব। ততক্ষণে আপনি মণিমোহনের জুতোর ছাঁচ গাড়ি থেকে আনিয়ে রাখুন। এসো মানিক।'

দোতলার দালানে দাস-দাসীরা তখনও দাঁড়িয়েছিল।

জয়ন্ত বললে, 'হ্যাঁ ভালোর মা, হরিদাসী কি রাতে তোমার সঙ্গেই শুত?'

ভালোর মা বললে, 'না বাবু, সে শুত একলা অন্য ঘরে।'

-'বেশ, সে ঘরখানা একবার আমরা দেখতে চাই।'

ভালোর মা তাদের ভিতরে মহলে নিয়ে গিয়ে একখানা ঘর দেখিয়ে দিল।

ঘরের ভিতরে ঢুকে মানিক বললে, 'জয়ন্ত, কী উদ্দেশ্যে তুমি এ ঘরখানা দেখতে চাও?'

জয়ন্ত বললে, 'মানিক, কায়ার পিছনে ছায়ার মতো কেবল আমার সঙ্গে সঙ্গে থেকে কোনোই লাভ নেই। যা স্বচক্ষে দেখছ আর স্বকর্ণে শুনছ, তা নিয়ে তোমারও স্বাধীন চিন্তাশক্তি ব্যবহার করা উচিত। এ ঘরে যে একবার আমাদের আসতেই হবে, আমি তা আগে থাকতেই জানতুম। আর সেই জন্যেই থানা থেকে মণিমোহনের পদচিহ্নের ছাঁচ এখানে আনিয়ে রেখেছি।'

মানিক বললে, 'তুমি কি এই ঘরের মেঝেতে মণিমোহনের নতুন পদচিহ্ন আবিষ্কার করতে চাও?'

-'সে চেষ্টা বোধ হয় সফল হবে না।'

-'তবে?'

-'হরিদাসী যে পুরুষ, এটা আমার সন্দেহ মাত্র। কিন্তু আসল প্রশ্ন হচ্ছে, পুরুষ হলেও সে সত্য সত্যই মণিমোহন কি না? এই ঘরে এই প্রশ্নের উত্তর পাবার সম্ভাবনা আছে।'

-'যুক্তিটা মাথায় ঢুকছে না।'

-'নিরেটদের মাথায় পেরেকও ঢোকে না। সুন্দরবাবুর সঙ্গগুণে তুমি একটি নিরেট হয়ে উঠছ। নির্বোধ, হরিদাসী যদি ছদ্মবেশী পুরুষ হয় তাহলে এই ঘরে নিশ্চয়ই তার পুরুষ বেশ ধারণের উপকরণ খুঁজে পাওয়া যাবে। পুলিশের ভয়ে তাড়াতাড়ি পালাবার সময়ে সেগুলো যে সে নিয়ে যেতে পারেনি, তাতে আর কোনোই সন্দেহ নেই। হ্যাঁ, যা ভেবেছি তাই। টেবিলের উপরে রয়েছে রুপোর সিগারেট কেস আর দেশলাই। আলনায় দু-খানা শাড়ি, একটা সেমিজ আর একটা ব্লাউজ ঝুলছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে রয়েছে দু-খানা ধুতি আর দুটো পাঞ্জাবিও। মানিক, হরিদাসী পুরুষই বটে!'

মানিক বললে, 'কিন্তু সে মণিমোহন কি না?'

সিগারেট কেসটা টেবিলের উপর থেকে তুলে নিয়ে মানিকের সামনে ধরে জয়ন্ত বললে, 'দেখো। এর উপরে ইংরাজিতে খোদা রয়েছে এম। ওটা মণিমোহনের নামের আদ্যঅক্ষর বলে গ্রহণ করা যেতে পারে কি না?'

মানিক সায় দিয়ে বললে, 'হ্যাঁ, এটা একটা বড়ো প্রমাণ।'

এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করে ও এটা-ওটা-সেটা নিয়ে নাড়ানাড়ি করতে করতে জয়ন্ত বললে, 'তবু আমি যা খুঁজছি তা পাচ্ছি না। তারপর হেঁট হয়ে পড়ে খাটের তলায় দৃষ্টিচালনা করে জয়ন্ত উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে উঠল 'পেয়েছি মানিক, পেয়েছি।'

-'কী?'

-'খাটের তলায় রয়েছে একজোড়া জুতা। ব্যাস, আপাতত আমাদের খোঁজাখুঁজি শেষ। মানিক, জুতো জোড়া খাটের তলা থেকে টেনে নিয়ে আমার সঙ্গে চলে এসো।'

বাগানে নেমে এসে তারা দেখলে, ভদ্রেশ্বর তখনও সুন্দরবাবুর সঙ্গে কথা কাটাকাটি করছে এবং চন্দ্রনাথ আপনমনে পায়চারি করছে সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবেই।

সুন্দরবাবু অধীর স্বরে বললেন, 'ভাই জয়ন্ত, এই ঠোঁটকাটা ভদ্রেশ্বরের লেকচার আর আমি সহ্য করতে পারছি না। এর মুখ বন্ধ করবার কোনো উপায় পেয়েছ কি?'

মৃদু হাস্য করে জয়ন্ত বললে, 'বোধ হয় পেয়েছি! মণিমোহনের জুতোর ছাঁচ কোথায়?'

-'এই যে ভাই, এই যে।'

খিলখিল করে হেসে উঠে ভদ্রেশ্বর বললে, 'আবার ওই ছাঁচের সঙ্গে আমার জুতো মেলানো হবে নাকি?'

জয়ন্ত বললে, 'মোটেই নয়। মণিমোহনের জুতোর ছাঁচের সঙ্গে আমি এই জুতো জোড়া মিলিয়ে দেখব।'

ভদ্রেশ্বর সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বললে, 'ও কার জুতো?'

ছাঁচের সঙ্গে জুতো মেলাতে মেলাতে জয়ন্ত বললে, 'বাঃ, অবিকল মিলে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এ হচ্ছে মণিমোহনের জুতো, পাওয়া গিয়েছে হরিদাসীর ঘরে।'

সুন্দরবাবু সহর্ষে এবং সদম্ভে বলে উঠলেন, 'হুম! হুম! বার বার ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান-'

চন্দ্রনাথ সহসা বললে, 'ভদ্রেশ্বরবাবু এখন আমি চললুম। ভাড়ার টাকার জন্যে পরে আর একদিন দেখা করব। -সে হনহন করে ফটকের দিকে এগিয়ে চলল।'

সুন্দরবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'আরে গেল, চন্দুরেটা পালায় যে!'

জয়ন্ত বললে, 'ওকে যেতে দিন সুন্দরবাবু! চন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করতে পারি এমন কোনো প্রমাণ আমাদের হাতে নেই।'

ভদ্রেশ্বর বললে, 'আপনারা আমাকেও গ্রেপ্তার করতে পারেন না।'

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, 'মণিমোহনের জুতো আবিষ্কারের পরেও!'

-'ও জুতো নিশ্চয়ই হরিদাসীর ঘরে ছিল না। এসব হচ্ছে পুলিশের কারসাজি।'

ভদ্রেশ্বরকে সজোরে একটা ধাক্কা মেরে সুন্দরবাবু বললেন, 'পাজি, ছুঁচো! এখনও বকবকানি! চুপটি মেরে থানায় চল, তোর যা বলবার আদালতে গিয়ে বলবি!'

আচম্বিতে গুড়ুম করে একটা শব্দ হল এবং সঙ্গেসঙ্গে জয়ন্ত দুই হাতে নিজের বুক চেপে ধরে মাটির উপরে বসে পড়ল।

পকেট বুকের মহিমা

সুন্দরবাবু প্রথমটা হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে ব্যস্তভাবে জয়ন্তর দিকে ছুটে গেলেন। মানিক তার আগেই জয়ন্তের কাছে গিয়ে হাজির হয়েছে।

সুন্দরবাবু বললেন, 'জয়ন্ত, জয়ন্ত তোমার কোথায় লাগল?'

জয়ন্ত টপ করে উঠে পড়ে একটুখানি হেসে বললে, 'বুকে।'

-'অ্যাঁ, বল কী? বুকে গুলি লেগেছে, আর তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছ!'

-'কান্নার চেয়ে হাসিই আমি পছন্দ করি।'

-'না, ঠাট্টা রাখো। দেখি কোথায় লেগেছে?'

-'এই যে বাঁ-দিকের বুকপকেটের উপরে।'

সুন্দরবাবু দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে সভয়ে বলে উঠলেন, 'ও বাবা, এ যে একেবারে মোক্ষম আঘাত! গুলি পকেট ছ্যাঁদা করে ভিতরে চলে গিয়েছে।'

মানিক উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললে, 'জয়ন্ত কী করে তুমি এখনও পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছ? চলো, আমরা হাসপাতালে নিয়ে যাই।'

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, 'না।'

-'না মানে?'

-'না মানে, না। হাসপাতালে যাব না।'

-'সে কী হে?'

-'বন্ধু শিকারির লক্ষ্য অব্যর্থ বটে, কিন্তু সে লক্ষ্যভেদ করতে পারেনি।'

সুন্দরবাবু ভ্যাবাচাকা খেয়ে বললেন, 'হুম, ও আবার কীরকম কথা?'

জয়ন্ত বুকপকেট থেকে একখানা হৃষ্টপুষ্ট পকেট বই বার করে বললে, 'দেখুন।'

-'কী দেখব?'

-'আততায়ীর বুলেট জামার পকেট ভেদ করে পকেট বইয়ের মলাট আর অনেকগুলো পাতা ফুঁড়ে আর বেশি এগুতে পারেনি। আমি অক্ষত, আপনি নিশ্চিন্ত হোন।'

মানিক উৎফুল্ল কণ্ঠে বললে, 'জয়ন্ত, ভগবানই তোমাকে বাঁচিয়েছেন।'

-'হ্যাঁ ভাই। কিন্তু কেবল আমাকে নয়, গত মহাযুদ্ধের সময়ে ভগবান এই উপায়ে বহু সৈনিকেরই প্রাণরক্ষা করেছেন।'

সুন্দরবাবু খানিকক্ষণ চমৎকৃতের মতো নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর যেন নিজের মনেই বললেন, 'আশ্চর্য ব্যাপার!'

মানিক চারিদিকে তাকাতে তাকাতে বললে, 'কিন্তু বন্দুক ছুড়লে কে?'

দু-জন পাহারাওয়ালার মাঝখানে এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল ভদ্রেশ্বর। সে মুখ টিপে হেসে বললে, 'বন্দুকটা যে আমি ছুড়িনি অন্তত এ সম্বন্ধে আপনাদের নিশ্চয়ই কোনো সন্দেহ নেই?'

সুন্দরবাবু ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, 'এই চোপ! বন্দুক তুই না ছুড়ে থাকিস তোর স্যাঙাত ছুড়েছে!'

-'আমার স্যাঙাত?'

-'হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই পাজি ছুঁচো উল্লুক মণিমোহন বেটা!'

-'সুন্দরবাবু আপনাদের মণিমোহন পাজি কি না জানি না, কিন্তু সে একসঙ্গেই ছুচো আর উল্লুক হতে পারে না। ওরা হচ্ছে দু-জাতের দু-রকম জীব।'

-'চোপরাও, চোপরাও! তাহলে ছুঁচো হচ্ছিস তুই আর উল্লুক হচ্ছে মণিমোহন।'

-'মহাশয়, আর একবার ভ্রম সংশোধন করবার আজ্ঞা হোক।'

-'ভ্রম সংশোধন?'

-'আজ্ঞে হ্যাঁ। মণিমোহন উল্লুক কি না জানি না কিন্তু আমি যে ছুঁচো নই-এ বিষয়ে আপনারা সকলে একমত হতে বাধ্য। আমি মানুষ।'

-'হুম, হুম! তোর মতো বক্কেশ্বর জীবনে আমি আর দেখিনি। তুই যদি ফের বকবক করিস তাহলে তোর দুই গালে মারব দুই থাবড়া!'

অতি বিনীত ভাবে মাথা কাত করে ভদ্রেশ্বর বললে, 'দয়াময় এই আমি গাল পেতে দিলাম। থাবড়া মারবেন তো অনুগ্রহ করে ঝটিতে এগিয়ে আসুন।'

সুন্দরবাবু হার মেনে ভদ্রেশ্বরের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে রুদ্ধ ক্রোধে ফুলতে লাগলেন।

ভদ্রেশ্বর তবু নাছোড়বান্দা। টিটকারি দিয়ে বললে, 'বেশি ফুলবেন না মশায়, আপনার দোদুল্যমান ভুঁড়ির অসুখ হতে পারে।'

সুন্দরবাবু আর পারলেন না, গর্জন করে বলে উঠলেন, 'সেপাই সেপাই! ভদ্দুরেটাকে টানতে টানতে বাগানের বাইরে নিয়ে যাও। একেবারে গাড়িতে নিয়ে গিয়ে তোলো গে।'

ভদ্রেশ্বর বললে, 'টানাটানি হানাহানির দরকার নেই বাবা! সেপাই অগ্রসর হও! আমি পোষ-মানা ভেড়ার মতো তোমাদের সঙ্গে কুইক মার্চ করব।'

ভদ্রেশ্বর বিদায় হলে পর জয়ন্ত বললে, 'সুন্দরবাবু, তাহলে আপনার বিশ্বাস, মণিমোহন আমার প্রতি গুলি নিক্ষেপ করেছে?'

-'সে নয় তো আর কে এ কাজ করতে পারে? বেটা নিশ্চয়ই আড়ালে আড়ালে কোথায় লুকিয়ে আছে। আমার ভয় হচ্ছে, সে যদি আবার গুলি ছোড়ে?'

জয়ন্ত বললে, 'আমি ফটকের দিকে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। গুলিটা এসেছে ওই দিকের কোনো ঝোপঝাড় থেকেই।'

-'তাই নাকি, তাই নাকি? তাহলে তো এমনি এদিকটা ভালো করে খুঁজে দেখতে হয়।'

-'হ্যাঁ, তাই দেখুন। বাগানের বাইরে পুলিশের কড়া পাহারা আছে, আততায়ী নিশ্চয়ই এখনও বাগান থেকে বেরিয়ে যেতে পারেনি।'

হঠাৎ সুন্দরবাবু একেবারে থ। দূরে দেখা গেল, মোটা লাঠিগাছা ঘোরাতে ঘোরাতে ফটকের দিকে হনহন করে এগিয়ে যাচ্ছে চন্দ্রনাথ।

মানিক সবিস্ময়ে বললে, 'চন্দ্রনাথ এখনও বাগানের ভিতরে কী করছে?'

সুন্দরবাবু চিৎকার করে নিজের সহকারীকে ডেকে বললেন, 'পরেশ! লোকজন নিয়ে দৌড়ে যাও, চন্দুরেকে আমার কাছে টেনে নিয়ে এসো।'

অনতিবিলম্বে পাহারাওয়ালাদের সঙ্গে চন্দ্রনাথের পুনরাগমন। তার চেহারায় ভয়-সংকোচের চিহ্নমাত্র নেই, ভাবভঙ্গি অতীব সপ্রতিভ।

সুন্দরবাবু রুক্ষ স্বরে শুধোলেন, 'আপনি এতক্ষণ ওখানে কী করছিলেন?'

-'হাওয়া খাচ্ছিলুম না নিশ্চয়ই।'

-'স্পষ্টাস্পষ্টি জবাব দিন। আপনি এতক্ষণ ওখানে কী করছিলেন?'

-'হঠাৎ শ্রবণ করলুম বন্দুকের শব্দ। পরমুহূর্তে দর্শন করলুম আপনার বন্ধুর পতন। তাই শুনে আর দেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা কী তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করছিলুম। সেটাও কি বে-আইনি?'

সুন্দরবাবু বুলেটবিদ্ধ পকেট বইখানা চন্দ্রনাথের সামনে ধরে বললেন, 'দেখুন।'

-'দেখছি।'

-'এই পকেট বই আজ জয়ন্তকে বাঁচিয়েছে।'

-'বুঝছি।'

-'এইবার আমরা আপনার জামাকাপড় খুঁজে দেখব।'

-'কেন?'

-'দেখব, জামাকাপড়ের মধ্যে আপনি কোনো আগ্নেয়াস্ত্র লুকিয়ে রেখেছেন কি না?'

-'কীরকম আগ্নেয়াস্ত্র? রাইফেল?'

-'জামাকাপড়ের ভিতরে রাইফেল লুকিয়ে রাখা চলে না।'

-'তবে কী খুঁজতে চান? রিভলবার?'

-'ধরুন তাই।'

-'কিন্তু যে বুলেট দেখালেন, ওটা তো রাইফেলের বুলেট? কোনো ছোটো আকারের রাইফেলের বুলেট।'

-'তবু খুঁজে দেখব।'

-'দেখুন।'

খোঁজাখুঁজি ব্যর্থ। বিপদজনক কিছুই পাওয়া গেল না।

সুন্দরবাবু বললেন, 'পরেশ, লোকজন নিয়ে ফটকের ওই দিকে যাও। ঝোপঝাড় খুঁজে রিভলবার-টিভলবার কিছু পাও কি না, দেখো।'

সদলবলে পরেশের প্রস্থান।

চন্দ্রনাথ হেসে বললে, 'পাওয়া গেছে রাইফেলের বুলেট, আপনি খুঁজছেন রিভলবার।'

-'রাইফেলও পেতে পারি।'

-'আপনার অন্বেষণ সফল হলে খুশি হব।'

-'আপনার হাতে অমন মোটা লাঠি কেন?'

-'আমার শখ।'

-'ওরকম শখ ভালো নয়। ভবিষ্যতে রোগা লাঠি নিয়ে আমার সামনে আসবেন।'

-'উপদেশের জন্যে ধন্যবাদ।'

খানিক পরে পরেশ ফিরে এসে জানালে, কোথাও কোনোরকম আগ্নেয়াস্ত্রের সন্ধান মিলল না।

চন্দ্রনাথ সকৌতুকে বললে, 'তাহলে সুন্দরবাবু অঃতপর আমি সসম্মানে বিদায় গ্রহণ করতে পারি?'

-'হুম!'

-'নমস্কার!'

সুন্দরবাবু প্রতি নমস্কার করলেন না। চন্দ্রনাথ চলে গেল।

সুন্দরবাবু বললেন, 'ভাই জয়ন্ত, এই চন্দুরে আর ওই ভদ্দুরেটা দেখছি আমাকে সাত ঘাটের জল না খাইয়ে ছাড়বে না।'

জয়ন্ত বললে, 'খাওয়ায় যদি তো খেতে হবে। আপাতত কী করবেন?'

-'আরও ভালো করে খানাতল্লাসি করে দেখি, মণিমোহন কোথাও ঘুপটি মেরে আছে কি না।'

-'আমি আর মানিক এইবার প্রস্থান করতে চাই।'

পরদিন প্রভাতে বেজে উঠল জয়ন্তের টেলিফোন ঘণ্টা।

রিসিভার নিয়ে জয়ন্ত বলল, 'হ্যালো?'

-'আমি সুন্দরবাবু।'

-'আপনার কণ্ঠস্বর উত্তেজিত কেন?'

-'আবার খুন! আবার চুরি-যে-সে চুরি নয়, নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা আর ত্রিশ হাজার টাকার জড়োয়া গয়না উধাও! আবার পদচিহ্ন!'

-'পদচিহ্ন?'

-'হ্যাঁ, মণিমোহন আর সেই অজ্ঞাত ব্যক্তির পদচিহ্ন-যাকে আমরা কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। তুমি শীঘ্র এসো।'

-'আপনি কোথায়?'

-'ঘটনাস্থলে।'

-'ঠিকানা?'

-'সাতাশ নম্বর সতীশ বসু স্ট্রিট।'

অপরিচিতের সুপরিচিতের পদচিহ্ন

সাতাশ নম্বর সতীশ বসু স্ট্রিট। নতুন ঘটনাস্থল। একখানা রেলিং ঘেরা মাঝারি আকারের বাড়ি। ফটক পার হলেই পাওয়া যায় খানিকটা খোলা জমি। এইখানে কয়েকজন পুলিশ-কর্মচারী ও অন্যান্য লোকের সঙ্গে চেয়ার পেতে বসেছিলেন সুন্দরবাবু।

জয়ন্ত ও মানিকের আবির্ভাব।

সুন্দরবাবু বললেন, 'এসো ভায়া এসো। আগে গোড়ার কথা শুনবে, না একেবারেই বাড়ির ভিতরে যাবে?'

জয়ন্ত বললে, 'আগে গৌরচন্দ্রিকাটা হয়ে যাওয়াই ভালো।'

-'হুম, উত্তম। এই বাড়ির মালিকের নাম রামময় মন্ডল। লোহার ব্যাপারী, ধনী ব্যক্তি, স্ট্র্যান্ড রোডে গদি। সংসার খুব বড়ো নয়-স্ত্রী, দুই মেয়ে, এক ছেলে ও এক ভাই। বহুদিন রোগ-ভোগের পর স্ত্রীর দেহ ভেঙে যাওয়াতে ডাক্তাররা বায়ু পরিবর্তনের পরামর্শ দেন। কাজের চাপের জন্যে রামবাবু নিজে কলকাতা ছাড়তে পারেননি, ছোটো ভাইয়ের সঙ্গে পরিবারবর্গকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন শিমুলতলায়। হঠাৎ পরশু রাত্রে তাঁর ভাইয়ের কাছ থেকে এক টেলিগ্রাম আসে: বউদি মৃত্যুশয্যায়। অবিলম্বে চলে এসো। কিন্তু টেলিগ্রাম পাবার পর ট্রেন ছিল না বলে রামবাবু পরশু রাত্রে শিমুলতলায় যেতে পারেননি। তিনি গতকল্য সকালের ট্রেনে কলকাতা ত্যাগ করেছেন বাড়ির অতি পুরাতন ও অতি বিশ্বস্ত কর্মচারী দ্বিজদাসের জিম্মায় রেখে।'

বাধা দিয়ে জয়ন্ত শুধোলে, 'দ্বিজদাস ছাড়া বাড়ির ভিতরে আর কেউ ছিল না?'

-'ছিল। তিন জন বেয়ারা আর দুই জন দ্বারবান। বাড়িখানায় দুটো মহল-সদর আর অন্দর। বেয়ারা আর দারোয়ানের ঘর সদরের একতলায়। দ্বিজদাস ছিল অন্দরের দোতলার একখানা ঘরে-রামবাবুর শয়নগৃহের ঠিক পাশেই। আজ সকালে দেখা যায়, দোতলার বারান্দার উপরে পড়ে আছে দ্বিজদাসের মৃতদেহ, কে তার বুকের উপরে ছোরার আঘাত করেছে। রামবাবুর ঘরের দরজার কুলুপ ভাঙা, ঘরের ভিতরকার লোহার সিন্দুক থেকে অদৃশ্য হয়েছে নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা আর ত্রিশ হাজার টাকার জড়োয়া গয়না।'

-'অত টাকা ব্যাঙ্কে জমা না দিয়ে বাড়ির ভিতরে রাখা হয়েছিল কেন?'

-'টাকাটা রামবাবুর হাতে এসেছিল পরশু বৈকালেই। রাত্রে টেলিগ্রাম পেয়ে রামবাবু দুশ্চিন্তায় পাগলের মতন হয়ে যান। কাল সকালে উঠেই তাঁকে তাড়াতাড়ি স্টেশনে ছুটতে হয়েছিল বলে তিনি টাকার কোনো ব্যবস্থা করে যেতে পারেননি।'

-'অপরাধীরা কি দলে ভারী ছিল?'

-'জানি না। তবে পদচিহ্ন পেয়েছি দুই জনের। ফোনেই তো বলেছি, দুই পদচিহ্নই আমাদের পরিচিত। এক চিহ্নের মালিক মণিমোহন, অন্য চিহ্নের মালিক আজও অজ্ঞাতবাস করছে।'

-'তারা বাড়ির ভিতরে ঢুকল কেমন করে?'

-'খিড়কির দরজা দিয়ে।'

-'ওখানকার দরজা কি বন্ধ ছিল না?'

-'ছিল বলেই তো শুনেছি।'

-'তবে?'

জয়ন্তের কাছে এসে সুন্দরবাবু তার কানে কানে বললেন, 'বাড়ির ভিতরে নিশ্চয়ই অপরাধীদের সহকারী আছে। হয়তো কোনো দারোয়ান বা বেয়ারা! সে খোঁজ পরে নেওয়া যাবে। আপাতত তাদের সবাইকে নজরবন্দি করে রাখা হয়েছে।'

-'আপনার গৌরচন্দ্রিকা শেষ হল?'

-'আর একটু বাকি আছে। কিন্তু সে যে একটু নয়, দস্তুরমতো গুরুতর একটু।'

-'অর্থাৎ?'

-'মিনিট পঁচিশ আগে আজ শিমুলতলা থেকে দ্বিজদাসের নামে রামবাবুর এই জরুরি টেলিগ্রাম এসেছে। পড়ে দেখো।'

টেলিগ্রামখানা নিয়ে জয়ন্ত পাঠ করলে: স্ত্রীর পীড়ার সংবাদ মিথ্যে।তাঁর স্বাস্থ্য যথেষ্ট উন্নত। অবিলম্বেই কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি।

জয়ন্ত মৌন মুখে ভাবছে, সুন্দরবাবু বললেন, 'রামবাবুকে কলকাতা থেকে যথাসময়ে সরাবার জন্যে কেউ তাকে মিথ্যে ভয় দেখিয়ে টেলিগ্রাম করেছিল। কে সে! নিশ্চয়ই অপরাধীদের কেউ?'

জয়ন্ত বললে, 'আপনার অনুমানই সত্য বলে মনে হচ্ছে। দেখছি অপরাধীরা রীতিমতো আটঘাট বেঁধে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে।'

সুন্দরবাবু অগ্রসর হয়ে বললেন, 'এইবারে বাড়ির ভিতরে চলো।'

প্রথমেই তারা গিয়ে ঢুকল রামবাবুর শয়নগৃহে। যার ভিতর থেকে টাকা ও গহনা চুরি গিয়েছে সেটা লোহার সিন্দুক নয়, স্টিলের আলমারি।

আলমারিটা পরীক্ষা করে জয়ন্ত বললে, 'বেশ বোঝা যাচ্ছে, অপরাধীরা কাজ করে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। তারা নিশ্চয়ই সঙ্গে করে এনেছিল একটা পোর্টেবেল অক্সিজেন ট্যাঙ্ক, আগুনের শিখায় ইস্পাত গলিয়ে আলমারির পাল্লা খুলে ফেলা হয়েছে।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'একেবারে ঝানু অপরাধী। এত কাণ্ডকারখানার মধ্যে কোথাও আধখানা আঙুলের ছাপ পর্যন্ত রেখে যায়নি।'

মানিক একটু বিস্মিত স্বরে বললে, 'অথচ আপনি বলছেন, তারা তাদের পায়ের ছাপ রেখে গিয়েছে।'

-'ছাপ বলে ছাপ! স্পষ্ট ছাপ।'

জয়ন্ত মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, 'বড়োই সন্দেহজনক, বড়োই সন্দেহজনক!'

-'সন্দেহজনক? কেন?'

-'কেন তা জানি না। এখন বাইরে চলুন।'

বারান্দায় পড়েছিল রক্তাক্ত কাপড় দিয়ে ঢাকা একটা মূর্তি। হতভাগ্য দ্বিজদাসের মৃতদেহ। কাপড় সরিয়ে দেহটার উপরে দৃষ্টিপাত করে জয়ন্ত বললে, 'বেশ বোঝা যাচ্ছে ছোরার এক আঘাতেই ভদ্রলোক মারা পড়েছেন।'

সুন্দরবাবু বললে, 'বিয়োগান্ত দৃশ্যের কতকটা আমি আন্দাজ করতে পারছি। খুব সম্ভব অপরাধীরা যখন রামবাবুর ঘরের দরজা খোলবার চেষ্টা করছিল, সেই সময়ে দ্বিজদাসের ঘুম ভেঙে যায়। তিনি ব্যাপার কী জানবার জন্যে তাড়াতাড়ি নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন আর সঙ্গেসঙ্গেই আক্রান্ত হন।

জয়ন্ত দুই পা এগিয়ে বললে, 'এই পদচিহ্নগুলোর কথাই বলছেন?'

-'হ্যাঁ।'

ছয় জোড়া পদচিহ্ন তার মধ্যে তিন জোড়া খুব স্পষ্ট। দুই জন লোকের কর্দমাক্ত জুতোর ছাপ। চিহ্নগুলো আরম্ভ হয়েছে বারান্দার একটা নর্দমার কাছ থেকে।

হেঁট হয়ে দেখতে দেখতে জয়ন্ত বললে, 'সুন্দরবাবু, গতকল্য রাত্রে এ অঞ্চলে কি বৃষ্টি পড়েছিল?'

-'নিশ্চয়ই নয়।'

-'আজ সকালের কাগজে আমি আবহাওয়ার রিপোর্ট দেখেছি। কাল কলকাতার কোথাও একফোঁটা বৃষ্টিও হয়নি।'

-'হয়নি তো হয়নি। তা নিয়ে তোমার মাথা ব্যথা কেন?'

-'মাথা থাকলেই মাথার ব্যথা হওয়া সম্ভব।'

-'তার মানে তুমি বলতে চাও, আমার মাথা থেকেও নেই?'

-'আমি ওসব কিছুই বলতে চাই না। আমি খালি এই কথাই আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে, আগুন না থাকলে যেমন ধোঁয়া দেখা যায় না, তেমনি জল না পড়লে মানুষের জুতোও কর্দমাক্ত হয় না।'

চমৎকৃতভাবে সুন্দরবাবু কেবলমাত্র উচ্চারণ করলেন-'হুম।'

জয়ন্ত বললে, 'বাড়ির কোনো বেয়ারাকে ডাকুন।'

একজন বেয়ারা হাজির হল।

জয়ন্ত শুধোলে, 'নর্দমার কাছে দেখছি একটা মগ আর একটা খালি বালতি রয়েছে।'

বেয়ারা বললে, 'আজ্ঞে, ব্যবহার করবার জন্যে সবসময়েই জলভরা বালতি থাকে।'

-'কাল রাত্রেও ছিল?'

-'আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর। কাল সন্ধ্যের সময়ে আমি নিজের হাতে জল-ভরা বালতি রেখে গিয়েছি।'

-'কিন্তু বালতিতে জল নেই।'

-'তাহলে কাল রাতে কারুর জলের দরকার হয়েছিল।'

-'আচ্ছা, তুমি যাও। সুন্দরবাবু।'

-'কী ভাই?'

-'নর্দমার কাছটা পরীক্ষা করে দেখুন। এখানে রয়েছে পাতলা কাদার প্রলেপ।'

-'এ থেকে কী বুঝব?'

-'এই পদচিহ্নগুলো হচ্ছে প্রদর্শনীর জন্যে।'

-'প্রদর্শনী?'

-'হ্যাঁ। অপরাধীরা এই পদচিহ্নগুলো আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চায়।'

-'কারণ?'

-'কারণ বোঝবার চেষ্টা করুন আপনি। এসো মানিক, এখানে আমাদের আর কোনো কাজ নেই।'

জয়ন্ত ও মানিকের একসঙ্গে প্রস্থান। সুন্দরবাবু হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথার টাক চুলকাতে লাগলেন।

পরের দিন সকাল বেলায় মানিক এসে দেখলে, কী যেন ভাবতে ভাবতে জয়ন্ত তার পুস্তকাগারের মেঝের উপরে পদচারণা করছে।

মানিক বললে, 'তোমার মুখ দেখে বোধ হচ্ছে তুমি যেন কিছু মনে করবার চেষ্টা করছ কিন্তু মনে করতে পারছ না!'

-'ঠিক তাই। একখানা বইয়ের নাম কিছুতেই স্মরণে আসছে না।'

-'কীরকম বই?'

-'সেইটেই তো প্রশ্ন। বইখানা কিনে পড়েছিলুম অনেক দিন আগে। আর একটা বিশেষ ঘটনার কথাও মনে আছে। কিন্তু বইখানার নাম মনে আনতে পারছি না বলে বুঝতে পারছি না, ঘটনাটা কাল্পনিক না সত্য কাহিনি।'

-'ঘটনাটা কাল্পনিক হলে কিছু ক্ষতি আছে?'

-'আছে বই কী, খুব আছে। সেটা কাল্পনিক ঘটনা হলে আমার অনুমানও অমূলক বলে প্রমাণিত হবে।'

-'অনুমানটা কী শুনতে পাই না?'

-'ভদ্রেশ্বরের বাগানে আমার প্রতি নিক্ষিপ্ত বুলেটটা এসেছিল কীরকম আগ্নেয়াস্ত্রের ভিতর থেকে, সেইটেই আমি বোঝবার চেষ্টা করছি।'

মানিক অত্যন্ত বিস্মিত হল, কিন্তু মুখে কিছু বললে না। জয়ন্ত বইয়ের আলমারিগুলোর ভিতরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করতে করতে বারংবার এদিক-ওদিক আনাগোনা করতে লাগল। মানিক একখানা চেয়ারের উপর বসে সেদিনের খবরের কাগজখানা টেনে নিলে। এইভাবে কেটে গেল প্রায় বিশ মিনিট। হঠাৎ জয়ন্ত সানন্দে চিৎকার করে বলে উঠল, 'পেয়েছি!'

-'কী পেয়েছ হে?'

-'সেই বইখানা।'

-'কী বই?'

-'জোসেফ গোলাম সাহেবের, মাস্টার ম্যানহান্টার্স-অর্থাৎ ওস্তাদ মনুষ্যশিকারি। বইখানা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১০২৬ খৃষ্টাব্দে।'

-'ওখানা কি উপন্যাস?'

-'মোটেই নয়! ওর আগাগোড়াই আছে কেবল সত্য ঘটনার পর সত্য ঘটনা। দস্তুরমতো অপরাধ বিজ্ঞানের বই, কাল্পনিক কথা একটাও নেই।'

-'তাহলে তোমার অনুমান ভুল নয়?'

-'খুব সম্ভব তাই।'

-'কীরকম আগ্নেয়াস্ত্র থেকে তোমাকে গুলি করা হয়েছিল?'

জয়ন্ত জবাব দেবার আগেই বেজে উঠল টেলিফোনের ঘণ্টা।

-'হ্যালো! . . . আরে, আজ সকালেও ফোনে সুন্দরবাবু! ব্যাপার কী? এখনি আমাকে আপনার কাছে ছুটতে হবে? কেন? কাল রাত্রেও আবার একটা নরহত্যা হয়েছে? অ্যাঁ-কে খুন হয়েছে বললেন? এবারে স্বয়ং মণিমোহন? এবারের ঘটনাস্থলেও সেই পরিচিত পদচিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। আচ্ছা, আমরা এখনি যাচ্ছি।'

সুপরিচিত অপরিচিত

তখন মর্গে স্থানান্তরিত হয়েছিল মণিমোহনের দেহ। জয়ন্ত ও মানিককে নিয়ে সুন্দরবাবু সেইখানে গিয়ে হাজির হলেন।

জয়ন্ত চমৎকৃত হয়ে লক্ষ করলে, ভদ্রেশ্বরের সঙ্গে মণিমোহনের আকৃতিগত সাদৃশ্য। একরকম দীর্ঘতা, একরকম গঠন এবং প্রায় একরকম মুখ-চোখ-নাক। কেবল ভদ্রেশ্বরের জোড়া ভ্রূ, মণিমোহনের জোড়া নয়। ভদ্রেশ্বরের চেয়ে মণিমোহনের রং একটু বেশি ফরসা। এবং মণিমোহনের চেয়ে ভদ্রেশ্বরের কপাল বেশি প্রশস্ত, কিন্তু এই অল্পস্বল্প পার্থক্য চেষ্টা করলে খুব সহজেই ঢেকে ফেলা যায়।

জয়ন্ত বললে, 'দেখছি মণিমোহন মারা পড়েছে ছোরার আঘাতে।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক বুকের উপরে মোক্ষম আঘাত। ডাক্তারের মতে, আঘাতের সঙ্গেসঙ্গেই মৃত্যু হয়েছে, মণিমোহন হয়তো ছটফট করবারও সময় পায়নি!'

-'কোন সময়ে এর মৃত্যু হয়েছে, ডাক্তার সে সম্বন্ধে কোনো মত প্রকাশ করেছেন কি?'

-'ডাক্তারি হিসাবে প্রকাশ, মণিমোহনের মৃত্যু হয়েছে অন্তত গতকাল সন্ধ্যার আগে।'

-'মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে কখন?'

-'আজ ভোর বেলায়।'

-'আপনার মুখে শুনলাম, বালির কাছে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের পাশে একটা সরু গলির ভিতরে মৃতদেহটা পাওয়া গিয়েছে। সে কীরকম গলি? সেখান দিয়ে কি লোক-চলাচল হয় না?'

-'একথা জিজ্ঞাসা করছ কেন?'

-'কাল সন্ধ্যার আগে খুন হয়েছে অথচ লাশ পাওয়া গেছে আজ সকালে। জায়গাটা নিশ্চয়ই অত্যন্ত নির্জন।'

-'না, জায়গাটা মোটেই নির্জন নয়। স্থানীয় লোকেরা বলে, কাল রাত দুপুরেও গলির ভিতরে লাশ-টাশ কিছুই ছিল না।'

-'তাহলে মণিমোহন মারা পড়েছে অন্য কোনো জায়গায়। হত্যার অনেক পরে, গভীর রাতে তার দেহটা ওই গলির ভিতরে ফেলে দিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

-'জয়ন্ত, আগে আমিও ওই সন্দেহ করতে পারিনি। আমি ভেবেছিলাম খুনটা হয়েছে ওই গলিতেই। কিন্তু তারপর ডাক্তারের রিপোর্ট পেয়ে মত পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু-কিন্তু', বলতে বলতে সুন্দরবাবু ভুরু কুঁচকে মাথা চুলকোতে লাগলেন।

-'থামলেন কেন? ভাবছেন কী?'

-'হুম! আমি ভাই একেবারেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছি।'

-'কেন?'

-'সন্ধ্যার আগেই যদি মণিমোহনের মৃত্যু হয়ে থাকে, তবে রাত বারোটার পরেও তার মৃতদেহ থেকে কি রক্তের ধারা বইতে পারে?'

-'আপনার কথার অর্থ কী?'

-'মৃতদেহ যেখানে পাওয়া গিয়েছে সেখানকার মাটি ভিজে গিয়েছে রক্তের ধারায়।'

মুখ টিপে হেসে জয়ন্ত বললে, 'না, অতক্ষণ পরে মৃতদেহ থেকে রক্ত বেরুতে পারে না।'

-'তবে! ডাক্তার কি ভুল রিপোর্ট দিয়েছেন?'

-'উঁহু, সম্ভবত ডাক্তার ভুল করেননি। সুন্দরবাবু, আমি আর একটা ব্যাপার আন্দাজ করতে পারছি।'

-'কী আন্দাজ?'

-'ফোনে আমাকে বললেন না, ঘটনাস্থলে পাওয়া গিয়েছে সেই নিরুদ্দেশ অপরিচিত ব্যক্তির সুপরিচিত পদচিহ্ন।'

-'হ্যাঁ। সেই পদচিহ্নগুলো-'

-'পাওয়া গিয়েছে রক্তমাখা মাটির উপরে? কেমন এই তো?'

চরম বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করে সুন্দরবাবু বলে উঠলেন, 'কী আশ্চর্য, কেমন করে জানলে তুমি?'

-'বললুম তো আন্দাজে।'

-'এ কীরকম আন্দাজ বাবা? এ যে মন্ত্রশক্তিকে হার মানায়!'

-'আমার আন্দাজ প্রায়ই সত্য হয়ে দাঁড়ায়! কারণ যুক্তি থেকেই তার উৎপত্তি।'

-'ধন্য ভায়া। দাদা হয়েও তোমার পায়ে গড় করতে ইচ্ছে হচ্ছে! আচ্ছা, এখন কী করবে? ঘটনাস্থলটা একবার দেখে আসবে নাকি?'

-'না সুন্দরবাবু, প্রয়োজন নেই। আমি মনে মনে মামলাটা প্রায় সম্পূর্ণ করে ফেলেছি, কেবল একটু তদন্ত বাকি আছে। বিলম্বে কার্যহানির সম্ভাবনা, শুভস্য শীঘ্রম।'

-'আমাকে কী করতে বল?'

-'জনকয়েক লোক নিয়ে এখনি আমার সঙ্গে চলুন।'

-'কোথায় হে?'

-'এখনি দেখতে পাবেন।'

জয়ন্তের নির্দেশে পুলিশের জিপগাড়ি এসে থামল শালিখার চন্দ্রনাথ রায়ের বাড়ির সামনে।

সবিস্ময়ে সুন্দরবাবু শুধোলেন, 'জয়ন্ত তুমি কি চন্দুরের কাছেই এসেছ?'

-'হ্যাঁ।'

-'তুমি কি ওর বিরুদ্ধে নতুন কোনো প্রমাণ পেয়েছ?'

-'কোনো প্রমাণই পাইনি।'

-'তবে?'

-'আমি চন্দ্রনাথের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করতে চাই।'

-'আর আমরা কী করব?'

-'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের কথোপকথন শ্রবণ করবেন।'

এমন সময়ে বোধ হয় গাড়ি থামার শব্দ শুনেই চন্দ্রনাথ স্বয়ং বেরিয়ে এসে দাঁড়াল দোতলার বারান্দায়। তারপর উপর থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখে বললে, 'আরে! আবার আমার দ্বারে সুন্দরবাবুর দল!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনাকে একটা খবর দিতে এসেছি। আসুন।'

মিনিট দুই পরে চন্দ্রনাথ নীচে নেমে রাস্তায় বেরিয়ে এল। হাতে তার সেই মোটা লাঠিগাছা।

জয়ন্ত বললে, 'মশাই কি বাড়িতেও ওই বাঘমারা লাঠিছাড়া হয়ে থাকেন না?'

চন্দ্রনাথ বললে, 'কোমরে হঠাৎ লাম্বেগোর ব্যথা হয়েছে। লাঠি ছাড়া চলতে কষ্ট হয়। সুন্দরবাবু, কী একটা খবরের কথা বলছিলেন না?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আমাদের রাস্তায় দাঁড়িয়েই কথাবার্তা কইতে হবে নাকি? আপনি কি আমাদের ধুলো পায়েই বিদায় করতে চান?'

চন্দ্রনাথ নাচারের মতো বললে, 'বেশ, তবে বাড়ির ভিতরে আসুন।'

সকলে বৈঠকখানায় গিয়ে আসন গ্রহণ করলে পর চন্দ্রনাথ বললে, 'আপনারা এমন কী জরুরি খবর দেবার জন্যে এত দূর ছুটে এসেছেন?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আপনার বন্ধু মণিমোহনকে মনে আছে তো?'

-'কিন্তু আপনাদের সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে তার সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি। জানি না সে কোথায় অজ্ঞাতবাস করছে।'

-'আমরা এতদিন পরে তাঁকে খুঁজে পেয়েছি, কিন্তু জীবন্ত অবস্থায় নয়।'

-'কী বলছেন!'

-'হ্যাঁ, গতকাল কে যেন তাকে খুন করেছে।'

-'শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হলাম। অপরাধীর কোনো সন্ধান পেয়েছেন?'

-'না। মণিমোহনের সঙ্গে শত্রুতা ছিল, এমন কোনো লোককে আপনি জানেন?'

-'তার কোনো শত্রু বা বন্ধুকেই আমি চিনি না, কারণ তার সঙ্গে বেশিদিন আমার আলাপ হয়নি।'

জয়ন্ত এবার মুখ খুললে। বললে, 'আপনার বাড়িতে কয়খানা ঘর আছে চন্দ্রনাথবাবু?'

-'দশখানা।'

-'ঘরগুলো একবার দেখাবেন?'

-'আপনার কৌতূহল একটু অদ্ভুত নয় কি?'

-'কেন, দেখাতে কোনো আপত্তি আছে?'

-'কিছু না। আসুন।'

একে একে সব ঘর দেখিয়ে চন্দ্রনাথ সর্বশেষে দোতলায় একখানা ঘরে ঢুকে বললে, 'এখানা আমার শোবার ঘর।'

জয়ন্ত একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিলে। তারপর এক দিকে চেয়ে বললে, 'ওখানে রয়েছে পর পর সাত জোড়া জুতো। সব জুতোই আপনার?'

শুকনো হাসি হেসে চন্দ্রনাথ বললে, 'হ্যাঁ। আমার কিঞ্চিৎ পাদুকা বিলাস আছে।'

জয়ন্ত জুতাগুলোর সামনে গিয়ে বসে পড়ল। একে একে সব জুতো হাতে করে তুলে নিয়ে উলটেপালটে পরীক্ষা করে বললে, 'বাঃ, বেশ জুতোগুলো! চন্দ্রবাবুর পছন্দ আছে বটে!'

চন্দ্রনাথ ভাবহীন মুখে গম্ভীর স্বরে বললে, 'মশায়ের আর কিছু জ্ঞাতব্য বা বক্তব্য আছে?'

জয়ন্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'নীচে ফিরে যাই চলুন।'

সকলে আবার বৈঠকখানায় এল।

সুন্দরবাবুর এক সহকারী কর্মচারী একটা লোককে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল সেইখানে। বললে, 'স্যার, এই লোকটা বাড়ির বাইরে যাচ্ছিল, আমরা যেতে দিইনি।'

লোকটা বললে, 'আমি এই বাড়ির চাকর। বাজারে যাচ্ছি।'

সহকারী বললে, 'কিন্তু ও বাজারে যাচ্ছে রেশন ব্যাগের ভিতরে এক জোড়া জুতো নিয়ে!'

জয়ন্ত সাগ্রহে বললে, 'জুতো! দেখি, দেখি।'

চন্দ্রনাথ বললে, 'কোথাকার একটা উটকো লোক আজ ভোরে রেশন ব্যাগসুদ্ধ ওই জুতো জোড়া আমার বৈঠকখানায় ফেলে গিয়েছিল। তাই চাকরকে আমি বলেছিলুম সে যেন বাজারে যাবার সময়ে জুতো জোড়া রাস্তায় ফেলে দিয়ে যায়।'

জয়ন্ত নিরুত্তর মুখে একখানা আতশিকাচের সাহায্যে জুতো জোড়া খানিকক্ষণ পরীক্ষা করে বললে, 'সুন্দরবাবু, গাড়িতে ওঠবার সময় আপনাকে কী আনতে বলেছিলাম মনে আছে?'

-'সেই অপরিচিত ব্যক্তির পদচিহ্নের ছাঁচ তো? এনেছি।'

-'তার সঙ্গে এই জুতো জোড়া মিলিয়ে দেখুন।'

গাড়ি থেকে ছাঁচ আনানো এবং জুতোর সঙ্গে মেলানো হল। অবিকল মিলে গেল-একচুল এদিক-ওদিক হল না।

সুন্দরবাবু উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'হত্যাকারীর জুতো!'

জয়ন্ত বললে, 'সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। জুতোর তলার দিকে তাকালেই দেখতে পাবেন জায়গায় জায়গায় শুকনো রক্তের দাগ। তার মানে হচ্ছে কাল মণিমোহনকে বধ করবার পরেও এই জুতো জোড়া ব্যবহার করা হয়েছিল। এই জুতো সংগ্রহ করবার জন্যেই আমার এখানে আগমন।'

চন্দ্রনাথ চমকে উঠে বললেন, 'কী বললেন? আপনি জানতেন যে, ওই জুতো আছে আমার এইখানেই?'

-'ঠিক জানতুম বলতে পারি না, তবে এইরকম একটা সন্দেহ করেছিলুম বটে।'

চন্দ্রনাথ খাপ্পা হয়ে বলে উঠল, 'এতক্ষণ আমার ধারণা ছিল কোনো উটকো লোক জুতো জোড়া আমার বৈঠকখানায় ফেলে রেখে গিয়েছে। এখন বুঝতে পারছি, এ হচ্ছে পুলিশের কারসাজি। কিন্তু আপনাদের সমস্ত কূটকৌশলই ব্যর্থ হবে। দেখুন ওই জুতোর সঙ্গে আমার পা মিলিয়ে। আমি বলছি, এ জুতো আমার নয়।'

জয়ন্ত সহাস্যে বললে, 'আমি জানি ও জুতোর মাপ আপনার পায়ের চেয়ে বড়ো। কিন্তু আমি কেবল জুতোর আসল গুপ্তকথাই জানি না, বোধ হচ্ছে আপনার ওই লাঠির গুপ্তকথাও আমার কাছে অবিদিত নেই। সুন্দরবাবু, আপনি এখন অনায়াসেই চন্দ্রনাথকে থানায় ধরে নিয়ে যেতে পারেন।'

আচম্বিতে চন্দ্রনাথের মুখ হয়ে উঠল বীভৎস এক দানবের মতো। সঙ্গেসঙ্গে ফস করে সে লাঠিগাছা দুই হাতে কোমর বরাবর উঁচু করে তুলে ধরলে-এবং তৎক্ষণাৎ একটা রিভলবার গর্জন করে উঠল ও পরমুহূর্তে লাঠিগাছা তার হাত থেকে খসে মেঝের উপরে পড়ে গেল সশব্দে। চন্দ্রনাথের ডান হাতের কব্জির উপরে ফুটে উঠল রক্তের রেখা।

চারদিকে তাকাতে তাকাতে সুন্দরবাবু সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'রিভলবার ছুড়লে কে, রিভলবার ছুড়লে কে?'

জয়ন্ত প্রশান্ত কণ্ঠে বললে, 'সে কথা পরে শুনবেন সুন্দরবাবু। এখন চট করে লাঠিগাছা তুলে নিন দেখি। কিন্তু খুব সাবধান, বোধ হয় ওটা লাঠি নয়-কোনো সাংঘাতিক ভয়াবহ অস্ত্র।'

পদচিহ্ন রহস্য

চন্দ্রনাথের পরিত্যক্ত লাঠিগাছাটা মাটির উপর থেকে তুলে নিয়ে সুন্দরবাবু আবার বললেন, 'কিন্তু রিভলবার ছুড়লে কে?'

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, 'রিভলবার ছুড়েছি আমি সুন্দরবাবু।'

সুন্দরবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'হতেই পারে না। যখন রিভলবারের আওয়াজ হয় তখন তোমার ডান হাত ছিল জামার পকেটের ভিতরেই।'

-'ঠিক দেখেছেন। এখনও আমার ডান হাত পকেটের ভিতরেই আছে।'

-'তবে?'

-'পকেটের ভিতর থেকেই আমি রিভলবার ছুড়েছিলুম।'

-সে কী হে!

-'এই দেখুন, আমার পকেট ছ্যাঁদা করে রিভলবারের গুলিটা বাইরে বেরিয়ে এসেছে।'

-'হুম!'

-'চন্দ্রনাথকে আমি বিশ্বাস করিনি, আর আমার সবচেয়ে বেশি সন্দেহ ছিল ওর ওই মোটা লাঠিগাছার উপরে। আমি জানতুম, সে যদি হঠাৎ কোনো চালাকি খেলে বসে, তাহলে পকেট থেকে আর রিভলবার বার করবার সময় পাব না। তাই পকেটের ভিতরেই রিভলবার ধরে আমি আগে থাকতে তৈরি হয়ে ছিলাম।'

-'ধন্যি ছেলে যাহোক।'

-'না সুন্দরবাবু ব্যাপারটায় নতুনত্ব নেই কিছু। চোখের পলক পড়বার আগেই কাজ সারবার জন্যে মার্কিন গুন্ডাদের মধ্যে এই নিয়মই প্রচলিত আছে। এখন ওকথা থাক। লাঠিগাছাটা আমার হাতে দিয়ে আগে চন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করুন।'

সুন্দরবাবুর হুকুমে তখনই পাহারাওয়ালা এসে চন্দ্রনাথকে ঘিরে দাঁড়াল।

দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে চন্দ্রনাথ বললে, 'বটে বটে! আমার বিরুদ্ধে কী প্রমাণ পেয়েছ তোমরা?'

জয়ন্ত জবাব না দিয়ে চন্দ্রনাথের লাঠিগাছা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। তারপর সকলের দিকে পিছন ফিরে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে লাঠিগাছা আকাশের দিকে উঁচু করে তুলে ধরলে। তারপরেই ঘরের সবাইকে চমকে দিয়ে গুড়ুম করে একটা আওয়াজ হল।

সুন্দরবাবু আঁতকে বলে উঠলেন, 'বন্দুক ছুড়লে কে, বন্দুক ছুড়লে কে?'

জয়ন্ত ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, 'আমি।'

সুন্দরবাবু সবিস্ময়ে বললেন, 'মানে? বন্দুকটাও তোমার পকেটের ভিতরে লুকিয়ে রেখেছ নাকি?'

তখন ধূমায়মান লাঠিগাছা দেখিয়ে জয়ন্ত বললে, 'না। আমি ছুড়েছি এই লাঠি-বন্দুকটা।'

-'লাঠি আবার বন্দুকে পরিণত হতে পারে নাকি! গুপ্তির কথা শুনেছি বটে, লাঠির ভিতরে লুকানো থাকে ছোটো তলোয়ার। কিন্তু লাঠি-বন্দুক আবার কী চিজ, বাবা!'

-'হ্যাঁ সুন্দরবাবু, আমার হাতে যা দেখছেন তা লাঠির ছদ্মবেশে বন্দুক ছাড়া আর কিছুই নয়। এই দেখুন লাঠির রুপো-বাঁধানো মুন্ডি। তার তলায় এই যে দেখছেন সোনার ব্যান্ড বা বন্ধনী, আঙুল দিয়ে এটা একটু সরানো যায়। কিন্তু সরাবার সঙ্গেসঙ্গেই লাঠির ভিতরে যে ট্রিগার বা টিপকল আছে সেটা পড়ে যাবে আর ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়বে বুলেটটা। কী হে চন্দ্রনাথ, তাই নয় কি?'

চন্দ্রনাথ ক্রুদ্ধ মুখে গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, কোনো উত্তর দিল না।

সুন্দরবাবু চমৎকৃত হয়ে বললেন, 'এমন আজব বন্দুকের কথা কখনো তো শুনিনি।'

জয়ন্ত বললে, 'না শোনবারই কথা! এ দেশে এরকম বন্দুক থাকতে পারে আমিও আগে তা জানতুম না।'

-'তবে তুমি লাঠির গুপ্তকথা আবিষ্কার করলে কেমন করে?'

-'বলছি শুনুন। এই মোটা লাঠিগাছা দেখলেই অসাধারণ বলে মনে হয় নাকি? এরকম লাঠি নিয়ে কোনো শৌখিন বাবুই হাওয়া খেতে বেরোয় না। লাঠির ওই অসাধারণত্ব প্রথম দিনেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু আমি তখন ওটাকে ভেবেছিলুম সাধারণ গুপ্তিজাতীয় কোনো যন্ত্র। তারপর আমার প্রথম সন্দেহ জাগ্রত হয় ভদ্রেশ্বরের বাগানে গিয়ে।'

-'কেন? সেখানে তো আমরাও ছিলুম, আমরা তো চন্দ্রনাথের লাঠিকে তখনও সন্দেহজনক বলে মনে করতে পারিনি।'

-'গুটি কয় কথা ভেবে দেখুন। ভদ্রেশ্বরের বাগানে আমাদের কোনোই বন্দুকধারী শত্রু ছিল না। মণিমোহন পলাতক, ভদ্রেশ্বর বন্দি, যেদিক থেকে আমাকে লক্ষ করে গুলি নিক্ষিপ্ত হয় সেদিকে দাঁড়িয়েছিল কেবল

চন্দ্রনাথ। কিন্তু তার হাতে ছিল মাত্র এই লাঠিগাছা। বাগান তল্লাস করেও অন্য কোনো লোক বা বন্দুক খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে বন্দুক ছুড়লে কে? একমাত্র উত্তর হতে পারে, চন্দ্রনাথ! কিন্তু তার কাছেও ওই লাঠি ছাড়া আর কোনো অস্ত্রই ছিল না। গুলি তো আকাশ থেকে খসে পড়েনি, তাই সর্বপ্রথম আমার মনে সন্দেহ জাগে, তবে কি চন্দ্রনাথের ওই লাঠির ভিতরেই কোনো রহস্য নিহিত আছে? বাড়িতে ফিরে এসে এই নিয়ে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল, অনেক দিন আগে কী একখানা ইংরেজি কেতাবে অদ্ভুত একটা লাঠির কথা পাঠ করেছিলুম। কিন্তু বইখানার নামটা প্রথমে মনে পড়েনি। তারপর আমার লাইব্রেরির আলমারিগুলোর ভিতরে খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ যখন বইখানা চোখে পড়ে গেল, তখন মানিকও সেখানে হাজির হল। কী হে মানিক বইখানার নাম তুমি এর মধ্যে ভুলে যাওনি তো?'

মানিক বললে, 'নিশ্চয়ই ভুলে যাইনি! বইখানা হচ্ছে জোসেফ গোলাম সাহেবের-মাস্টার ম্যানহান্টার্স।'

-'ঠিক। ওখানা উপন্যাস নয়, সত্য ঘটনার অপরাধ-বিজ্ঞানের বই। তারই পাতা ওলটাতে ওলটাতে দ্বাদশ পরিচ্ছেদে প্যারিসের অপরাধ জাদুঘরের বর্ণনার মধ্যে খুঁজে পেলুম চন্দ্রনাথের এই লাঠির জুড়ি।'

সুন্দরবাবু আগ্রহ ভরে বললেন, 'কীরকম, কীরকম!'

-'সম্পূর্ণ ঘটনার কথা পরে আপনি বিস্তৃতভাবে বইখানা পাঠ করলেই জানতে পারবেন, আপাতত আমি সংক্ষেপেই তার কথা বলব। ফ্রান্সে একবার একটা গার্ডেন পার্টিতে জনৈক ব্যক্তি কোনো অজানা আততায়ীর দ্বারা নিক্ষিপ্ত গুলিতে নিহত হয়। তখনি ঘটনাস্থলে পুলিশ আসে আর সারা বাগান আর প্রত্যেক নিমন্ত্রিত ব্যক্তির জামাকাপড় তল্লাস করে, কিন্তু বন্দুক বা কোনোরকম আগ্নেয়াস্ত্রই খুঁজে পায় না। অন্য কোনো সূত্র না পেয়ে গোয়েন্দারা খোঁজ নিতে লাগল, নিহত ব্যক্তির সঙ্গে কারুর বিশেষ শত্রুতা আছে কি না! ফলে এক ব্যক্তির উপরে পুলিশের সন্দেহ হয়। তারপর তার বাড়ি খানাতল্লাস করে আবিষ্কৃত হয় এমন একগাছা লাঠি, যা অবিকল চন্দ্রনাথের এই লাঠিগাছারই মতো।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'তুমি কি বলতে চাও, চন্দ্রনাথ ওইরকম সর্বনেশে লাঠি তৈরি করেছে?'

-'সে নিজে হয়তো তৈরি করেনি, হয়তো ইউরোপ থেকেই অস্ত্রটা আমদানি করেছে!'

-'তাহলে চন্দ্রনাথকে বড়োজোর তোমাকে খুন করবার চেষ্টা করেছে বলে আমরা চালান দিতে পারি। কিন্তু আমাদের আসল মামলা তো এখনও রয়ে গেল যে তিমিরে সেই তিমিরেই!'

রুপোর নস্যদানি বার করে নস্য নিতে নিতে জয়ন্ত বললে, 'মোটেই নয়! চন্দ্রনাথের বাড়িতে আজ যে জুতো জোড়া খুঁজে পেয়েছি, আসল মামলার কিনারা হবে তার সাহায্যেই।'

-'সে কী হে, ও জুতোর মাপ যে চন্দ্রনাথের পায়ের মাপের চেয়ে বড়ো!'

-'হ্যাঁ, কিন্তু কোনো ঘটনাস্থলে যাবার সময়ে চন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই ওই জুতোর ভিতরে কাগজের নুটি বা প্যাড গুঁজে দিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে কোনোরকমে জুতো জোড়া ব্যবহার করত।'

-'কেন?'

-'পুলিশকে ভোলাবার জন্যে।'

-'কেমন করে এটা জানতে পেরেছ?'

-'রামময়বাবুর বাড়িতে যে চুরি আর হত্যাকাণ্ড হয়, সেদিন বৃষ্টি হয়নি তবু ঘটনাস্থলে পাওয়া গিয়েছিল মণিমোহনের আর এই জুতো জোড়ার কাদামাখা ছাপ। তারপর দেখা গেল, নর্দমার কাছে গিয়ে বালতির জল ঢেলে ধুলোমাখা জুতো ভিজিয়ে কারা ইচ্ছে করেই সেই পদচিহ্নগুলো সৃষ্টি করেছে। মনে আছে সুন্দরবাবু, তখনি আপনাকে আমি বলেছিলুম, অপরাধীরা এই পদচিহ্নগুলো আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চায়!'

-'হুম!'

-'তারপর যেখানে মণিমোহন খুন হয় সেখানেও এই জুতো জোড়ার ছাপ পাওয়া যায় রক্তমাখা মাটির উপরে, অথচ সেখানে রক্ত থাকবার কথা নয়, কারণ লাশটাকে হত্যাকাণ্ডের অনেক পরে সেখানে

স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। আসলে সে রক্তও আমদানি করা। সেখানেও হত্যাকারী এই জুতো জোড়ার ছাপ দেখিয়ে আমাদের ভোলাতে চেয়েছিল। এখন ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন?'

-'খানিক খানিক, সবটা নয়।'

-'গোড়া থেকে ভেবে দেখুন। চন্দ্রনাথের কুকর্ম্মের সহকারী হল মণিমোহন। প্রথমেই কে. সরকারের জুয়েলারি ফার্মে চুরি। তারপর নন্দলালকে হত্যা করে তাকে মণিমোহন বলে চালাবার চেষ্টা। সেখানেও নন্দলালের, মণিমোহনের আর অজ্ঞাত ব্যক্তির জুতোজোড়ার ছাপ পাওয়া যায়। তারপর ধরা পড়ে মণিমোহন খুন হয়নি, মারা পড়েছে নন্দলালই। পুলিশের সন্দেহ যায় মণিমোহন আর এক অজ্ঞাত ব্যক্তির দিকে। চন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যই ছিল তাই।

'তারপর রামময়বাবুর বাড়িতে খুন, পঞ্চাশ হাজার টাকা আর ত্রিশ হাজার টাকার জড়োয়া গয়না চুরি। সেখানেও পাওয়া গেল মণিমোহনের আর সেই অজ্ঞাত ব্যক্তির জুতোর ছাপ। তারপর ভিতরের ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারছি না বটে, কিন্তু খুব সম্ভব চোরাই টাকা-গহনার ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে মণিমোহনের সঙ্গে চন্দ্রনাথের ঝগড়া হয়, যার ফলে মণিমোহনের অকাল মৃত্যু। লাশ অন্যত্র পাঠিয়ে সেখানে আবার পুলিশের অজ্ঞাত সেই ব্যক্তির জুতোর ছাপ রেখে আসা হল। ফলে চন্দ্রনাথ ভেবেছিল সে নিজে থাকবে নিরাপদে, আর পুলিশ খুঁজে মরবে এমন কোনো ব্যক্তিকে পৃথিবীতে যার অস্তিত্ব নেই।'

চন্দ্রনাথ ঝাঁঝালো গলায় বললে, 'ও জুতো যে আমার, সেটা প্রমাণ করবে কে?'

জয়ন্ত বললে, 'সে ভার পুলিশের হাতে দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারো। এই জুতো জোড়া পাওয়া গিয়েছে তোমার বাড়িতে। পুলিশ দেখেই জুতো জোড়া তুমি সরিয়ে ফেলতে গিয়েছিলে। তার উপরে এমন আরও অনেক সারকামস্ট্যানসিয়াল এভিডেন্স বা অবস্থা ঘটিত প্রমাণও আছে, তোমাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাবার পক্ষে যা হবে যথেষ্ট।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল। যেমন কুকুর তেমনি মুগুর! হুম, জয়ন্তের মতো ওঝা না হলে চন্দুরের মতো ভূতকে শায়েস্তা করতে পারে কে?'

হত্যা-হাহাকারে

কলকাতা হঠাৎ পাগলা হয়ে গিয়েছে। এক-একজন মানুষ যে পাগল হয়ে যায় এ কথা জানো তোমরা সবাই। কিন্তু একটা গোটা শহর হঠাৎ পাগলা হয়ে গিয়েছে শুনলে তোমাদের মনে খটকা লাগতে পারে নিশ্চয়ই।

তবু কথাটা সত্য। ওই শোনো। হাজার হাজার কণ্ঠে আকাশ-কাঁপানো ওই বিকট চিৎকার শোনো। 'জয় হিন্দ!' 'বন্দে মাতরম!' 'আল্লা হো আকবর!'

ওই দেখো। নিকটে, সুদূরে বাড়ির পর বাড়ি জুড়ে দাউদাউ করে জ্বলছে সমুজ্জ্বল রক্তের মতো রাঙা টুকটুকে অগ্নিশিখার পর অগ্নিশিখা এবং অতিকায় কৃষ্ণ অজগরের মতো ধূম্রকুণ্ডলীর পর ধূম্রকুণ্ডলী সারে সারে উপরে উঠে যাচ্ছে যেন ছোবল মারতে বিপুল শূন্যের বুকে।

শুনতে পাচ্ছ না সুতীব্র আর্তধ্বনি? শুনতে পাচ্ছ না ঘন ঘন বন্দুক ও বোমার ভয়াল গর্জন এবং পলাতকদের অতি দ্রুত পদশব্দ?

হ্যাঁ, কলকাতা শহর হঠাৎ পাগলা হয়ে গিয়েছে এবং অরণ্যচারী ব্যাঘ্র ও সিংহের নৃশংস আত্মা এসে আজ দখল করেছে নগরবাসী মানুষদের বক্ষ।

অধিকতর ভয়াবহ রাত্রি নেমে এল শহরের ভিতরে, দিকে দিকে দুলিয়ে দিয়ে গাঢ় অন্ধকারের যবনিকা। পথে পথে গ্যাসপোস্টগুলোর আলোক চক্ষু আজ অন্ধ, ট্রাম, বাস ও ট্যাক্সির চলাচল বন্ধ, একেবারে বোবা ফেরিওয়ালাদের কণ্ঠ, দোকানদাররা দোকানের ঝাঁপ তুলে দিয়ে পলায়ন করছে, সাধারণ পথিকরা আত্মগোপন করেছে আপন আপন ঘর-বাড়ির অন্তরালে এবং প্রত্যেক বাড়ির সদর দরজা ভিতর থেকে অর্গলবদ্ধ। কিন্তু তবু মৌন হল না কলকাতার মুখর পাগলামি, রাত্রির অন্ধকারকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করে চতুর্দিক থেকে জেগে উঠছে তার প্রচণ্ড ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি! রাজপথ যেখানে জনশূন্য সেখানেও সেইসব বন্য চিৎকার শোনা যাচ্ছে, বদ্ধদ্বার বাড়িগুলোর ছাদের থেকে। মানুষদের সঙ্গে সঙ্গে উন্মত্ত হয়ে চিৎকার করছে হাজার হাজার শঙ্খও।

'জয় হিন্দ!' 'বন্দে মাতরম!' 'আল্লা হো আকবর!'

মানিক বললে, 'জয়ন্ত আজ রাত্রে দেখছি ঘুমের দফা গয়া।'

জয়ন্ত বললে, 'সে কথা আর বলতে। কিন্তু হিন্দুরা কি নির্বোধ?'

-'কেন?'

-'তারা বন্দে মাতরম বলে চিৎকার করছে। কিন্তু বন্দে মাতরম কি নরহত্যার, ভ্রাতৃহত্যার মন্ত্র?'

-'মুসলমানদের সম্বন্ধেও তুমি ওই প্রশ্ন করতে পারো। আল্লা হো আকবর বলতে কি বোঝায় হিন্দুর মুণ্ডচ্ছেদ করা?'

-'ঠিক বলেছ মানিক। আজ একসঙ্গে হিন্দু আর মুসলমানের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে।'

-'হুঁ। আর সারারাত জেগে এইসব চিৎকার শুনলে সকালে আমাদেরও মাথা হয়তো ঠিক থাকবে না।'

-'তাহলে দুই কানে তুলো গোঁজবার চেষ্টা করব।'

-'না, ঠাট্টা নয় জয়ন্ত। এসো, জানলাগুলো বন্ধ করে শুয়ে পড়া যাক। তারপর সকালে উঠে দেখা যাবে, পথঘাটের অবস্থা কীরকম।'

জয়ন্ত ও মানিক সকাল বেলায় যখন বাড়ির বাইরে গিয়ে দাঁড়াল, তখন রাত্রের সেই ভয়ংকর ও পৈশাচিক গণ্ডগোল বোধ করি শ্রান্ত হয়ে এসেছে। মাঝে মাঝে দু-চার জন এখনও জয় হিন্দ প্রভৃতি বলবার চেষ্টা করছে বটে, কিন্তু কণ্ঠস্বরগুলো যথেষ্ট কাহিল হয়ে পড়েছে বলে মনে হচ্ছে। তবে তরুণ সূর্যের সোনালি হাসির ভিতরেও চারিদিকে বিরাজ করছে কেমন একটা থমথমে অপার্থিব ভাব।

আগে প্রতিদিনই যারা নরহত্যা করবার ব্রত নিয়ে জনবহুল পথে পথে দিকবিদিক জ্ঞানহারার মতো ছুটোছুটি করে বেড়াত, সেই ট্রাম-বাস-ট্যাক্সির দল এখনও সাহস সঞ্চয় করে আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি। যে দু-একখানা মোটর দেখা যাচ্ছে, তা হয় ডাক্তার মার্কার আশ্রয় নিয়েছে, নয় বহন করছে পুলিশের লাল পাগড়িওয়ালাদের।

জায়গায় জায়গায় দেখা যাচ্ছে ছোটো-বড়ো জনতা। সেখানে সবাই কথা কইছে উত্তেজিতভাবে এবং অনেকেরই হাতে রয়েছে ছোরা, ভোজালি, লোহার ডান্ডা, পাইপ বা শিক এবং এমন সব পলকা লাঠি বা বাঁখারি-একটা বিড়াল মারতে গেলেও যা ভেঙে টুকরো হয়ে যেতে পারে।

মাঝে মাঝে হঠাৎ দলে দলে লোক উদভ্রান্তের মতো ছুটতে শুরু করছে ঊর্ধ্বশ্বাসে।

মানিক একটা ছুটন্ত লোকের হাত ধরে ফেলে শুধোলে, 'আরে মশাই, ব্যাপার কী?'

-'জানি না মশাই, জানি না।'

-'তবে এত ছুটছেন কেন?'

-'সবাই ছুটছে বলেই ছুটছি। ইচ্ছা করলে আপনিও ছুটতে পারেন।'

-'না, আমার সে ইচ্ছা নেই। আপনিই ছুটুন। যত পারেন ছুটুন- প্রাণপণে ছুটুন!'

মানিক হাত ছেড়ে দিলে। লোকটি আবার ছুটতে শুরু করলে।

জয়ন্ত হাসলে, মানিকও হাসলে বটে, কিন্তু তাদের সে হাসির মধ্যে নেই কিছুমাত্র কৌতুকের আবেগ। রাজপথ হয়ে উঠেছে আজ ভীষণ। তার দিকে তাকালেও শিউরে ওঠে অন্তর ও আত্মা।

রাজপথ হয়েছে আজ অসংখ্য মানুষের অন্তিমশয্যা। মৃতদেহ আর মৃতদেহ আর মৃতদেহ। কোথাও এক জন কি দু-জন এবং কোথাও বা চার-পাঁচ জন মানুষের মৃতদেহ। কোথাও বা রাশি রাশি মৃতদেহের উপরে মৃতদেহ পড়ে গঠন করেছে বীভৎস স্তূপের পর স্তূপ। প্রত্যেকেরই নিশ্চেষ্ট দেহের ভঙ্গি একান্ত অস্বাভাবিক, প্রত্যেক দেহই রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত। দেহহীন মুণ্ডু এবং মুণ্ডহীন দেহেরও অভাব নেই। কাটা হাত-পাও পড়ে রয়েছে এখানে-ওখানে। সর্বত্র রক্তের ছড়াছড়ি-রক্তধারায় পথ হয়েছে পিচ্ছল কর্দমাক্ত। ভয়ানক, সে সব দৃশ্য অসহনীয়। যেটুকু বললুম তাই যথেষ্ট, আরও বেশি বর্ণনা করে লাভ নেই। মানুষের প্রতি মানুষ যে কত নিষ্ঠুর হতে পারে, কলকাতার রাজপথে পাওয়া যায় তারই জ্বলন্ত প্রমাণ।

হঠাৎ মানিক সচকিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'জয়ন্ত দাঁড়াও!'

-'কী হয়েছে মানিক?'

-'এখানে একটি দেহ পড়ে রয়েছে। বরেনবাবুর মৃতদেহ। ইনি আমার পরিচিত। বন্ধু বললেও চলে।'

-'কে বরেনবাবু?'

-'বরেন্দ্রসুন্দর রায়চৌধুরী! আমার কাছে তুমিও এর নাম শুনেছ।'

-'বরেন্দ্রসুন্দর রায়চৌধুরী? আনন্দপুরের জমিদার?'

-'হ্যাঁ।'

জয়ন্ত এগিয়ে এসে দাঁড়াল।

একটি পরমসুন্দর মানুষের সুগঠিত দেহ। মুখ-চোখ সুশ্রী, বর্ণ গৌর। দেখলেই বোঝা যায়, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি! দেহের ভঙ্গি স্বাভাবিক। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, ভদ্রলোক যেন ঘুমিয়ে আছেন নিশ্চিন্ত আরামে। কিন্তু তাঁর বুকের উপর রয়েছে একটা কুৎসিত ক্ষতচিহ্ন।

জয়ন্ত দেহের পাশে বসে পড়ল। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলে ক্ষতচিহ্নটা। তারপর গম্ভীর স্বরে বললে, 'মানিক আমার বিশ্বাস, এই ভদ্রলোক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় মারা পড়েননি। এ হচ্ছে সাধারণ হত্যাকাণ্ড। কেউ একে অন্য জায়গায় খুন করে পুলিশকে ঠকাবার জন্যে এখানে এনে ফেলে রেখে গেছে।'

মড়ার উপরে খড়্গাঘাত

বরেনবাবুর মৃতদেহ নিয়ে আরও ভালো করে পরীক্ষায় নিযুক্ত হল জয়ন্ত। হঠাৎ পিছন থেকে উৎসাহিত কণ্ঠে শোনা গেল, 'আরে হুম। মানিক নাকি?'

ইন্সপেক্টর সুন্দরবাবুর কণ্ঠস্বর। ফিরে দাঁড়িয়ে মানিক বললে, 'এত সকালে সুন্দরবাবু রাস্তায় যে? প্রাঃতভ্রমণে বেরিয়েছেন বুঝি?'

সুন্দরবাবু এগিয়ে আসতে আসতে বললেন, 'হেঁ:, প্রাঃতভ্রমণেই বেরিয়েছি বটে। পুলিশের চাকরি নিয়ে আমরা কি আর মনুষ্য-পদবাচ্য আছি? আমরা শকুনি হে, শকুনি? যেখানে মড়া সেইখানেই আমরা। রাজপথ হয়েছে আজ মড়াদের বিছানা, আমরা কি এখানে না এসে থাকতে পারি? আরে কে ও, জয়ন্ত যে। তোমার সামনে একটা মড়া। বাপ, তুমি তো আর পুলিশে চাকরি কর না, তবে শখ করে মড়া ঘাঁটতে বেরিয়েছ কেন?'

জয়ন্ত জবাব দিলে না, মুখও তুললে না।

মানিক বললে, 'সুন্দরবাবু এই মৃতদেহটি আমার এক বন্ধুর। ইনি আনন্দপুরের জমিদার, নাম বরেন্দ্রসুন্দর রায়চৌধুরী।'

-'শুনে দুঃখিত হলুম। কিন্তু উপায় কি আর আছে ভাই? দেশে সাংঘাতিক ভ্রাতৃঘাতী হানাহানি বেঁধেছে, তোমার আমার কত বন্ধুকেই যে আত্মদান করতে হবে তা কে জানে?'

মাণিক বললে, 'না সুন্দরবাবু, জয়ন্ত বলে বরেন্দ্রবাবু সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় মারা পড়েননি।'

-'বটে, বটে। জয়ন্ত এমন কথা বলে কেন?'

-'তার মতে কেউ এঁকে অন্য জায়গায় খুন করে এখানে এনে ফেলে রেখে গিয়েছে।'

-'খুনির এতটা পরিশ্রম করবার কারণ কী?'

-'খুনি পুলিশকে ঠকাতে চায়। ব্যাপারটা সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড বলে চালিয়ে দিতে পারলে পুলিশ জোর তদন্ত না করতেও পারে।'

-'লাশের গায়ে কি খুনির মনের কথা লেখা আছে?'

-'আমি জানি না। জয়ন্তকে জিজ্ঞাসা করুন।'

-'কী হে জয়ন্ত, তুমি মিশরের মমির মতো চুপ মেরে আছ কেন? মানিকের কথা কি সত্য?'

জয়ন্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'হ্যাঁ।'

-'এই ভদ্রলোক এখানে মারা পড়েননি?'

-'না।'

-'কেমন করে জানলে?'

জয়ন্ত বললে, 'প্রথমত ইনি যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মারা পড়েননি, খুব সহজেই সে সন্দেহ হয়। ইনি হিন্দু আর এটা হচ্ছে একেবারে হিন্দু পাড়া। এখানে হঠাৎ কোনো মুসলমান এসে একে হত্যা করতে পারে না।

অন্য কোথাও খুন করে মুসলমানরা যে হিন্দু পাড়ায় এসে লাশ ফেলে যেতে সাহস করবে, তাও মনে হয় না। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় রাস্তায় কেউ যদি মারা যায়, তাকে নিয়ে বেশি মাথা ঘামাবার দরকার হয় না।'

-'এ কথা মানি।'

-'তারপর শুনুন। আমি মৃতদেহ ভালো করে পরীক্ষা করেছি। বাঁ-দিকের দ্বিতীয় আর তৃতীয় পাঁজরার মাঝখানে কেউ ছোরা দিয়ে আঘাত করেছে। ছোরা প্রবেশ করেছে স্টার্নাম বা বুকঅস্থির খুব কাছেই। ওই রকম আঘাতে মৃত্যু হয় প্রায় মুহূর্তের মধ্যেই। কিন্তু সে আঘাতে বরেন্দ্রবাবু মারা পড়েননি।'

-'তবে? মৃতদেহে তো আর কোনো আঘাতেরই চিহ্ন দেখছি না।'

-'আগে আমার সব কথা শুনুন। অস্ত্রে কেবল বাঁ-পাশের ফুসফুস জখম হয়নি, দেহের দুটো প্রধান ধমনীও-পালমনারি আর এওর্টা- আংশিকভাবে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। অত তাড়াতাড়ি মৃত্যুর কারণ তাই-ই।'

-'এটা তো আত্মহত্যার মামলাও হতে পারে?'

-'পারে। মৃত্যু হয় যেখানে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে, আত্মঘাতীর অস্ত্র সেখানে হয় ক্ষত স্থানে, নয় হাতের মুঠোর মধ্যে, নয়তো দেহের আশেপাশে কোথাও পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে কোনো অস্ত্রই দেখতে পাচ্ছি না। সুতরাং এটা আত্মহত্যার মামলা হতে পারে না।'

-'মৃত্যু হয়েছে রাস্তায়। যদি কোনো পথিক ছোরাখানা কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে থাকে?'

-'প্রশ্নটা যুক্তিসংগত। আদালতে এমন প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে এমন প্রশ্ন উঠবার সুযোগ নেই। কারণ বলছি। ক্ষতস্থানটা দেখুন। জীবন্ত দেহে অস্ত্রাঘাত করলে ক্ষতস্থানটা বেশি ফাঁক হয়ে যায়, কারণ সে ক্ষেত্রে জ্যান্ত চামড়া হয় সংকুচিত। মৃতদেহের ত্বক সংকুচিত হয় না, তাই ক্ষতস্থানের ফাঁকও বড়ো হতে পারে না। এই দেহটার ক্ষতস্থানের মুখ কীরকম সংকীর্ণ, দেখছেন তো? এর দ্বারা কী প্রমাণিত হয়?'

সুন্দরবাবু সন্দিগ্ধভাবে বললেন, 'তুমি কি বলতে চাও জয়ন্ত, এই ভদ্রলোকের মৃত্যুর পর হত্যাকারী দেহের উপরে অস্ত্রাঘাত করেছে?'

-'ঠিক তাই। আরও প্রমাণের অভাব নেই। জীবন্ত দেহের ক্ষতস্থান রক্তে পরিপূর্ণ হয়ে যায়, জামাকাপড়ও হয় রক্তে আরক্ত। কিন্তু এই ক্ষতটা দেখুন এর উপরে রক্ত জমাট হয়ে নেই। জামাকাপড়েও রক্তের দাগ নেই বললে চলে।'

-'তোমার আর কিছু বলবার আছে?'

-'আছে। বলেছি, খুনির অস্ত্র দেহের দু-টি প্রধান ধমনী দুই ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে। জীবন্ত অবস্থায় এই দু-টি নাড়ি পরিপূর্ণ হয়ে থাকে প্রবহমান রক্তধারায়। মৃত্যুর পর এই ধমনী দুটো প্রায় রক্তশূন্য হয়ে যায়। সুতরাং বরেনবাবু বেঁচে থাকতে যদি কেউ তাঁর বুকে অস্ত্রাঘাত করত তাহলে যে কোটরের ভিতর ওই দুটো ধমনী আছে, তা রক্তে পরিপূর্ণ হয়ে উঠত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে দেখছি রক্ত আছে যৎসামান্য-যা নগন্য বললেও চলে।'

সুন্দরবাবু তাঁর বিখ্যাত টাক চুলকোতে চুলকোতে, বললেন, 'হুম! খুনি মড়ার উপরে করেছে খড়্গাঘাত?'

-'নিশ্চয়!'

-'কিন্তু কেন?'

-'লোকের চোখে ধুলো দেবার জন্যে। বরেনবাবুর শবব্যবচ্ছেদ করলেই খুব সম্ভব জানা যাবে যে, আগে তাঁকে বিষপ্রয়োগ করে হত্যা করা হয়েছে। খুনি তারপর মড়ার উপরে ছোরা মেরে লাশটাকে রাস্তায় বহন করে এনে ফেলে রেখে গিয়েছে। এখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলছে বীভৎস সমারোহে-শহরের পথে পথে মৃতদেহের ছড়াছড়ি, পুলিশ বিশেষভাবে কোনো মৃতদেহ নিয়ে তদন্ত করে না, লাশগুলোকে গাদায় ফেলে শ্মশানে বা গোরস্থানে পাঠিয়ে দেয়, এ ক্ষেত্রেও হয়তো তা ছাড়া আর কিছুই হবে না। সুন্দরবাবু, এই খুনি বা খুনিরা অত্যন্ত সুচতুর, তাই-'

জয়ন্তের কথা শেষ হতে-না-হতেই খানিক তফাতে উঠল বিষম গণ্ডগোল। দলে দলে লোক চারিদিকে প্রাণপণে ছুটোছুটি করে পালাতে লাগল পাগলের মতো। আবার আর একদল লোক লাঠি ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আস্ফালন করতে করতে বেগে ধাবমান হল একদিকে।

সুন্দরবাবু তাঁর রিভলবার বার করে বললেন, 'এসো জয়ন্ত, এসো মানিক, ব্যাপারটা কী দেখা যাক! এই সেপাইরা, তোমরাও এসো।'

কিন্তু খানিকদূর অগ্রসর হয়েই দেখা গেল, ব্যাপারটা কিছুই নয়। দুটো ষাঁড় লড়াই করছে, তাই দেখে কয়েকজন ছুটে নিরাপদ ব্যবধানে সরে আসবার চেষ্টা করেছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজপথের বিপুল জনতা অকারণ আতঙ্কে অভিভূত হয়ে সৃষ্টি করছে এই মিথ্যা বিভীষিকা।

জয়ন্ত, মানিক ও সুন্দরবাবু আবার ফিরে এলেন যথাস্থানে।

মানিক সবিস্ময়ে বললে, 'একী! বরেনবাবুর মৃতদেহ কোথায়?'

জয়ন্ত তিক্ত হাসি হেসে বললে, 'তোমার প্রশ্নের উত্তর খুব সোজা।'

-'খুনিরা এইখানেই হাজির ছিল, তাদের হিসাবে ভুল হয়েছে দেখে প্রথম সুযোগেই লাশ তারা সরিয়ে ফেলেছে।'

জিপ গাড়ি

সুন্দরবাবু হতভম্বের মতো বললেন, 'দু-মিনিট পিছু ফিরতে-না-ফিরতেই সদর রাস্তা থেকে লাশ লোপাট। এমন আজব ব্যাপার আমি তো আর কখনো দেখিনি বাবা।'

মানিক বললে, 'আমরা যখন বরেনবাবুর মৃতদেহের কাছে দাঁড়িয়ে কথা কইছিলুম, তখন সেখানে বেশ একটি ছোটোখাটো জনতার সৃষ্টি হয়েছিল। লাশ যারা সরিয়েছে তারা সেই জনতার ভিতরেই ছিল বলে সন্দেহ হচ্ছে।'

জয়ন্ত বললে, 'সন্দেহ নয় মানিক, এইটেই হয়েছে সত্য। আচ্ছা, তুমি কি সেই ভিড়টা লক্ষ করেছিলে?'

-'না। একজন বন্ধুর মৃতদেহ দেখে আমি এতটা অভিভূত হয়েছিলুম যে, অন্য কিছু লক্ষ করবার মতো মনের অবস্থা আমার ছিল না।'

-'আমি কিন্তু লক্ষ করেছিলুম। ভিড়ের ভিতরে ছিল তিন জন কালো চশমাপরা লোক।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আরে হুম। কালো চশমাপরা লোক দেখলেই সন্দেহ করতে হবে, এমন কথার কোনোই মানে হয় না। এই তো আমি এখন কালো চশমা পরে আছি। কিন্তু তুমি কি বলতে চাও আমি হচ্ছি সন্দেহজনক ব্যক্তি?'

মানিক ভ্রূ নাচিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, আমি ঠিক ওই কথাই বলতে চাই।'

-'মানে?'

-'পুলিশের লোক বললেই বুঝতে হবে পয়লা নম্বরের সন্দেহজনক ব্যক্তি।'

সুন্দরবাবু হুংকার দিয়ে বলে উঠলেন, 'চোপরাও মানিক, চোপরাও! খামোকা টিপ্পনি কেটে আমাকে চটাবার চেষ্টা কোরো না। বাজে ফাজলামি ভালো নয়, পারো তো কাজের কথা বলো।'

জয়ন্ত বললে, 'আমার সন্দেহের কারণ বলি শুনুন। প্রথমত, কোনো ছোটো ভিড়ে একখানা কালো চশমাই যথেষ্ট। কিন্তু একসঙ্গে তিনখানা কালো চশমা কি অল্পবিস্তর অসাধারণ নয়? দ্বিতীয়ত, ওই তিন জন কালো চশমাপরা লোকেরই সাজ ছিল একরকম-খাঁকি শার্ট, হাফ প্যান্ট আর বুট জুতো, দেখলেই মনে হয় যেন তারা ফৌজের সেপাই। এটাও আমি লক্ষ করেছিলুম যে তাদের একজন হচ্ছে অতিরিক্ত ঢ্যাঙা আর অতিরিক্ত রোগা।তার মাথার চুল বেশ লম্বা, প্রায় কাঁধ পর্যন্ত এসে পড়েছিল।'

মানিক চমৎকৃতভাবে বললে, 'শবদেহ পরীক্ষা করতে করতেও তুমি এত ব্যাপার লক্ষ করেছিলে? তাকে দেখলে আবার চিনতে পারবে?'

-'নিশ্চয়ই পারব! তুমি কি জানো না মানিক, সত্যিকার গোয়েন্দাদের থাকে সেইরকম চক্ষু-ইংরেজিতে যা ক্যামেরা আই নামে বিখ্যাত? এরকম চোখে পড়ে যেকোনো দৃশ্য, তা চিরস্থায়ী হয়ে যায়।'

সুন্দরবাবু বিরক্তিভরে ভ্রূ-সংকোচ করে বললেন, 'ওসব চোখ-টোখের কথা এখন থো করো বাপু। আমার কথা হচ্ছে, এই অদ্ভুত লাশ চুরির অর্থটা কী?'

জয়ন্ত বললে, 'অর্থ স্পষ্ট। অপরাধীরা ভেবেছিল এই ব্যাপারটা সাম্প্রদায়িক খুনের মামলা বলে চালিয়ে দেবে। শেষ পর্যন্ত কোথাকার জল কোথায় গড়ায় তা দেখবার জন্যে তারা এখানে অপেক্ষা করছিল। তারা দেখল আমি তাদের অতি চালাকি ধরে ফেলেছি। সুতরাং লাশ যে শবব্যবচ্ছেদাগারে পাঠানো হবে আর পুলিশ যে শবব্যবচ্ছেদাগারের রিপোর্ট পেয়ে মামলার ভার গ্রহণ করবে এটা বুঝতে তাদের বিলম্ব হয়নি।'

-'শবব্যবচ্ছেদাগারের রিপোর্টে কী থাকত?'

-'ঠিক কী থাকত তা আমি বলতে পারি না। তবে এটুকু নিশ্চয়ই জানা যেত যে বরেন্দ্রবাবুকে আগে বিষ খাইয়ে বা অন্য কোনো উপায় হত্যা করে পরে তাঁর মৃতদেহের উপরে অস্ত্রাঘাত করা হয়েছে।'

মানিক বললে, 'কিন্তু একটা গোটা মৃতদেহ হজম করা তো সহজ নয়।'

জয়ন্ত বললে, 'এই দাঙ্গার বাজারে সবই সহজ। কিন্তু আপাতত ও-সব কথা থাক। এখন দেখা যাক কী উপায়ে লাশটা সরিয়ে ফেলা হয়েছে সেটা জানতে পারা যায় কি না!'

তখনও সেখানে কয়েক জন লোক দাঁড়িয়ে ছিল। দু-চার জনকে জিজ্ঞাসা করতেই জানা গেল যে ষাঁড়ের লড়াইয়ের জন্যে রাজপথে যখন মিথ্যা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল, সেই সময়ে হঠাৎ একখানা জিপগাড়ি এসে মৃতদেহটা তুলে নিয়ে চলে গিয়েছে। খবরটা যে দিলে, সেই রাস্তার ধারে তার একখানা পানের দোকান আছে।

সুন্দরবাবু বললেন, 'তুমি কীরকম লোক হে বাপু? ওসব দেখেও চুপ করে রইলে?'

দোকানদার বললে, 'কেমন করে বুঝব হুজুর? আমি ভেবেছিলুম তারা সেপাই।'

-'তাদের পরনে সেপাইয়ের পোশাক ছিল?'

-'হ্যাঁ, হুজুর।'

-'তারা ক-জন ছিল?'

-'তিন জন।'

জয়ন্ত শুধোলে, 'তাদের চোখে কি কালো চশমা ছিল?'

-'হ্যাঁ হুজুর।'

-'একটা লোক খুব ঢ্যাঙা আর খুব রোগা?'

-'আজ্ঞে হ্যাঁ। আর তার মাথায় ছিল ঝাঁকড়া চুল।'

জয়ন্ত ও মানিক অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করলে।

সুন্দরবাবু বললেন, 'তুমি জিপগাড়িখানার নম্বর দেখেছ? দেখনি? তুমি হচ্ছ একটি আস্ত গাধা।'

-'আজ্ঞে, আমি ইংরেজি পড়তে পারি না।'

-'পারো না? তাহলে তুমি যে-সে গাধা নও, একটি আস্ত মুখ্যু গাধা।'

লোকটি হাতজোড় করে বললে, 'আজ্ঞে হুজুর যা বলেন।'

জয়ন্ত বললে, 'জিপগাড়িখানা কোন দিকে গিয়েছে সেটা বলতে পারবে তো?'

-'আজ্ঞে, সামনের ওই রাস্তা ধরে।'

-'মানিক, ওটা তো গঙ্গায় যাবার রাস্তা।'

-'হ্যাঁ।'

-'তাহলে আমার বিশ্বাস লাশটা তারা গঙ্গাজলে বিসর্জন দেবে। শিগগির চলো।'

-'কোথায়?'

-'গঙ্গার ধারে।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'জয়ন্ত তুমি কি মনে কর আমাদের হাতে আত্মসমর্পণ করবার জন্যে তারা এখনও গঙ্গার ধারে বসে আছে?'

-'বসে থাক না থাক, ওদিকে একবার যেতে দোষটা কী?'

মানিক অঙ্গুলিনির্দেশ করে বললে, 'জয়ন্ত, জয়ন্ত! গঙ্গার দিক থেকে একখানা জিপগাড়ি খুব বেগে এই দিকেই আসছে না?'

-'হুঁ। আরে আরে, গাড়ির ভিতরে বসে আছে যে আমাদের সেই কালো চশমাপরা বন্ধু লোকেরাই! বাহবা কি বাহবা!'

অগ্নিশিখার নাচ

সুন্দরবাবু চার জন পাহারাওয়ালা নিয়ে পথরোধ করে দাঁড়ালেন। এগিয়ে গেল জয়ন্ত ও মানিক।

জিপগাড়িখানা কোনোরকম ইতস্তত না করেই ছুটে আসতে লাগল। গাড়ির আরোহীদের মধ্যেও কোনরকম চাঞ্চল্য দেখা গেল না। নির্ভয়ে তারা বসে আছে পাথরের মূর্তির মতো। তাদের ভাব দেখলে মনে হয়, পথ জোড়া, এই যেন তাদের দৃষ্টিগোচরই হয়নি।

গাড়ি খুব কাছে এসে পড়তেই, সুন্দরবাবু দুই বাহু শূন্যে তুলে হুকুমের স্বরে বললেন, 'গাড়ি থামাও। গাড়ি থামাও।'

কোনোরকম জানান না দিয়েই গাড়ির গতি বেড়ে গেল। আচম্বিতে পাঞ্জাব মেলের ইঞ্জিনকে হার মানিয়ে গাড়িখানা এমন অপ্রত্যাশিতভাবে ভোঁ দৌড় মারলে যে, সুন্দরবাবু প্রাণ বাঁচাবার জন্য পিছনদিকে মস্ত এক লম্ফ ত্যাগ করে নিজের বিপুল ভুঁড়ির ভারে টাল খেয়ে দড়াম করে হলেন পপাত ধরণীতলে। জয়ন্ত, মানিক ও অন্যান্য লোকেরাও কোনো গতিকে গাড়ি চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেল এ যাত্রা।

চোখের পলক না ফেলতে রিভলবার বার করে জয়ন্ত ফিরে দাঁড়াল এবং সেই উচ্চ গতিতে ধাবমান জিপগাড়ির টায়ার লক্ষ্য করে বার কয়েক গুলি ছুড়লে।

কিন্তু জিপখানা এর মধ্যেই রিভলবারের নাগালের বাইরে গিয়ে পড়েছে এবং পর মুহূর্তেই মোড় ফিরে চলে গেল একেবারে চোখের আড়ালে।

মানিক বললে, 'আমি কিন্তু গাড়িখানার নম্বর দেখে নিয়েছি।'

জয়ন্ত বললে, 'নম্বর হয়তো কোনো কাজেই লাগবে না। খুব সম্ভব ওরা আসল নম্বর ব্যবহার করেনি।'

সুন্দরবাবু তখন উঠে পথের উপরে দুই পা ছড়িয়ে বসে আছেন। কাতর মুখে তিনি মাথার পিছন দিকটায় হাত বুলিয়ে হাতখানা চোখের সামনে ধরে করুণ স্বরে বললেন, 'ভেবেছিলাম মাথাটা ফেটে গিয়েছে, এখন দেখছি কাটেওনি, রক্তও পড়ছে না! হুম!'

মানিক বললে, 'সুন্দরবাবু, আপনার পক্ষে মাথার চেয়ে প্রয়োজনীয় হচ্ছে আপনার স্ফীতোদরটি। মাথা ফাটলেও আপনি পটল তুলবেন না, কিন্তু ভুঁড়ি ফেঁসে গেলে একেবারেই সর্বনাশ। দেখুন দেখুন, সর্বাগ্রে ভুঁড়িটা পরীক্ষা করে দেখুন।'

চেষ্টা করে রাগ সামলে সুন্দরবাবু বললেন, 'থামো হে ফাজিল, থামো! আমার ভুঁড়ির ভাবনা ভেবে তোমাকে আর মস্তক ব্যথিত করতে হবে না! নিজের চরকায় তেল দাও।'

মানিক বললে, 'চরকা? আমার চরকা নেই। আমি গান্ধীজি মানি বটে কিন্তু তাঁর চরকা মানি না।'

-'হুম, তা মানবে কেন? তোমরা আজকালকার ছেলেরা যে কমিউনিস্ট।'

-'কমিউনিস্ট কাদের বলে সুন্দরবাবু? আমাদের নেতাদের বক্তৃতা শুনলে সন্দেহ হয় আগেকার টেররিস্টরাই এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে কমিউনিস্ট। একথা কি সত্য?'

-'যাও ছোকরা, যাও। মরছি নিজের গায়ের ব্যথায়, এখন উনি এলেন কিনা রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতে।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন সুন্দরবাবু।

জয়ন্ত বললে, 'মানিক বাজে কথা ছাড়ো। আমার কথার জবাব দাও। তুমি বরেনবাবুর বাড়ি চেনো?'

-'নিশ্চয় চিনি, তিনি যে আমার বন্ধু। চন্দ্রকান্ত রোডে জায়গা কিনে তিনি নতুন একখানা বাড়ি তৈরি করেছিলেন। বাড়িখানার কেবল একতলাই বাসযোগ্য হয়েছে। যুদ্ধের বাজারে মালপত্র দুষ্প্রাপ্য হওয়াতে দোতলা আর তেতলা এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। বরেনবাবু আপাতত একতলাতেই বাস করতেন।'

-'তাঁর পরিবারবর্গ আছেন?'

-'আছেন বই কী! কিন্তু অসম্পূর্ণ বাড়ি, স্থানাভাব বলে তাঁরা এখন দেশে আছেন।'

-'তাহলে কলকাতার এই বাড়িতে বরেনবাবু একলাই থাকতেন।'

-'না, ঠিক একলা নয়। ঠিকে ঝি আর পাচক কাজকর্ম সেরে চলে যেত। বাড়িতে সর্বদাই থাকত নিধিরাম। সে বরেনবাবুর পুরোনো বেয়ারা। খুব বিশ্বাসী।'

-'বরেনবাবু কি বেশ বড়ো জমিদার?'

-'খুব বড়ো নন, খুব ছোটোও নন, মাঝারি।'

-'তাঁর আয় কত জানো?'

-'ঠিক জানি না। তবে লোকের মুখে শুনেছি তাঁর মাসিক আয় বোধ হয় হাজার ছয় টাকার কম ছিল না।'

জয়ন্ত মিনিট খানেক একেবারে চুপ। তারপর বললে, 'আচ্ছা, বরেনবাবুর সম্বন্ধে বাকি কথা পরে জানলেও চলবে। আপাতত আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই, আমাকে বরেনবাবুর বাড়িতে নিয়ে চলো। সুন্দরবাবু, আমাদের সঙ্গে আসবেন নাকি?'

সুন্দরবাবু নাচারভাবে বললেন, 'আছাড় খেয়ে বেদম হয়ে পড়েছি। এটা আমার মামলা নয়, যাবার খুব ইচ্ছা নেই। তবে তুমি যখন বলছ-'

সকলে পা চালিয়ে দিলে। সেখান থেকে চন্দ্রকান্ত রোড বেশি দূর নয়।

বরেনবাবুর নবনির্মিত অসম্পূর্ণ বাড়ি। একতলার কোনো কাজ বাকি নেই-এমনকী শার্সি-খড়খড়িতে রং পর্যন্ত লাগানো হয়েছে। দ্বিতলে ইঁট-চুন-সুরকির কাজ শেষ হয়েছে বটে, তবে রঙের মিস্ত্রি এখনও সেখানে হস্তার্পণ করেনি। কিন্তু ত্রিতলের অধিকাংশ কাজই অসমাপ্ত। বাড়ির সম্মুখে নীচে থেকে ত্রিতল পর্যন্ত দাঁড় করানো রয়েছে বাঁশের ভারা।

সমস্তটার উপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে জয়ন্ত বললে, 'দেখছি বাড়িখানা এখনও অত্যন্ত অরক্ষিত অবস্থায় আছে। ওই ভারা বেয়ে বাইরের যেকোনো লোক বাড়ির ভিতরে ঢুকতে পারে। এমন বাড়িতে বাস করা উচিত নয়।'

সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মানিক হাঁকলে, 'নিধিরাম? অ-নিধিরাম!'

একজন মাঝবয়েসি লোক বাইরে এসে দাঁড়াল। রং প্রায় কালো, হৃষ্টপুষ্ট গড়ন, খালি গা খালি পা। কিন্তু তার মুখের ভাব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

মানিককে দেখেই সে ব্যগ্রভাবে বললে, 'মানিকবাবু এসেছেন? আপনি বলতে পারেন, আমাদের বাবু কোথায় আছেন?'

মানিক বললে, 'ব্যস্ত হোয়ো না নিধিরাম, সব কথা পরে বলছি। আগে তুমি সব কথা বলো দেখি।'

নিধিরাম প্রথমে পাহারাওয়ালাদের দিকে সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে। তারপর বললে, 'কাল রাত দশটার পর খাওয়া-দাওয়া সেরে বাবু তাঁর ঘরের ভিতরে শুতে যান, আমিও খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়ি। তারপর আজ ভোরে উঠে এসে দেখি, বাবুর ঘরের দরজা খোলা, বাবুও ঘরের ভিতরে নেই। বাবু তো বেলা

আটটার আগে বিছানা ছেড়ে ওঠেন না, আজ সকালে তাঁর ঘুম ভেঙেছে দেখে অবাক হয়ে গেলুম। সদর দরজাটাও খোলা দেখে বুঝলুম, নিশ্চয়ই তিনি বাড়ির বাইরে বেরিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু মানিকবাবু, এখন বেলা বারোটা বেজে গিয়েছে এখনও বাবু বাড়িতে ফিরে আসেননি। আপনি কি বাবুর খবর জানেন? আপনার সঙ্গে পুলিশ কেন? বাবু কি কোনো বিপদে পড়েছেন?'

জয়ন্ত এগিয়ে গিয়ে বললে, 'সেসব কথা পরে হবে নিধিরাম। এখন বাবুর শোবার ঘরে আমাদের নিয়ে চলো দেখি।'

নিধিরাম রাস্তার ধারের একখানা ঘরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললে, 'বাড়ির উপরটা তো এখনও তৈরি হয়নি, বাবু তাই ওই বৈঠকখানাতেই শুয়ে রাত কাটিয়ে দেন।'

-'বেশ, তাহলে ওই ঘরখানাই আমরা দেখতে চাই।'

নিধিরামের পিছনে পিছনে সকলে সদর দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢুকে বৈঠকখানার ভিতরে প্রবেশ করলে।

বেশ বড়োসড়ো ঘর। মেঝের উপরে কার্পেট পাতা। দিকে দিকে টেবিল, চেয়ার, সোফা, কোচ। দুটো কেতাবের আলমারি। দু-দিকের দেয়ালের গায়ে দুইখানা ফ্রেমে-বাঁধানো বড়ো আয়না। ঘরের এক কোণে একখানা ক্যাম্পখাট পাতা।

জয়ন্ত শুধোলে, 'তোমার বাবু কি ওই খাটেই শুতেন?'

নিধিরাম বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

জয়ন্ত পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল সেইদিকে।

অকস্মাৎ সকলকে চমকে দিয়ে ঘরের ভিতর দুম করে একটা অদ্ভুত শব্দ হল এবং সঙ্গেসঙ্গে এখানে-ওখানে-সেখানে দেখা গেল অভাবিত অগ্নিশিখার আরক্ত নৃত্য।

গ্যাসোলিন

প্রথমেই দাঁড়িয়েছিল জয়ন্ত। তার পিছনে নিধিরাম এবং তার পিছনে একসঙ্গে সুন্দরবাবু ও মানিক।

বিদ্যুৎবেগে ফিরে দাঁড়িয়ে জয়ন্ত তার বলিষ্ঠ বাহুর দ্বারা প্রায় একসঙ্গেই তাদের তিন জনকে মারলে এমন প্রচণ্ড ধাক্কা যে, ঘরের দরজার ভিতর দিয়ে ঠিকরে তারা হুড়মুড় করে একেবারে বাইরে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ল।

পড়তে পড়তেই মানিকের সচকিত দৃষ্টি দেখলে, তার পাশে শূন্য পথে এসে হাজির হল জয়ন্তর দেহও।

মাটিতে পড়েই জয়ন্ত ও মানিক আবার দাঁড়িয়ে উঠল চোখের নিমেষে।

বরেনবাবুর বৈঠকখানার ভিতরটা তখন পরিণত হয়েছে একটা বিশাল চুল্লিতে। হু-হু রাঙা আগুন এবং কালো কুচকুচে ধোঁয়া ঘরের ভিতরটা একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে এবং দরজা ও জানলার ভিতর দিয়েও বাইরে বেরিয়ে আসছে ক্রুদ্ধ লকলকে অগ্নিশিখার পর অগ্নিশিখা, ধোঁয়াকুণ্ডলীর পর ধোঁয়াকুণ্ডলী। চারিদিকে এমনি ভীষণ উত্তাপ যে, সেই ভয়াবহ অগ্নিগৃহের বাইরে থেকেও সকলের দেহ যেন পুড়ে ঝলসে যাবার মতো।

জয়ন্ত চিৎকার করে ডাকলে, 'সুন্দরবাবু, সুন্দরবাবু! শিগগির বাড়ির বাইরে বেরিয়ে চলুন।'

তখনও ভূতলশায়ী সুন্দরবাবু দুই-একবার ওঠবার জন্যে ব্যর্থ চেষ্টা করে যন্ত্রণাবিকৃত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'কোমর ভেঙে গিয়েছে-আমার কোমর ভেঙে গিয়েছে। আমি আর উঠতে পারছি না যে।'

জয়ন্ত ও মানিক তখন সুন্দরবাবুকে চ্যাংদোলা করে বাড়ির বাইরে নিয়ে এল। নিধিরাম এর মধ্যেই পালিয়ে রাস্তায় গিয়ে হাজির হয়েছিল।

জয়ন্ত বললে, 'মানিক, দৌড়ে গিয়ে ফায়ার ব্রিগেডকে ফোন করে দাও।'

দেখতে দেখতে রাস্তায় জমে উঠল প্রকাণ্ড জনতা। এমন হইচই শুরু হয়ে গেল যে কান পাতা দায়। ছুটোছুটি, হুড়োহুড়ি, ঠেলাঠেলি। সকলের ইচ্ছা আরও কাছে আসে, কিন্তু আগুনের তাতে আরও কাছে আসা অসম্ভব।

ফোন করে এসে মানিক হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'ভাই জয়ন্ত, ব্যাপার দেখে হতভম্ব হয়ে গিয়েছি, কেমন করে কী হল, কিছুই বুঝতে পারছি না।'

-'প্রথমে আমিও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিলুম। তবে অগ্নিকাণ্ডের এক মুহূর্ত আগেই আমার সজাগ চোখ দেখেছিল একটা দৃশ্য, আর আমার সজাগ কান শুনেছিল একটা শব্দ। সঙ্গেসঙ্গে আমিও সাবধান হতে পেরেছিলুম, নইলে এতক্ষণে আমরা কেউই প্রাণে বাঁচতুম না।'

-'আমি দেখতে কিছুই পাইনি। তবে একটা শব্দ শুনেছিলুম বটে।'

-'কীরকম শব্দ?'

-'কাঁচের কোনো জিনিস ভাঙার শব্দ?'

-'ঠিক। কিন্তু তুমি কিছুই দেখতে পাওনি, না মানিক? এতেই বোঝা যাচ্ছে, আমার সঙ্গে সঙ্গে থেকেও তুমি এখনও পুরোপুরি গোয়েন্দা হতে পারোনি। আদর্শ গোয়েন্দার প্রধান কর্তব্য হচ্ছে, সর্বদা সর্বদিকে পঞ্চেন্দ্রিয়কে সতর্ক জাগ্রত রাখা। আমি কী দেখেছিলুম জানো?'

-'বলো।'

-'অতর্কিতে একটা মূর্তি দরজার সামনে আবির্ভ÷ত হল-সেই কালো চশমা আর খাকি পোশাকপরা মূর্তি। পর মূহূর্তে সে একটা কাচের জগ সজোরে ঘরের ভিতরে নিক্ষেপ করলে-জগটার মুখের কাছটা জ্বলন্ত।'

-'জ্বলন্ত কাচের জগ?'

-'হ্যাঁ। আচ্ছা মানিক, তুমি কোনো গন্ধ পাওনি?'

-'গন্ধ পাবার সময় দিলে কই? যে হাড়ভাঙা ধাক্কা মেরেছিলে।'

-'ধাক্কা না মারলে তোমরা যে বাঁচতে না ভাই।'

-'কিন্তু গন্ধের কথা কী বলছ?'

-'আমি একটা গন্ধ পেয়েছি। গ্যাসোলিনের গন্ধ।'

মানিক কী জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল, এমন সময় ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি এসে পড়ল। বরেন্দ্রবাবুর বাড়ি তখন জ্বলছে দাউ-দাউ-দাউ। শত শত অগ্নিশিখা তখন রক্তসর্পের মতো সোঁ সোঁ করে উপরে উঠে যাচ্ছে, যেন আকাশকে ছোবল মারবার জন্যে।

জয়ন্ত ডাকলে, 'সুন্দরবাবু।'

-'হুম!'

-'এখন আপনার অবস্থা কেমন?'

-'প্রায় মারাত্মক। কোনোক্রমে উঠে দাঁড়িয়েছি বটে, কিন্তু শরীরে আর পদার্থ নেই। একটিমাত্র দিনে দুই-বার প্রচণ্ড আছাড় খাওয়া। এই বয়সে হজম করতে পারব কেন ভায়া।'

-'এ বাড়ির ভিতর থেকে কোনোরকম সূত্র আবিষ্কারের সম্ভাবনা নেই-অগ্নিদেব সমস্তই নিশ্চিহ্ন না করে ছাড়বেন না। ফায়ার ব্রিগেডের কাজের অসুবিধা হবে, আমরা খানিক তফাতে গিয়ে দাঁড়ালেই ভালো হয়।'

ভিড় ঠেলে তারা অগ্রসর হল।

সুন্দরবাবু বললেন, 'কাচের জ্বলন্ত জগ, গ্যাসোলিন, এসব কী বলছ জয়ন্ত, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'আমরা সাংঘাতিক শত্রুর পাল্লায় পড়েছি, তারা পদে পদে আমাদের অনুসরণ করছে। আসল ঘটনাস্থলে আমাদের আবির্ভাব দেখেই তারা কেবল ওই বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়নি, আমাদেরও পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করেছে।'

-'কিন্তু কাচের জগ আর গ্যাসোলিনের গুপ্ত কথাটা কী?'

-'মনে করুন, আপনি একটা কাচের জগের ভিতরটা গ্যাসোলিনে ভরতি করলেন। তারপর খালি ন্যাকড়া দিয়ে জগের মুখটা বন্ধ করলেন। ন্যাকড়ার কতক অংশ পলতের মতো বাইরে বের করে রেখে তাতেও ঢেলে দিলেন গ্যাসোলিন। তখন কাচের জগটা পরিণত হল মারাত্মক বোমায়।'

সুন্দরবাবু সবিস্ময়ে বললেন, 'বোমায়!'

-'ঠিক তাই।'

-'তারপর?'

-'এ বোমা যে ব্যবহার করবে তাকেও রীতিমতো হুঁশিয়ার হয়ে থাকতে হবে। পলতেয় অগ্নিসংযোগ করবার পর সময় পাওয়া যাবে মাত্র দুই সেকেন্ড। তার মধ্যে জগটা নিক্ষেপ করতে না পারলে নিক্ষেপকারীরও বিপদের সম্ভাবনা।'

-'হুম। এমন বিটকেল বোমার কথা তো জীবনে কখনো শুনিনি।'

-'শোনা উচিত ছিল। আবিসিনিয়ার অধিবাসীরা ইতালির সঙ্গে যুদ্ধ করবার সময়ে এইরকম বোমাই ব্যবহার করত। আমি ভাবছি আমাদের মারবার জন্যে যে লোকটা জগ ছুড়েছে, তার কোনো ক্ষতি হয়েছে কি না।'

ভিড়ের ভিতরে দাঁড়িয়ে একটি ভদ্রলোক অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে জয়ন্তের কথা শুনছিলেন। তিনি এগিয়ে এসে বললেন, 'মশাই ঠিক অনুমান করেছেন। একটু আগে একজন কালো চশমা আর খাকি পোশাক পরা লোক পাগলের মতন ছুটতে ছুটতে পথের উপরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে যায়, তার সমস্ত পোশাকে আগুন লেগে গিয়েছিল। আমরা কয়জন মিলে তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছি বটে, কিন্তু সে বাঁচবে বলে মনে হয় না। লোকটা যেখানে পড়ে গিয়েছিল সেইখান থেকে এই ভাঙা চশমা আর একখানা চশমার খাপ কুড়িয়ে পেয়েছি।'

ক্ষিপ্র হস্তে জিনিস দুটো কুড়িয়ে জয়ন্ত সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, 'তাকে কোন হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে জানেন?'

-'জানি। মেয়ো।'

জয়ন্ত ফিরে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত স্বরে বললে, 'জাগ্রত হোন সুন্দরবাবু, জাগ্রত হোন। আর এক মিনিট দেরি নয়, এখনি মেয়ো হাসপাতালে ছুটতে হবে।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'বাপরে বাপ, আজ আমার সব দম বেরিয়ে যাবে দেখছি। ঘটনার পর ঘটনা-এ যে ঘটনার মহাবন্যা!'

রামবাবুর লেন

গঙ্গার ধারে মেয়ো হাসপাতাল। প্রবেশপথ স্ট্রান্ড রোডের উপর।

জয়ন্ত হাসপাতালের ভিতরে প্রবেশ করল সদলবলে। সেখানে তাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল নূতন বিস্ময়!

আগুনে-পোড়া কোনো লোককে নিয়ে সেদিন কেউ হাসপাতালে আসেনি।

বোকার মতন মাথা চুলকাতে লাগল জয়ন্ত। কোনো হদিস খুঁজে না পেয়ে আর সকলেও অবাক।

জয়ন্ত ভাবতে লাগল নীরবে।

প্রথমেই মুখ খুলল মানিকের। সে বললে, 'আমার কী সন্দেহ হচ্ছে জানো? অপরাধীর সঙ্গীরাও ছিল জনতার ভিতরে। তারাই আগুনে পোড়া লোকটাকে নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছে দেবে বলে গাড়িতে উঠে চম্পট দিয়েছে। নইলে একটা মরো-মরো মানুষ এমনভাবে হঠাৎ উবে যেতে পারে না।'

জয়ন্ত বললে, 'আমারও মনে হচ্ছে মানিকের অনুমান সত্য! সুন্দরবাবু যারা বরেনবাবুকে খুন করেছে, তারা সাধারণ অপরাধী নয়। এমন করে বার বার আমাদের চোখে ধুলো দেবার শক্তি যার-তার হয় না। এ মামলাটার কিনারা করতে হলে আমাদের অনেক কাঠখড়ই পোড়াতে হবে দেখছি।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কাঠই বল আর খড়ই বল, আজকে আমি আর কোনোকিছুই পোড়াতে রাজি নই বাবা। আমার গোটা দেহটাই পাকা ফোড়ার মতন টনটন করছে-এই আমি সবেগে ধাবমান হলুম নিজের বাসার দিকে। এখন সামনে চীনের প্রাচীর থাকলেও আমার গতিরোধ করতে পারবে না।'

জয়ন্ত বললে, 'একটু দাঁড়ান সুন্দরবাবু, একটা কথা।'

-'এখনও কথা? সকাল থেকে এত ঝুড়ি ঝুড়ি কথা কয়েও তোমার আশ মিটল না, আরও একটা কথা আছে? কী কথা বলো।'

-'কলকাতায় শ্মশান আছে তিনটে-কাশীমিত্রের ঘাট, নিমতলা আর কেওড়াতলা।'

-'এটা তোমার আবিষ্কার নয়, একথা সবাই জানে।'

-'শুনেছেন তো, যে লোকটা আজ আগুনে পুড়েছে তার বাঁচবার সম্ভাবনা কম? যদি সে মারা পড়ে তার দেহ যেকোনো একটা শ্মশানে নিয়ে যেতে পারে। ওই তিনটে শ্মশানে পাহারার ব্যবস্থা করলে ভালো হয়।'

-'হুম, দেখা যাবে। আর কোনো কথা নেই তো? আর কোনো কথাই আমি শুনব না কিন্তু।'

-'না সুন্দরবাবু, আপাতত আমার কথা ফুরোল।'

সুন্দরবাবুর প্রস্থান। জয়ন্ত ও মানিক বাড়ির পথ ধরলে।

সেইদিনই বিকেলের পর। জয়ন্তের বাড়ির একটি ঘর।

চায়ের পেয়ালা খালি করে জয়ন্ত বললে, 'মানিক এবারের মামলাটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।'

-'কেন?'

-'কারণ প্রথমত, ঘটনাস্থল থেকে কোনো সূত্রই আবিষ্কার করবার সুযোগ আমরা পাইনি। দ্বিতীয়ত, কোন উদ্দেশ্যে বরেনবাবুকে খুন করা হয়েছে? তুমি কি তাঁর কোনো শত্রুর কথা জানো?'

-'না।'

-'উদ্দেশ্যহীন হত্যা করে কেবল পাগল।'

-'কিন্তু আজ আমরা যাদের পাল্লায় পড়েছিলুম, তারা যে পাগল নয়, সে পরিচয় পেয়েছি পদে পদে।'

-'না, পাগল নয়। তারা অতি সুচতুর ব্যক্তি। কেন তারা বরেনবাবুকে খুন করল?'

-'আমি কেমন করে বলব?'

-'তুমি বরেনবাবুর পরিবারবর্গের কথা বলেছিলে। তাঁদের কথা আরও ভালো করে বলো।'

-'বরেনবাবুর দুই বিবাহ। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর আবার তিনি বিবাহ করেন, তাঁর কোনো স্ত্রীরই সন্তান হয়নি।'

-'মানিক, বরেনবাবুর মাসিক আয় ছিল ছয় হাজার?'

-'হ্যাঁ।'

-'অর্থাৎ বাৎসরিক বাহাত্তর হাজার টাকা। বড়ো সামান্য টাকা নয়। এর চেয়ে ঢের কম টাকার জন্যে পৃথিবীতে অনেক নরহত্যা আর রক্তপাত হয়েছে।'

মানিক সচমকে বললে, 'তুমি কি মনে কর, সম্পত্তির লোভেই কেউ বরেনবাবুকে খুন করেছে?'

-'আপাতত আমি কিছুই মনে করি না। গোড়া থেকেই অন্ধের মতো যেকোনো একটা সন্দেহের পিছনে ছুটোছুটি করা আমার স্বভাব নয়। এখন আমার মন হচ্ছে নূতন খাতার মতো, যার উপরে সন্দেহজনক একটি লাইনও লেখা হয়নি। যাক সেকথা। বলো দেখি মানিক, বরেনবাবুর অবর্তমানে তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে কে?'

-'খুব সম্ভব তাঁর ছোটো ভাই।'

-'বরেনবাবুর আর কোনো আত্মীয় নেই?'

-'আছেন। দুই বোন। একজন সধবা, একজন বিধবা। তাঁরা দু-জনেই থাকেন শ্বশুরবাড়িতে।'

-'বরেনবাবুর ছোটো ভাইয়ের নাম কী?'

-'নরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী। বরেনবাবুর পৈতৃক সম্পত্তির বাকি অর্ধাংশ উত্তরাধিকার সূত্রে তিনিও পেয়েছিলেন।'

-'নরেনবাবুর বয়স কত?'

-'ত্রিশের বেশি হবে না।'

-'স্বভাব-চরিত্র?'

-'যতদূর জানি, আর সব দিক দিয়ে ভালোই। অত্যন্ত সরল সজ্জন, নম্র বিনয়ী, পরোপকারী। কিন্তু-'

-'থামলে কেন? কিন্তু কী?'

-'ভীষণ তাঁর ঘোড়দৌড়ের নেশা। অধিকাংশ সম্পত্তি তিনি খুইয়েছেন ঘোড়ার পিছনেই। আগে তাঁর নিজেরও রেসের ঘোড়া ছিল।'

-'আমি নরেনবাবুর সঙ্গে আলাপ করতে চাই।'

-'তিনি এখন দেশে আছেন।'

-'দাদার মৃত্যুর খবর পেলেই নিশ্চয় তিনি কলকাতায় আসবেন।'

-'হ্যাঁ। তাঁদের দু-ভাইয়ের ভিতর অত্যন্ত সদ্ভাব ছিল। দু-জনেই দু-জনকে ভালোবাসতেন।'

-'আজ থাক এ প্রসঙ্গ। এখন অন্য একটা দরকারি কথা শোনো।'

-'বলো।'

-'যে লোকটা কাচের জ্বলন্ত জগ ছুড়েছিল, তার ভাঙা চশমা আর চশমার খাপখানা, আমার হস্তগত হয়েছে, জানো তো? চশমার খাপের ভিতরে একটুকরো চিঠি পেয়েছি। এই নাও, তুমিও পড়ে দেখো।'

কাগজের ভাঁজ খুলে মানিক পড়লে:

'বিজয়, আজ রাত ১০টার সময়ে ১০ নম্বর রামবাবু লেনে আমার সঙ্গে দেখা করতে ভুলো না।'

মানিক শুধোলে, 'রামবাবু লেন কোথায়?'

-'বেহালায়। চিঠির তারিখ দেখেছ? বিজয়ের আজই রামবাবু লেনে যাবার কথা।'

-'চিঠি যে লিখেছে তার নাম নেই।'

-'নামটা আমাদেরই আজ আবিষ্কার করতে হবে। অর্থাৎ বিজয় এখন কুপোকাত, সুতরাং তার বদলে আমরা দু-জনে আজ সন্ধ্যার পরেই রামবাবু লেনে যাত্রা করব। কেমন রাজি?'

-'নিশ্চয়। কিন্তু হুঁশিয়ার। সঙ্গে রিভলবার আনতে ভুলো না যেন।'

দশ নম্বর বাড়ি

সন্ধ্যা এবং রাত্রির সন্ধিক্ষণ। কৃষ্ণপক্ষের একটি রাত। প্রথম দিকে খানিকটা ভাঙা চাঁদের আলো ছিল বটে, কিন্তু তারপরেই পৃথিবী ছেয়ে গেল অন্ধকারে। জয়ন্ত কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর আবিষ্কার করলে রামবাবু লেনের দশ নম্বরকে।

খুব সম্ভব সেটা কোনো বাগানবাড়ি। চারিদিকে প্রাচীর, ফটকের রেলিংয়ের ভিতর দিয়ে ঝাপসা ঝাপসা দেখা যাচ্ছে, গাছপালার মাঝখানে একখানা বড়ো একতলা বাড়ি। কিন্তু ফটকে বাহির থেকে তালা দেওয়া। বাড়ির কোনো দরজা জানালার ফাঁক দিয়েও চোখে পড়ে না এতটুকু আলোর রেখা।

জয়ন্ত বললে, 'দেখে মনে হচ্ছে বাড়িখানা খালি। এখনও তো দশটা বাজতে অনেক দেরি, আপাতত আমাদের কী করা উচিত, মানিক?'

-'হয় পাঁচিল টপকে ভিতরে যাওয়া, নয় রাস্তার ওপাশের গাছে চড়ে উপর থেকে চারিদিকে নজর রাখা।'

-'উত্তম। আমরা শেষোক্ত উপায়ই অবলম্বন করব। এসো ভায়া, খানিকক্ষণ শাখামৃগের ভূমিকায় অভিনয় করা যাক।'

খানিকক্ষণ কাটল। দ্রুতবেগে অস্ত যাবার চেষ্টা করছে আজকের অনতি-উজ্জ্বল চাঁদ।

জয়ন্ত বললে, 'বাঁদরগুলো আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতালে না বটে, কিন্তু মশার দল কেমন সানন্দে ব্যান্ড বাজিয়ে আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছে দেখো।'

মানিক নিজের দেহের উপরে ঘন ঘন চপেটাঘাত করে মশকদের অভ্যর্থনার উত্তর দিতে দিতে বললে, 'এ সময়ে সুন্দরবাবুর অভাব অনুভব করছি। এখানে তিনি এখন থাকলে এই সব অনাহূত মশকের উদ্দেশ্যে যেসব চোখা চোখা বচন ঝাড়তেন, কোনো অভিধানেই তা খুঁজে পাওয়া যেত না।'

আরও কিছুক্ষণ গেল। নীচের রাস্তা দিয়ে মাঝে মাঝে লোকজন যাচ্ছে বটে, কিন্তু তাদের কেউ সেই দশ নম্বরের বাগানের দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। বেজে গেল রাত দশটা, চাঁদ গেল অস্ত। পৃথিবীর নাট্যশালায় নিরন্ধ্র অন্ধকারের প্রবেশ।

জয়ন্ত বললে, 'অন্ধকার আজ আমাদের চোখ অন্ধ করতে পারবে না। বাগানবাড়ির ফটকের পাশেই একটা সরকারি আলো রয়েছে। আমাদের ফাঁকি দিয়ে কারুর পক্ষেই ফটকের ভিতরে ঢোকা সম্ভব হবে না।'

মানিক বললে, 'কিন্তু কেউ কি আজ ওই ফটক খুলতে আসবে? আমার তো মনে হয় বিজয়ের দুর্ঘটনার জন্যে আজ ওদের আড্ডা আর বসবে না।'

-'তা অসম্ভব নয়। তবু আরও কিছুক্ষণ পাহারা দেওয়া যাক।'

রাত এগারোটা বাজল।

মানিক বললে, 'ভাই জয়ন্ত, আর নয়। খামোকা মশাদের রক্ততৃষ্ণা নিবারণ করে লাভ নেই। পুনর্বার ভূমিষ্ঠ হওয়া যাক।'

-'তথাস্তু, কিন্তু বাগানের ভিতরটায় একবার চোখ না বুলিয়ে এ স্থান আমি ত্যাগ করব না।' গাছ থেকে নামতে নামতে বললে জয়ন্ত।

রাস্তায় আর পথিকদের পদশব্দ নেই। বোবা ও অন্ধ রাতে কালো চাদরে গা-ঢাকা দিয়ে শব্দ সৃষ্টি করছে খালি প্যাঁচার দল। বাদুড়দের ডানা নাড়াও শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে।

জয়ন্ত ও মানিক হাজির হল প্রাচীরের ওপারে, বাগানের ভিতরে।

অন্ধকারে ছায়ার মতন খানিকক্ষণ এদিকে-ওদিকে ঘুরে জয়ন্ত বলল, 'এত বড়ো বাগান, এত বড়ো বাড়ি এমন খালি পড়ে থাকা স্বাভাবিক নয়। মালির ঘর পর্যন্ত বাহির থেকে তালা বন্ধ। এ যেন কেমন কেমন মনে হচ্ছে। এসো মানিক, একবার বাড়ির ভিতরটা পরীক্ষা করা যাক।'

দালান পার হয়েই সামনে যে দরজাটা পাওয়া গেল তা কুলুপ আঁটা ছিল না। জয়ন্ত ও মানিক ভিতরে প্রবেশ করে টর্চের আলোতে দেখলে, সেটা হচ্ছে হলঘরের মতো। বেশ সাজানো-গুছানো। বড়ো বড়ো ছবি, আরশি, মার্বেলের টেবিল, সোফা, কৌচ, শ্বেতপাথরের মূর্তি। একদিকে ঢালা বিছানা পাতা, তার উপরে তাকিয়ার ভিড়।

জয়ন্ত বললে, 'এ ঘর ব্যবহার করা হয়, দরজা পর্যন্ত খোলা, অথচ বাড়িতে মানুষ নেই। সন্দেহজনক! রিভলবার বার করো মানিক, রিভলবার বার করো!' বাড়ির অন্য ঘরগুলো সাবধানে দেখতে হবে। টর্চের আলো নিবিয়ে তারা অগ্রসর হল বাইরের দিকে।

আচম্বিতে সেই অন্ধকারে কোথা থেকে কেমন করে অনেকগুলো মূর্তি বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল জয়ন্ত ও মানিকের উপরে। এত হঠাৎ এই অভাবিত ঘটনাটা ঘটল যে, তারা বাধা দেবার বা একখানা হাত তোলবার সময়টুকু পর্যন্ত পেল না।

তারপর শোনা গেল এক অর্ধকর্কশ এবং অর্ধকোমল আশ্চর্য কণ্ঠস্বর। এক জন মানুষের গলা দিয়ে একসঙ্গেই কথা কইছে যেন দুই জন মানুষ।

-'বেঁধে ফেল, ওদের দু-জনেরই হাত পিছমোড়া করে বেঁধে ফেল।'

কে বললে, 'বড্ড অন্ধকার যে! আলো জ্বালব নাকি?'

-'না, না, খবরদার! আমাদের শ্রীমুখগুলো দর্শনের সৌভাগ্য ওদের আমি দিতে রাজি নই।'

-'একটু পরেই তো ওদের প্রাণপাখি গাঁটছাড়া হবে। এখন আর ওদের ভয় করবার দরকার কী?'

-'ভয়! আমি কি ভয় পাবার ছেলে? ভয় নয় রে, ভয় নয়, এ হচ্ছে সাবধানতা। জানিস তো, সাবধানের মার নেই!'

জয়ন্ত ও মানিকের হাতে পড়ল কঠিন বাঁধন। কারা তাদের টর্চ আর রিভলবার কেড়ে নিলে।

সেই উদ্ভট কণ্ঠস্বর বললে, 'শোনো মহাগোয়েন্দা জয়ন্ত! ঘরের ভিতরে আমরা আছি দশ জন লোক, আর আমাদের চার জনের হাতে আছে গুলিভরা রিভলবার। তোমরা যদি চ্যাঁচাবার চেষ্টা কর, তাহলে সেই চিৎকারই হবে তোমাদের এ জীবনের সর্বশেষ চিৎকার। অতএব বোকা হয়ে কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থাকো।'

দুরাগতশব্দানুকরণবিদ্যা

অর্ধকর্কশ ও অর্ধকোমল কণ্ঠস্বর প্রশ্ন করলে, 'জয়ন্ত, তুমি আমাদের বন্দি করতে চাও?'

জয়ন্ত বললে, 'তুমি হুকুম দিয়েছ আমাদের বোবা হয়ে থাকতে। তবে আবার প্রশ্ন করছ কেন?'

-'আচ্ছা, নতুন হুকুম দিচ্ছি, আস্তে আস্তে কথা কইতে পারো।'

-'কী অনুগ্রহ!'

-'ব্যঙ্গ রাখো। বলো, তুমি এসেছিলে আমাদের বন্দি করতে?'

-'তুমি যে কোন মহাপুরষ তা না জেনে কেমন করে বলি তোমাকে আমি বন্দি করতে চাই কি না?'

-'আত্মপরিচয় দেবার ইচ্ছা আমার নেই।'

-'তাহলে তোমার প্রশ্নও হয়ে রইল উত্তরহীন।'

-'তবে কি তুমি এখানে এসেছিলে কেবলমাত্র নির্মল বায়ু ভক্ষণ করতে?'

-'তাও না।'

-'তবে?'

-'সত্য কথা বলব?'

-হ্যাঁ। আমি নিজে প্রায়ই সত্য কথা বলি না, কিন্তু আমি সত্য কথা শুনতে ভালোবাসি।

-'তোমার কথাগুলো রবি ঠাকুরের কবিতার মতো নয়।'

-'মানে?'

-'তুমি ভারি স্পষ্ট ভাষায় কথা কইছ।'

-'হ্যাঁ, আমি স্পষ্ট কথাই বলতে চাই, আর শুনতে চাই।'

-'সাধু, সাধু!'

-'আবার ব্যঙ্গ? বলো কেন তুমি এখানে এসেছিলে?'

-'তোমার প্রশ্ন যে আর একটা নূতন হুকুমের মতন শোনাচ্ছে!'

-'হ্যাঁ, তাই। কেন এখানে এসেছিলে?'

-'যদি না বলি?'

-'বধ করব!'

-'যদি বলি?'

-'তাহলেও তোমরা বাঁচবে না।'

- 'হরেদরে সেই হাঁটু জল?'

-'হাঁটু জল নয় বাবা, গভীর জল!'

-'বুঝলুম না।'

-'তোমাদের হাত-পা বেঁধে, থলেয় পুরে এই বাগানের পুকুরে গভীর জলে নিক্ষেপ করব।'

-'খাসা! মৃত্যুটা রোমান্টিক হবে বলে মনে হচ্ছে।'

-'শোনো মহাগোয়েন্দা জয়ন্ত!'

-'কী হুকুম জনাব?'

-'তোমরা এখানে কেন এসেছিলে আমার মুখেই শুনবে?'

-'জনাব হাত গুনতে জানেন?'

-'ওরে হাঁদারাম, আমি হাত গুনতে জানি না। আমি জানি দুইয়ের সঙ্গে দুই যোগ করলে চার ছাড়া কিছুই হতে পারে না।'

-'অপূর্ব আবিষ্কার।'

-'আবিষ্কার নয়রে, সহজ সত্য।'

-'সত্য কোনোদিনই সহজ নয়।'

-'তাই নাকি?'

-'হ্যাঁ। সত্য সহজ হলে খ্রিস্টদেবকে ক্রসে বিদ্ধ হয়ে প্রাণ দিতে হত না।'

-'তুমি খালি মহাগোয়েন্দা নও, মহাদার্শনিকও।'

-'দর্শন-অর্থাৎ ভালো করে দর্শন করাই হচ্ছে গোয়েন্দার প্রধান আর প্রথম কর্তব্য।'

-'তাহলে শোনো। আজ সকালে তোমার চর্মচক্ষু যা দর্শন করেছিল, তা ঠিক নয়?'

-'কথাটা ভালো করে বুঝিয়ে দাও।'

-'তুমি একখানা চিঠি পড়ে এখানে এসেছ তো?'

-'হ্যাঁ।'

-'সেই চিঠিতে বিজয় নামে কোনো ব্যক্তিকে এই বাগানবাড়িতে আসতে বলা হয়েছিল?'

- 'হুঁ।'

-'সেই চিঠিখানা লিখেছিলুম আমিই।'

-'তারপর?'

-'কিন্তু বিজয় নামধারী কোনো ব্যক্তিকেই আমি চিনি না।'

-'বটে!'

-'ওই চিঠির বিজয় হচ্ছে কাল্পনিক ব্যক্তি।'

-'এতখানি কল্পনাশক্তি প্রয়োগের কারণ কী?'

-'আমি তোমাকে ভুলিয়ে এখানে আনতে চেয়েছিলুম।'

-'ভুলিয়ে?'

-'হ্যাঁ। চিঠিসুদ্ধু চশমার খাপখানা আমরা ইচ্ছে করেই সেখানে ফেলে রেখে এসেছিলুম। কারণ আমি জানতাম, চিঠিখানা তোমাদের হস্তগত হবেই।'

-'তোমার কথা শুনে কবি মাইকেলের ভাষায় কথা বলতে সাধ হচ্ছে-তব বাক্যে ইচ্ছা মরিবারে। আমাকে এখন গাধা বললেও রাগ করব না।'

-'ফাঁদে পা দিয়েছ। এখন আর আত্মলাঞ্ছনা করে লাভ নেই।'

-'আমার মতন গাড়োলের বেঁচে থাকা উচিত নয়।'

-'তা তুমি বাঁচবেও না। তুমিও না, তোমার বন্ধুও নয়।'

-'কিন্তু তোমার এ আদেশ আমি শিরোধার্য করতে রাজি নই।'

-'দেখা যাবে। এই সঙ্গে ভুঁদো সুন্দর গোয়েন্দাকেও যমালয়ের পথে পাঠাতে পারলে সুখী হতুম। তার উপরে আমার অনেক দিনের রাগ।'

-'যাক, তোমার একটা পরিচয় পাওয়া গেল। সুন্দরবাবুর উপর তোমার অনেক দিনের রাগ, তাহলে তুমি একজন পুরোনো পাপী, তোমার নাম জানা আর অসম্ভব হবে না।'

-'মূর্খ, নাম জানবার সময় পাবে কখন? তুমি যে কালকে সূর্যোদয় পর্যন্ত দেখতে পাবে না।'

-'তোমার এ ধারণা ভ্রান্ত।'

দু-রকম গলায় শোনা গেল একজনের অট্টহাস্য। তারপর হঠাৎ হাসি থামিয়ে সে বললে, 'ধারণা ভ্রান্ত! মরবার ভয়ে তোর মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি রে?'

-'মরব না আমি, মরবে তুমি।'

-'আমায় কে মারে?'

-'সুন্দরবাবু।'

-'কোথায় সে?'

-'এইখানে, এই বাগানে।'

-'আমি কি প্রলাপ শুনছি।'

-'মোটেই নয়। ওই শোনো সুন্দরবাবুর গলা। তিনি সদলবলে তোমাদের গ্রেপ্তার করতে আসছেন।'

-'কই, আমি কারুর গলাই শুনছি না।'

জয়ন্ত চিৎকার করে ডাকলে, 'সুন্দরবাবু, সুন্দরবাবু!'

দূর থেকে সাড়া এল, 'যাচ্ছি ভায়া, কোনো ভয় নেই।'

-'সুন্দরবাবু শিগগির আসুন।'

আরও কাছ থেকে সাড়া এল-'এই যে আমরা এসে পড়েছি।'

পর মূহূর্তে দ্রুত পদশব্দ তুলে ঘরের লোকগুলো বাইরে পলায়ন করলে দারুণ আতঙ্কে।

মানিক সবিস্ময়ে বললে, 'সুন্দরবাবুকে তুমি কখন খবর দিলে?'

অন্ধকারে মৃদু হাস্য করে জয়ন্ত বললে, 'কোথায় সুন্দরবাবু? তুমি কি ভুলে গিয়েছ, আমি ভেন্ট্রিলোকুইজম জানি? এদেশি ভাষায় তার একটি গালভরা নাম আছে-দূরাগতশব্দানুকরণ বিদ্যা! দেখছ তো ভায়া, যথাসময়ে সব বিদ্যাই কাজে লাগে!'

সুন্দরবাবু নিদ্রাচর নন

জয়ন্তদের চায়ের আসর। তরল পানীয়ের সঙ্গে নিরেট খাবারেরও অভাব নেই-স্যান্ডউইচ, নিমকি, ডিম, কেক। জয়ন্ত ও মানিক চায়ের সঙ্গে দুই টুকরো টোস্ট পেলেই তৃপ্ত হত, কিন্তু এই প্রভাতি চায়ের বৈঠকটিকে প্রত্যহই অলংকৃত করতেন সুন্দরবাবু। তাঁর কথা স্বতন্ত্র। ভূরিভোজন ছাড়া তাঁর অসাধারণ উদরদেশটি পুলকিত হতে চাইত না কোনোদিন।

যথাসময়ে সুন্দরবাবুর প্রবেশ। এসেই তিনি বলে উঠলেন, 'হুম! চা-টা শুরু হয়ে গেছে দেখছি। যা কাজের ভিড়! ঘড়ির কাঁটা ধরে আসা অসম্ভব।'

মানিক বললে, 'সাধু সুন্দরবাবু, সাধু! কাল রাতে আমাদের জন্যে অত খাটুনি খেটেও আজ সকালেই আবার কাজের ভিড়ের ভিতরে গিয়ে ঢুকে পড়েছেন? ধন্য আপনার কর্তব্যনিষ্ঠা!'

সুন্দরবাবু দস্তুরমতো ভয় করতেন মানিকের মুখরতাকে। মনে মনে সে কী নতুন দুষ্টুমির ফন্দি আঁটছে বুঝতে না পেরে তিনি বললেন, 'কাল রাতে আমি আবার তোমাদের জন্যে কখন খেটে মরেছি? তুমি কি সকালের কথা বলছ? হ্যাঁ, কাল সকালে আমি দু-দু-বার রামআছাড় খেয়েছি বটে। গায়ের ব্যথা এখনও মরেনি।'

মানিক বললে, 'না, না, আমি কালকের রাতের কথাই বলছি।'

সুন্দরবাবু হতভম্বের মতন বললেন, 'মানিক কী বলতে চায় জয়ন্ত? কাল রাতে আমি তো শয্যাশায়ী ছিলাম, গায়ের ব্যথা কমাবার জন্যে স্ত্রীকে বার বার ওষুধ মালিশ করে দিতে হয়েছিল।'

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, 'হ্যাঁ সুন্দরবাবু, কাল রাত্রে আমরা প্রাণে বেঁচেছি কেবল আপনার জন্যেই। তা সেকথা পরে হলেও চলবে, আগে আপনি চা খান, চা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে!'

-'হোক গে চা ঠান্ডা। তোমাদের আজব কথা শুনে এদিকে যে আমার মাথা গরম হয়ে উঠেছে। কাল রাত্রে আমি তোমাদের প্রাণ বাঁচাবার কোনো চেষ্টাই করিনি।'

মানিক গদগদ কণ্ঠে বললে, 'আহা, আমাদের সুন্দরবাবু কি বিনয়ী!'

-'বিনয়ের নিকুচি করেছে! আমি হলপ করে বলতে পারি, কাল সন্ধ্যা থেকে আজ সকাল পর্যন্ত বিছানা ছেড়ে একবারও নামিনি।'

-'সুন্দরবাবু, ভয়ে ভয়ে একটা কথা বলব?'

-'কথা আবার কী?'

-'আপনি সোমন্যামব্যুলিস্ট নন তো?'

-'মানে?'

-'আপনার নিদ্রাভ্রমণের ব্যাধি নেই তো?'

-'ও ব্যাধি শত্রুর হোক। তোমার হলেও আমি দুঃখিত হব না।'

-'আমি কি আপনার শত্রু?'

-'মাঝে মাঝে আমার সেই সন্দেহই হয়!'

-'আচ্ছা সুন্দরবাবু, আপনি কি বলতে চান, কাল রাতে বেহালার এক বাগানবাড়িতে আপনারা পাহারা দিতে যাননি?'

-'অসম্ভব মিথ্যা কথা!'

-'সেই বাগানে একদল লোকের হাতে আমরা হয়েছিলাম বন্দি। আপনিই আমাদের উদ্ধার করে এনেছেন।'

-'আরব্য উপন্যাসের যেকোনো গল্প এর চেয়ে সত্য। তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে মানিক!'

-'জয়ন্ত আমার সাক্ষী।'

-'শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল।'

জয়ন্ত হো-হো করে হেসে উঠে বললে, 'রাগ করবেন না সুন্দরবাবু। আসুন, এই চেয়ারে এসে বসুন। এই নিন স্যান্ডউইচ, এই নিন নিমকি, ডিম, কেক। এইবারে খেতে খেতে চুপ করে আমার কথা শুনুন। মানিক একেবারে অমূলক কথা বলছে না।'

সুন্দরবাবু খাবারের থালার দিকে হাত বাড়িয়েছিলেন, কিন্তু আবার হাতখানা টেনে নিয়ে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'তোমারও মতে মানিক সত্য কথাই বলছে? তাহলে এই রইল তোমার চায়ের পেয়ালা, এই রইল স্যান্ডউইচ আর যত কিছু ঘোড়ার ডিম। হুম! এই পাগলগারদ ছেড়ে আমি এখন থানায় পলায়ন করতে চাই!'

-'আরে শুনুন মশাই, শুনুন। আপনি ঘটনাস্থলে স্বশরীরে হাজির থেকে আমাদের বাঁচাননি বটে, কিন্তু আমরা প্রাণে বেঁচেছি আপনারই নামের জোরে।'

-'বটে! তাই নাকি? সুন্দরবাবু আবার বাহুবিস্তার করলেন, তারপর একখানা গোটা স্যান্ডউইচ বদনবিবরে নিক্ষেপ করে বললেন, 'আচ্ছা, তাহলে তোমাদের কাহিনি শুনতে আমি নারাজ নই, বলো!'

জয়ন্তের কাহিনি শুনতে শুনতে সুন্দরবাবু দুই চক্ষু ক্রমেই বিস্ফারিত হয়ে উঠতে লাগল। তিনি আহার্য গ্রহণ করতেও ভুলে গেলেন, মুখব্যাদন করে অবাক হয়ে কেবল গল্পই শুনতে লাগলেন। তারপর জয়ন্তের গল্প ফুরোল এবং শুরু হল সুন্দরবাবুর হো-হো-হো-হো হাসির ঘটা। দুই হাতে ভুড়ি চেপে ধরেও তিনি মিনিট তিনেকের আগে দমন করতে পারলেন না সেই সর্বনেশে হাসির বিষম ধাক্কা।

অনেক কষ্টে আত্মস্থ হয়ে সুন্দরবাবু বললেন, 'জয়ন্ত আমি স্বীকার করছি, তুমি একটি জিনিয়াস। একেই বলে শূন্যহাতে কড়ি খেলা! তোমার প্রত্যুৎপন্নমতি হচ্ছে বিস্ময়কর। কিন্তু বড়োই দুর্ভাগ্যের বিষয় ভায়া, অপরাধীদের পালের গোদাকে একবারও তুমি দেখতে পেলে না।'

-'সে জন্যে দায়ী অন্ধকার।'

-'কী বললে? লোকটার গলার আওয়াজ আধাকর্কশ আধা-কোমল?'

-'হ্যাঁ। শুনলে মনে হয়, এক জন মানুষ যেন দু-জনের গলায় কথা কইছে। এরকম কণ্ঠস্বর আমি জীবনে আর কখনো শুনিনি। আপনি শুনেছেন?'

-'কই মনে পড়ছে না তো!'

-'ভালো করে মনে করে দেখুন। সে আপনাকে চেনে। আপনার উপরে তার ভারি আক্রোশ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে হচ্ছে পুরাতন পাপী, কখনো-না-কখনো আপনার পাল্লায় গিয়ে পড়েছিল, আর আপনার কাছ থেকে জামাই আদর সে পায়নি।'

সুন্দরবাবু স্মৃতিসাগরে নিজের মনকে ডুবিয়ে দিয়ে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। কিন্তু তাঁর মন স্মৃতিসাগর আলোড়িত করেও নূতন কোনো তথ্য সংগ্রহ করতে পারলেন না।

জয়ন্ত বললে, 'বেশ, তাহলে আর এক কাজ করবেন। সেই বাগানবাড়িখানার আশেপাশে পুলিশের গুপ্তচর মোতায়েন রাখবেন।'

-'বেশ, পাহারার ব্যবস্থা করব।'

হঠাৎ বেজে উঠল টেলিফোনের ঘণ্টা। জয়ন্ত ফোন ধরে বললে, 'হ্যালো!'

মিনিট খানেক পরে ফোন ছেড়ে দিয়ে জয়ন্ত তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে পাশের দেয়াল আলনা থেকে জামাটা টেনে নিয়ে বললে, 'সুন্দরবাবু উত্তিষ্ঠিত! জাগ্রত! নিমতলার শ্মশানে এইমাত্র একটা আগুনে-পোড়া মৃতদেহ এসেছে। চলো মানিক, জলদি।'

কালো, রোগা, ঢ্যাঙা

নিমতলার শ্মশান। সুন্দরবাবুর সঙ্গে জয়ন্ত ও মানিক মোটর থেকে নেমে পড়ল। কিন্তু আবার ব্যর্থতা। একটা পুড়ে-মরা মানুষের লাশ পাওয়া গেল বটে, কিন্তু সেই মৃতদেহটা নিয়ে যারা এখানে এসেছিল, তাদের কোনোই পাত্তা পাওয়া গেল না।

পুলিশের যে জমাদারকে শ্মশানের উপরে নজর রাখবার জন্যে নিযুক্ত করা হয়েছিল তার দিকে ফিরে সুন্দরবাবু বললেন, 'তুমি কি বাপু সাক্ষী গোপালের মতো হাঁ করে তাকিয়ে বসে বসে গঙ্গার ঢেউ গুনছিলে?'

জমাদার বললে, 'আমার কোনো দোষ নেই হুজুর। লাশ তো আমিই আটকেছিলুম।'

-'যারা লাশ এনেছিল তাদের আটকালে না কেন?'

-'তারা ডাক্তারের সার্টিফিকেট দেখালে। আমি বললুম, ওতেও চলবে না। থানার বড়োবাবু এসে যদি হুকুম দেন, তবেই তোমরা লাশ পোড়াতে পারবে। তাদের একজন বললে, বেশ, লাশ এখানেই রইল, আমরা লরিতে বসে তোমাদের বড়োবাবুর জন্যে অপেক্ষা করছি।'

-'লরি?'

-'হ্যাঁ হুজুর। মড়াটা এনেছিল তারা একখানা লরির উপরেই চাপিয়ে।'

-'তারপর?'

-'তারা আবার লরির উপরে গিয়ে উঠল। তারপর লরিখানা হুস করে ছুটে চোখের আড়ালে চলে গেল।'

-'আর তুমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলে?'

-'তা ছাড়া আর কী করব হুজুর? মানুষ তো লরির সঙ্গে ছুটতে পারে না।'

-'লরিতে ক-জন লোক ছিল?'

-'চার জন।'

-'তাদের আবার দেখলে চিনতে পারবে?'

-'সবাইকে ভালো করে দেখবার সময় পাইনি। তবে যে লোকটা আমার সঙ্গে কথা কইছিল, তার চেহারা আমার মনে আছে।'

-'সে কীরকম দেখতে?'

-'খুব কালো, খুব রোগা আর খুব ঢ্যাঙা; চোখে কালো চশমা।'

-'হুম! জয়ন্ত, শুনছ?'

-'শুনছি। কিন্তু শুনে কী হবে, তাকে তো ধরতে পারলুম না!'

-'তারপর জমাদার, তুমি ডাক্তারের সার্টিফিকেটের কথা কী বলছিলে না?'

-'হ্যাঁ হুজুর, এই নিন সেই সার্টিফিকেট।'

জয়ন্ত বললে, 'সুন্দরবাবু, ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আর সময় নষ্ট করবেন না। আমি হলপ করে বলতে পারি ওখানা হচ্ছে জাল সার্টিফিকেট। তার চেয়ে লাশটাকে দেখবেন চলুন যদি কোনো সূত্র পাওয়া যায়।'

শ্মশানের আঙিনার উপরে ছিল মৃতদেহটা। মড়াটাকে পাহারা দিচ্ছিল একজন জীবন্ত লালপাগড়ি। খাটের উপর থেকে নূতন কাপড়ের আবরণ সরিয়ে দেখা গেল একটা ভয়াবহভাবে অগ্নিদগ্ধ মানুষের বিকৃত দেহ।

সুন্দরবাবু বললেন, 'এখন এই লাশটাকে কী করা যায় জয়ন্ত?'

-'মর্গে পাঠিয়ে দিন। এর ফটো তুলে কাগজে বিজ্ঞাপন দিন; দেখুন যদি কেউ শনাক্ত করতে পারে।'

-'তুমি নূতন কোন সূত্র-টুত্র আবিষ্কার করতে পারলে?'

-'উঁহু।'

-'এখন কী করতে চাও?'

-'সূত্র আবিষ্কারের জন্য অন্য কোথাও যাত্রা করতে চাই।'

-'সে কোথায়?'

-'বরেনবাবুর বাড়িতে।'

-'সেখানকার সব সূত্র তো অগ্নিদেব গ্রাস করেছেন।'

-'আমি জানতে চাই, বরেনবাবুর ছোটো ভাই কলকাতায় এসেছেন কি না?'

-'নরেন্দ্রসুন্দর রায়চৌধুরী?'

-'হ্যাঁ।'

-'বেশ, চলো।'

সকলে মোটরে গিয়ে উঠল। খানিক পরেই গাড়ি বরেনবাবুর বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তখনও সেখানে আগুন জ্বলছিল না বটে, কিন্তু সেই অসম্পূর্ণ বাড়িখানার চারিদিকেই বিরাজমান ক্রুদ্ধ অগ্নিশিখার কালো দংশনচিহ্ন।

-'সদর দরজার চৌকাঠের উপরে ম্রিয়মান মুখে উপুড় হয়ে বসেছিল বরেনবাবুর প্রিয় ভৃত্য।'

মানিক শুধোলে, 'কী হে, তোমাদের ছোটোবাবু খবর পেয়ে দেশ থেকে এসেছেন?'

-'আজ্ঞে হ্যাঁ, আজ সকালেই এসেছেন।'

-'আর কে এসেছেন?'

-'আর কেউ না। খবর শুনে গিন্নিমা পাগলের মতো হয়ে গিয়েছেন। তিনি আসতে পারেননি।'

-'আমরা নরেনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

-'তিনি তো এখানে নেই।'

-'তবে কোথায় আছেন?'

-'বাবুর ছোটো বোনের বাড়িতে।'

-'অন্নপূর্ণা দেবীর বাড়িতে?'

-'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

মানিক ফিরে বললে, 'জয়ন্ত অন্নপূর্ণা দেবীর বাড়ি আমি চিনি। সেখানে বার-দুয়েক নিমন্ত্রণ খেয়ে এসেছি।'

-'উত্তম। তুমিই আমাদের পথপদর্শক হও। আমাদের কোথায় যেতে হবে?'

-'বারাণসী ঘোষ স্ট্রিট।'

সুন্দরবাবু গজগজ করে বললেন, 'আমরা যেন স্রোতের শ্যাওলা ক্রমাগতই ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছি। শেষ পর্যন্ত ভাসতে ভাসতে কোথায় গিয়ে যে ঠেকব বাবা, তা ভগবানও জানেন কি না সন্দেহ!'

মানিক বললে, 'দুনিয়ার মালিক ভগবানের হাতে অনেক কাজ। আমরা কোথায় ঠেকব কি ঠেকব না, তা নিয়ে ভাববার সময় তাঁর নেই।'

গাড়ি প্রবেশ করল বারাণসী ঘোষ স্ট্রিটের ভিতরে।

মানিক বললে, 'ওই বাড়িখানা, ওই যে সামনে একখানা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে।'

অন্নপূর্ণা দেবীর বাড়ির ভিতর থেকে একজন লোক বেরিয়ে এসে ট্যাক্সির উপরে চড়ে বসল। ট্যাক্সিখানা সচল হয়ে জয়ন্তদের গাড়ির পাশ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল।

আচম্বিতে জয়ন্তও নিজের গাড়ির মোড় ফিরিয়ে নিলে।

মানিক সবিস্ময়ে বললে, 'ও কি, কোথা যাও?'

জয়ন্ত বললে, 'ওই ট্যাক্সির পিছনে।'

-'কেন হে?'

-'দেখতে পেলে না, সেই খুব কালো, খুব রোগা আর ঢ্যাঙা লোকটা।'

ঘুঘুর চাতুরি

মোটরের মোড় ফিরিয়েই জয়ন্ত দেখল, ট্যাক্সিখানা হঠাৎ ডান দিকের একটা রাস্তা ধরে স্যাঁৎ করে অদৃশ্য হয়ে গেল। জয়ন্তও সেই রাস্তা ধরলে।

ট্যাক্সির গতি তখন হয়ে উঠেছে দ্রুততর। জয়ন্তদের মোটরেরও গতি বেড়ে উঠল। দু-খানা গাড়ির সেই মারাত্মক দৌড় দেখে সচকিত পথিকরা ছত্রভঙ্গ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে।

সুন্দরবাবু উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'হা-রে-রে-রে কালো চশমা, আজ তোকে খাপে না পুরে ছাড়ব না। বারে বারে ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান; এবার বধিব আমি তোমার পরাণ। হুম হুম হুম! আরও জোরে জয়ন্ত, আরও জোরে।'

মানিক বললে, 'না, আরও জোরে নয়। আরও জোরে গাড়ি ছোটালে ঘুঘু বধের আগেই পথের পথিক বধ হবে।'

জয়ন্ত বললে, 'ঠিক বলেছ মানিক। খুনি ধরতে গিয়ে আমরাও মানুষ খুন করব নাকি? তার চেয়ে তুমি এক কাজ করো, ট্যাক্সিখানা রিভলবারের নাগালের বাইরে যায়নি। তুমি গুলি ছুড়ে ওর টায়ার ফুটো করে দাও,

পারবে?'

মানিক রিভলবার বার করে ঘোড়া টিপলে, এক বার, দুই বার, তিন বার। তৃতীয় গুলি বিদ্ধ করলে একখানা টায়ারকে। দুম করে জাগল এক আর্তনাদ। ট্যাক্সির দৌড় বন্ধ। তার পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ল জয়ন্তদের মোটর।

গাড়ি থেকে নেমে ট্যাক্সির হুডের তলায় মাথা চালিয়ে হতভম্ব সুন্দরবাবু বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'আরে এ যে ভানুমতীর খেল! কোথায় সেই বেটা কালো চশমা?'

জয়ন্ত তিক্ত হাসি হেসে বললে, 'আপনার ঘুঘু এবারেও ফাঁকি দিয়েছে ফাঁদকে।'

-'কিন্তু কেমন করে?'

-'ট্যাক্সির ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করুন।'

-'এই উল্লুক, এই ড্রাইভার!'

-'হুজুর!'

-'আর হুজুর বলে আদিখ্যেতা করতে হবে না। সোজা জবাব দে। তোর বাবু বেটা গেল কোথায়?'

-'ও রাস্তা থেকে মোড় ফিরতেই বাবু আমার দিকে তিনখানা দশ টাকার নোট ছুড়ে দিয়ে লাফিয়ে পড়ে বললেন, 'ভাড়া আর বকশিস। জোরসে গাড়ি চালাও, থেমো না।'

-'আর তুমিও তার হুকুমে ভোঁ দৌড় মারলে?'

-'দু-তিন টাকার জায়গায় ত্রিশ টাকা পেলে কে না শোনে হুজুর?কিন্তু আমার লাভের গুড় পিঁপড়েয় খেয়েছে, আপনারা আমার টায়ার ফাটিয়ে দিয়েছেন।'

-'বেশ করেছি, খুব করেছি। এখনও তোর মাথা ফাটাইনি এই তোর ভাগ্যি।'

-'আমার মাথা ফাটাবেন কেন হুজুর?'

-'ডাঙায় এসে তুই নৌকা ডুবিয়ে দিলি বলে।'

-'আমি? আমি কিছুই জানি না হুজুর, ও বাবুকে এর আগে কখনো চোখেও দেখিনি।'

-'বেশ, থানায় গিয়ে ওকথা বলিস।'

-'আমি কেন থানায় যাব?'

সুন্দরবাবু জবাব দিলেন না। তখন গাড়ি ঘিরে ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিল অনেক কৌতূহলী লোক। একজন পাহারাওয়ালাও ছিল। সুন্দরবাবু তারই হাতে সঁপে দিলেন ট্যাক্সিওয়ালাকে।

সুন্দরবাবু বললেন, 'আমার কী মনে হচ্ছে জানো? খুনি আমাদের জয়ন্তের চেয়েও চালাক।'

-'খুনি জয়ন্তের চেয়েও চালাক কি না জানি না, কিন্তু আপনার চেয়ে যে চালাক, সে বিষয়ে আর একটুও সন্দেহ নেই।'

-'যা মুখে আসে বলো বাবা, বলো। তোমার কাছে আমি ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো ছাড়া তো আর কিছু নই।'

-'যা বললুম, সত্য।'

-'প্রমাণ দাও।'

-'যা স্বপ্রকাশ তার জন্যে প্রমাণের দরকার নেই।'

-'মানে?'

-'দুপুর রৌদ্রেও আকাশে সূর্য আছে কি না জানবার জন্যে কেউ প্রমাণের খোঁজ করে না।'

সুন্দরবাবু ক্রোধ কম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'আরে রেখে দাও তোমার বাগাড়ম্বর, আমি খুনির মতো চালাক না হতে পারি, কিন্তু তোমার মতো নিরেট গর্দভ নই।'

জয়ন্ত নিজের মনে কী চিন্তা করছিল। হঠাৎ সে প্রশ্ন করলে, 'মানিক, তোমার কি বিশ্বাস, আমরা নতুন কোনো সূত্র পাইনি?'

-'তাই তো আমার ধারণা।'

-'তোমার ধারণা ভ্রান্ত।'

-'কেন?'

-'বুঝিয়ে দিচ্ছি। তার আগে বলো দেখি, অন্নপূর্ণা দেবী বরেনবাবুর কোন বোন।'

-'সধবা ছোটো বোন।'

-'তাঁর সন্তান আছে?'

-'না।'

-'তুমি বলেছিলে বরেনবাবুর মৃত্যুর পরে তাঁর ভাই নরেনবাবুই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন।'

-'হ্যাঁ।'

-'নরেনবাবুর সন্তানাদি কী?'

-'তিনি বিবাহই করেননি।'

-'জুয়া খেলে, তিনি সম্পত্তির অধিকাংশই উড়িয়ে দিয়েছেন।'

-'হ্যাঁ।'

-'তাহলে এখন তাঁর টাকার টানাটানি।'

-'খুব সম্ভব তাই।'

-'এখনও তাঁর জুয়ার নেশা আছে?'

-'থাকতে পারে, আমি ঠিক জানি না। কিন্তু তুমি এসব প্রশ্ন করছ কেন?'

-'মানিক একটু মাথা ঘামাও। ভালো করে ভেবে দেখো, নরেনবাবু যে বাড়িতে এসে উঠেছেন, সেখান থেকে ওই কালো চশমা পরা রোগা আর ঢ্যাঙা লোকটা বেরিয়ে এল কেন! ও যে খুনিদের দলের লোক, তাতে আর কোনোই সন্দেহ নেই। কিন্তু ওই বাড়ির সঙ্গে ওর কীসের সম্পর্ক? ও লোকটা অন্নপূর্ণা দেবীর স্বামী নয় তো?

-'নিশ্চয়ই নয়! অন্নপূর্ণা দেবীর স্বামীকে আমি চিনি।'

-'তবে কি ও লোকটা নরেনবাবুর বন্ধু?'

-'আমি জানি না।'

-'কিন্তু জানতে হবে মানিক, জানতেই হবে। সর্বাগ্রে ওইটাই জানা দরকার। আজ একটা বড়ো সূত্র পেলুম। চলো নরেনবাবুকে নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে আসি। বন্ধু, মানুষ চেনা বড়ো কঠিন।'

যা করেন মা কালী

পথে আসতে আসতে সুন্দরবাবু হঠাৎ চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'ঠিক, ঠিক, ঠিক।'

মানিক সচমকে বললে, 'কী ব্যাপার? সুন্দরবাবুর মগজের ভিতরে ঝড় উঠল নাকি?'

-'ঝড় নয় মূর্খ, ঝড় নয়।'

-'তবে?'

-'আমি চিন্তা করছিলুম।'

-'চিৎকার করে কেউ চিন্তা করে নাকি?'

-'চিৎকার করে কেউ চিন্তা করে না বটে, কিন্তু চিন্তা করবার পর লোকে অনায়াসেই চিৎকার করতে পারে।'

-'বেশ চিন্তামণি মশাই, আপনার মূল্যবান চিন্তাটা কী শুনি?'

-'এ না হয়েই যায় না।'

-'কী না হয়ে যায় না?'

-'ওই নরেনবাবু-'

-'হ্যাঁ, বলুন।'

-'ওই নরেনবাবুটির উপরে আমার ভীষণ সন্দেহ হচ্ছে।'

-'কেন?'

-'জয়ন্ত ঠিক আন্দাজ করেছে। নরেনবাবু লোকটি বড়ো সহজ মানুষ নয়। খুনিদের দলের সঙ্গে যে সম্পর্ক পাতায়-'

বাধা দিয়ে মানিক বললে, 'থামুন। আপনার চিন্তার দৌড় বুঝতে পেরেছি। আপনার চিন্তাকে এত বেশি দৌড়াদৌড়ি করতে দেবেন না, হোঁচট খেয়ে শেষটা সে খোঁড়া হয়ে যেতে পারে।'

-'বাক্যবাণ ছোড়বার জন্যে তুমিও অত বেশি জিভ নেড়ো না বাপু, জিভখানা শেষে খসে পড়তে পারে।'

দু-জনেরই মুখ বন্ধ হল। গাড়ি আবার এসে থামল অন্নপূর্ণা দেবীর বাড়ির দরজায়।

বেয়ারা মানিককে চিনত। সকলকে বৈঠকখানায় বসিয়ে নরেনবাবুকে খবর দিতে গেল।

কিছুক্ষণ পরে ঘরের ভিতরে নরেনবাবুর প্রবেশ।

সুন্দর চেহারা। একহারা, কিন্তু মানানসই দেহ, টকটকে রং, চোখ-নাক-ঠোঁট যেন তুলি দিয়ে আঁকা। সূক্ষ্ম একটি গোঁফের রেখা। মুখখানি যেন সরলতার প্রতীক। কিন্তু তার ভাবভঙ্গি আজ বিষাদের দ্বারা আচ্ছন্ন।

সকলের উপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে নরেন বললে, 'এই যে মানিকবাবু, নমস্কার। এঁরা কারা?'

জয়ন্ত ও সুন্দরবাবুর পরিচয় দিলে মানিক। নরেনের দুই ভুরু সংকুচিত হল। সে বললে, 'আমার মন আজ ভালো নয়, বেশিক্ষণ কথা কইতে পারব না, এজন্যে অপরাধ নেবেন না।'

জয়ন্ত এতক্ষণ দেওয়ালের একখানা বড়ো আয়নার ভিতরে প্রতিবিম্বিত নরেনের মূর্তির দিকে তাকিয়ে ছিল তীক্ষ্নদৃষ্টিতে। সে ফিরে বললে, 'আজ আপনাকে বেশিক্ষণ কষ্ট দেব না। আপনার কাছে এসেছি কেবল একটি কথা জানবার জন্যে।'

-'কী কথা বলুন।'

-'আজ এই বাড়িতে একটি লোক এসেছিল, তারই পরিচয় জানতে চাই।'

-'আমি কলকাতায় এসেছি শুনে, আজ সকাল থেকেই তো এখানে অনেক লোক আনাগোনা করছেন। আপনি কার কথা জানতে চান?'

-'প্রায় ঘণ্টা খানেক আগে এখানে একটি লোক এসেছিল।'

-'ঘণ্টা খানেক আগে জন-তিনেক লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।'

-'আমি যার কথা বলছি সে একখানা ট্যাক্সিতে চড়ে এসেছিল। সে খুব কালো, খুব রোগা আর ঢ্যাঙা। তার চোখে কালো চশমা।'

-'ও, বুঝেছি। কিন্তু তাকে আমি চিনি না।'

-'চেনেন না?'

-'না। সে কেবল একখানা চিঠি দিতে এসেছিল।'

-'চিঠি? কার চিঠি?'

-'তাও বলতে পারব না।'

-'কেন?'

-'পত্রলেখক পত্রে নিজের নাম সই করেনি। কিন্তু পত্রখানা রহস্যময়।'

-'চিঠিখানা একবার দেখতে পারি।'

নরেন ইতস্তত করে বললে, 'পত্রলেখক চিঠির কথা কারুর কাছে প্রকাশ করতে বারণ করেছে।'

এইবার সুন্দরবাবু কথোপকথনে অংশগ্রহণ করলেন। বললেন, 'মশাই আপনার দাদার হত্যাকারীকে আপনি শাস্তি দিতে চান?'

-'নিশ্চয়!'

-'বরেনবাবুর হত্যাকারীকে আমরা আবিষ্কার না করে ছাড়ব না। এই চিঠিখানার ভিতরে হয়তো কোনো সূত্র থাকতে পারে। সুতরাং-'

-'বেশ, চিঠিখানা দেখুন তাহলে। কিন্তু এর ভিতরে হত্যাকারীর নাম-ধাম কিছুই নেই।' নরেন পকেট থেকে একখানা কাগজ বার করে সমর্পণ করলে জয়ন্তের হাতে।

চিঠিখানা খুলে দুই-তিন পংক্তি পাঠ করেই জয়ন্তের দৃষ্টি হয়ে উঠল সচকিত। নিজের পকেটের ভিতরে হাত চালিয়ে সেই কাগজখানা সে বার করলে, বরেনবাবুর বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের সময়ে যেখানা পাওয়া গিয়েছিল চশমার খাপের মধ্যে। দু-খানা কাগজের হাতের লেখা মিলিয়ে দেখে জয়ন্ত মৃদু হাস্য করলে যেন আপন মনেই। তারপরে সে উচ্চৈঃস্বরে পত্রখানা পাঠ করলে:

'নরেনবাবু, আপনার দাদার হত্যাকারীর নাম শুনতে চান? তাহলে আজ রাত্রি সাড়ে নয়টা থেকে সাড়ে দশটার মধ্যে বরাহনগরের ২০ নম্বর রতন রায় রোডে আমার বাড়িতে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। একাই আসবেন। আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারতুম, কিন্তু বাড়ি ছেড়ে বেরুলেই আমার বিপদের সম্ভাবনা, কারণ হত্যাকারী আমারও গতিবিধির উপরে লক্ষ রেখেছে। সাবধান, পত্রের মর্ম কারুর কাছে প্রকাশ করবেন না। ইতি-'

চিঠিখানা নরেনবাবুর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে জয়ন্ত বললে, 'তাহলে রাত্রে আপনি পত্রলেখকের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন?'

-'তাইতো স্থির করেছি।'

-'বেশ করেছেন। আপনার যাওয়াই উচিত আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই। এসো মানিক, আসুন সুন্দরবাবু।' পথে এসে গাড়িতে উঠে মোটর চালিয়ে দিয়ে জয়ন্ত বললে, 'সুন্দরবাবু, রহস্য ক্রমেই ঘনীভূত হয়ে উঠেছে।'

-'কীরকম?'

-'আজকের চিঠি আর সেই চশমার খাপের চিঠি একই লোকের লেখা। তার উপরে পত্রবাহকও খুনিদের দলের লোক।'

-'আচ্ছা, নরেনবাবুকে তারা কোন উদ্দেশ্যে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে?'

-'উদ্দেশ্য হয়তো ভালো নয়। কিন্তু আমরা ঘটনাস্থলের আশেপাশে লুকিয়ে থাকব। আপনি একদল সশস্ত্র পাহারাওয়ালা নিয়ে আসবেন। তারপর যা করেন মা কালী!'

রাত সাড়ে নয়টা

বরাহনগর। কুড়ি নম্বর রতন রায় রোড। একখানা পুরোনো দোতলা বাড়ি, তার চারিদিক ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে বড়ো বড়ো গাছ। জমির উপরে গাছগুলোর আশেপাশে ঝোপঝাড়। এক সময়ে এখানে বোধ হয় বাগানের অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু ফুল গাছদের তাড়িয়ে এখন তাদের স্থান দখল করেছে বেশ একটি ছোটোখাটো জঙ্গল।

বাড়ির দোতলা একখানা ঘরের ভিতর থেকে বাইরে এসে পড়েছে আলোর রেখা। বাড়িতে ঢোকবার পথ আর বড়ো রাস্তার সংযোগস্থলে হ্যারিকেন লণ্ঠন হাতে করে দাঁড়িয়েছিল নিশ্চল একটা মূর্তি। রাত বোধ হয় তখন নয়টা বাজে।

এতক্ষণ ঝিঁঝিঁদের একঘেয়ে গান ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছিল না, হঠাৎ স্তব্ধতাকে যেন ধাক্কা মেরে খানিক দূরে বেজে উঠল এক মোটরের ভেঁপু। লণ্ঠন হাতে নিশ্চল মূর্তিটা চমকে উঠল। তারপরেই শোনা গেল একখানা চলন্ত গাড়ির শব্দ।

ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে একখানা ট্যাক্সি। ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে আছে একজন লোক।

গাড়িখানা বাড়ির কাছে এসে থামল। তার আরোহী লণ্ঠনধারী লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলে 'মশাই, বলতে পারেন, এ বাড়িখানার নম্বর কত?'

-'কুড়ি।'

-'বটে, এই বাড়িখানাই তো আমি খুঁজছি।'

-'আপনি কি নরেনবাবু?'

-'হ্যাঁ, আপনি কী করে জানলেন?'

-'আপনার জন্যেই তো আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি।'

-'আমার জন্যে?'

-'আজ্ঞে হ্যাঁ। বড়োবাবু আপনাকে বাড়ির ভিতরে নিয়ে যেতে বলেছেন।'

-'কে বড়োবাবু?'

-'আমাদের কর্তা। আসুন, গাড়ি নিয়ে ভিতরে আসুন,' বলেই লোকটা গাড়ির পাদানির উপরে উঠে দাঁড়াল।

চালক লোকটার নির্দেশমতো গাড়ি চালিয়ে ভিতরে ঢুকে সেই পুরোনো বাড়িখানার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

লোকটা নেমে পড়ে দরজার কাছে গিয়ে বললে, 'আসুন নরেনবাবু।'

নরেন একটু ইতস্তত করে গাড়ি থেকে নেমে বললে, 'ড্রাইভার!'

-'হুজুর!'

-'গাড়ি নিয়ে তুমি অপেক্ষা করো। আমি এখনি ফিরে আসছি।'

-'যে আজ্ঞে।'

লোকটার সঙ্গে নরেন বাড়ির ভিতরে ঢুকল। সঙ্গেসঙ্গে সদর দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

ট্যাক্সি চালক একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল। তারপর গাড়িখানাকে পিছু হটিয়ে পথের এমন এক জায়গায় এনে দাঁড় করালে, যেখানে দু-পাশেই আছে দুটো বড়ো ঝোপ।

মিনিট পাঁচেক যায়। দূরে কোথা থেকে ভেসে আসছে একটা কোকিলের কুহু স্বর। কাছে ঝিঁঝিঁদের গলার উপরে গলা তোলবার চেষ্টা করছে একটা কোলা ব্যাং। মাঝে মাঝে হঠাৎ জাগা বাতাসে সবুজ পাতাদের শিহরণ গান। তা ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

লণ্ঠন হাতে করে একটা লোক আসছে। গাড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়ে সে চালককে ডেকে বললে, 'তোমার মিটারে কত ভাড়া উঠেছে?'

-'কেন?'

-'নরেনবাবুর ফিরতে দেরি হবে। হয়তো আজ রাত্রে তিনি ফিরতে নাও পারেন। ভাড়া নিয়ে তিনি তোমাকে চলে যেতে বললেন।'

-'বেশ ভাড়া দিন পাঁচ টাকা।'

লোকটা লণ্ঠন তুলে হুমড়ি খেয়ে মিটারে কত ভাড়া উঠেছে দেখবার চেষ্টা করলে। কিন্তু পরমূহূর্তেই চালকের প্রচণ্ড ঘুসি গিয়ে পড়ল ঠিক তার চিবুকের উপরে। সঙ্গেসঙ্গে টুঁ শব্দ পর্যন্ত করবার সময় না পেয়ে লোকটা হল ধরাশায়ী। একেবারে অজ্ঞান!

চালক মৃদুকণ্ঠে ডাকল, 'মানিক!'

পাশের ঝোপ থেকে সাড়া এল, 'উঁ!'

-'বেরিয়ে এসো! সুন্দরবাবু!'

-'হুম!'

-'আপনিও বেরিয়ে আসুন।'

-'এই যে ভায়া।'

-'আগে ওই লোকটার হাত-পা মুখ বেঁধে ফেলুন। ওর এখনও জ্ঞান হয়নি।'

'লোকটাকে বন্দি করতে বেশিক্ষণ লাগল না।'

চালকবেশী জয়ন্ত বললে, 'এখানকার সব প্রস্তুত?'

-'হ্যাঁ।'

আচম্বিতে বাড়ির ভিতরে জেগে উঠল প্রচণ্ড হট্টগোল। একাধিক ব্যক্তির ক্রুদ্ধ চিৎকার। তারপরই উপর-উপরি দুই বার রিভলবারের গর্জন! আর্তনাদ! পরমুহূর্তে দোতলার ঘরের আলোটা গেল নিভে।

জয়ন্ত বললে, 'আর দেরি নয় সুন্দরবাবু। ডাকুন আপনার লোকজনদের।'

পকেট থেকে বাঁশি বার করে সুন্দরবাবু খুব জোরে দিলেন তিন বার ফুঁ।

জয়ন্ত দ্রুতপদে বাড়ির দিকে ছুটে গেল-পিছনে পিছনে মানিক।

অদ্ভুত রহস্য

দু-জনেই দৌড়ে বাড়ির সদর দরজার কাছে হাজির হল। দু-জনেরই হাতে প্রস্তুত হয়ে আছে রিভলবার।

জয়ন্ত বললে, 'মানিক আমি এখানেই থাকি। চরের মুখে শুনেছি, বাড়ির পিছন দিকেও একটা খিড়কির দরজা আছে। তুমি সেইখানে গিয়ে পাহারা দাও।'

-'তারপর?'

-'যদি কেহ বাড়ির বাইরে যাবার চেষ্টা করে গুলি করবে-অর্থাৎ প্রাণে মারবে না, কেবল রিভলবার ছুড়ে ভয় দেখাবে।'

-'বেশ।'

-'সুন্দরবাবু এখনি লোকজন নিয়ে এসে বাড়ি ঘেরাও করে ফেলবেন। আমাদের বেশিক্ষণ পাহারা দিতে হবে না।'

মানিক ছুটে চলে গেল।

হঠাৎ গুড়ুম শব্দে একটা বন্দুক গর্জন করে উঠল। গাছে গাছে কাক ও অন্যান্য পাখিদের ভীত চিৎকার।

জয়ন্ত আপন মনেই বললে, 'বন্দুক ছুড়লে কে? শব্দটা এল যেন বাড়ির উপর থেকে! মানিকের কোনো বিপদ হল না তো?'

ধুপ ধুপ করে ভারী ভারী পা ফেলে সুন্দরবাবু ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে এসে কেবল তিন বার বললেন, 'হুম, হুম, হুম!'

-'ব্যাপার কী?'

-'কী কাণ্ড, বাপ!'

-'কাণ্ড আবার কী?'

-'মাথার ছ্যাঁদার ভিতর দিয়ে এখুনি প্রাণপক্ষী বর্হিগত হয়ে যেত।'

-'বুঝিয়ে বলুন।'

-'কোথা থেকে কোন বেটা ত্যাঁদোড় আমার মাথা টিপ করে বন্দুক ছুড়েছিল।'

-'গুলি লাগেনি তো।'

-'লাগেনি মানে। নিশ্চয় লেগেছে, আলবত লেগেছে।'

জয়ন্ত সবিস্ময়ে বললে, 'তবু আপনি মাটির উপরে লম্বমান হননি!'

-'কেন লম্বমান হইনি দেখতে পাচ্ছ না। ইতিমধ্যে মাথায় আমি স্টিল হেলমেট পরে নিয়েছি যে। ঃউ, নইলে কী সর্বনাশই যে হত!'

-'ও আলোচনা এখন থাক। আপাতত যে বন্দুক ছুড়েছে তাকে ধরতে হবে তো নিশ্চয়ই।'

এমন সময়ে মানিক এসে বললে, 'আমার আর খিড়কিতে থাকবার দরকার নেই জয়ন্ত। দ্বাররক্ষা করবার জন্যে পাহারাওয়ালারা এসে পড়েছে।'

-'খিড়কি দিয়ে কেউ বেরুবার চেষ্টা করেনি?'

-'জনপ্রাণী না।'

সুন্দরবাবু পরম আহ্লাদে বললেন, 'বেটারা তাহলে বাড়ির ভিতরে আছে, এবারে আর আমাদের কলা দেখাতে পারবে না। চলো জয়ন্ত, আমার আর তর সইছে না।'

'আপনার মাথায় হেলমেট আছে, আপনিই পথ দেখান। কেউ যদি গুলি ছোড়ে, হেলমেট দিয়ে ঠেকাবেন।'

কিন্তু কেউ আর বন্দুক ছুড়ল না, বাড়ির ভিতরটা মৃত্যুর মতো স্তব্ধ। একতলার সব ঘর তন্নতন্ন করে খুঁজেও একটা মিশকালো বিড়াল ছাড়া আর কারুর দেখা পাওয়া গেল না।

জয়ন্ত বললে, 'এইবারে দোতলা। বন্দুকের শব্দটা এসেছিল দোতলা থেকেই।'

সুন্দরবাবু হলেন পশ্চাৎপদ। পাহারাওয়ালাদের ডেকে বললেন, 'তোমরা আগে আগে যাও। যাকে দেখবে তাকে গ্রেপ্তার করবে। ভয় নেই আমি তোমাদের পিছনেই আছি।'

দোতলায় চারখানা ঘর। সব ঘরই খাঁ খাঁ করছে। কিন্তু একখানা ঘরের রক্তপ্লাবিত মেঝের উপর পড়ে রয়েছে একটা রিভলবার।

জয়ন্ত বললে, 'সুন্দরবাবু, আপনারা বাড়ির ছাদটা একবার খুঁজে আসুন। আমি এই ঘরেই আছি।'

ছাদও শূন্য। হতভম্ব সুন্দরবাবু হেলমেট খুলে টাক চুলকোতে চুলকোতে নেমে এসে দেখলেন, জয়ন্ত গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতে একটা রিভলবার।

সুন্দরবাবু বললেন, 'বেটারা মায়াবী। হাওয়া হয়ে হাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে গিয়েছে।'

জয়ন্ত বললে, 'এই রিভলবারটাই আমি নরেনবাবুকে দিয়েছিলুম। কিন্তু অস্ত্রটা এখানে ফেলে নরেনবাবু গেলেন কোথায়?'

-'হুম, সেই বন্দুকধারীই বা কোথায়?'

মানিক বললে, 'ঘরের মেঝেয় এত রক্ত কার? নরেনবাবুর নয় তো?'

জয়ন্ত বললে, 'সম্ভবত নয়। আমরা রিভলবার ছোড়বার শব্দ শুনেছি দুই বার। এই রিভলবারেও ছ-টা ঘরের ভিতরে দুটো ঘরে গুলি নেই। আমার বিশ্বাস আত্মরক্ষার জন্যে নরেনবাবুই গুলি ছুড়ে শত্রুদের কারুকে হত বা আহত করেছেন।'

মানিক বললে, 'কিন্তু নরেনবাবুই বা কোথায়, আর তাঁর হত কি আহত শত্রুর দেহটাই বা কোথায়? এই বাড়ির ভিতর থেকে সুন্দরবাবুর টাক ফাটাবার জন্যে যে লোকটা বন্দুক ছুড়েছিল, সেও তো তার বন্দুক নিয়ে অদৃশ্য হয়েছে!'

-'মানিক, মেঝের রক্তের উপরে কতকগুলো পদচিহ্ন রয়েছে দেখো। আমি পরীক্ষা করে ছয় জন লোকের পদচিহ্ন পেয়েছি। এক জনের পা খুব বড়ো, বোধ হয় মাথাতেও সে খুব ঢ্যাঙা।'

-'কী আশ্চর্য! বাড়ির কোনো দরজা দিয়েই লোক বাইরে বেরুতে পারেনি, কিন্তু এতগুলো মানুষ কি শূন্যপথে পাখির মতো উড়ে পালিয়েছে!'

-'মানিক, এ ঘরের দরজা দিয়েও কেউ বাইরে যায়নি।'

-'কেমন করে জানলে?'

-'তাহলে রক্তাক্ত দেহটা থেকে নির্গত রক্তের ধারা ঘরের বাইরেও দেখতে পাওয়া যেত। কিন্তু বাইরে কোথাও এক ফোঁটাও রক্তের দাগ নেই।'

সুন্দরবাবু মহা বিস্ময়ে দুই ভুরু কপালে তুলে বললে, 'তাও তো বটে, তাও তো বটে! ঘরের ভিতরে অনেকগুলো লোক ছিল, কিন্তু তারা ঘরের ভিতরেও নেই আর ঘরের বাইরেও যায়নি! অবাক করলে বাবা!'

মানিক বললে, 'প্রায় আসবাবহীন ঘর। চারিদিকে ইটের দেওয়াল। একটা টিকটিকিও এখানে লুকিয়ে থাকতে পারে না। এ কী সমস্যা?'

জয়ন্ত মুখ টিপে হাসতে হাসতে বললে, 'এই সমস্যার সমাধান না করে আমি এখান থেকে নড়ব না।'

ভৌতিক রহস্য

সুন্দরবাবু ঘুরে ঘুরে ঘরের চারিদিক দেখে নিলেন সন্দিগ্ধ চোখে। তারপর হেলমেটটা আবার মাথায় পরে ফেললেন।

মানিক বললে, 'ওকী মশাই, ওটা আবার মস্তকে ধারণ করলেন কেন?'

-'এখানে আমরা ছাড়া আর কেউ তো নেই।'

-'এখন নেই, কিন্তু এখনি তারা দেখা দিতেও পারে। যেসব শত্রু ঘরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায় না, অথচ ঘরের ভিতরেও থাকে না, তাদের বিশ্বাস নেই। তারা মায়াধর, তারা সব করতে পারে।'

মানিক নিজের রিভলবারের পিছন দিকটা দিয়ে ঘরের চারিদিকের দেওয়াল ঠুকে ঠুকে পরীক্ষা করতে লাগল।

সুন্দরবাবু শুধোলেন, 'কী দেখছ মানিক?'

-'দেখছি দেওয়ালের কোনো জায়গা ফাঁপা কি না! কিন্তু না, এ নিরেট দেওয়াল, এর কোথাও গুপ্তদ্বার নেই।'

জয়ন্ত বললে, 'কিন্তু-' বলতে বলতে থেমে পড়ে সে পশ্চিম দিকের একটা জানলার কাছে ছুটে গেল।

মানিক বললে, 'কী হল জয়ন্ত?'

-'এ দিকের জানালা দিয়ে গঙ্গা দেখা যায়।'

-'সেটা আমরা এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু কথা কইতে কইতে তুমি হঠাৎ ছুটে গেলে কেন?'

-'একটা শব্দ শুনছ না।'

কান পেতে মানিক বললে, 'শুনছি। একখানা মোটরবোটের শব্দ।'

-'হ্যাঁ। গঙ্গার উপর দিয়ে একখানা মোটরবোট যাচ্ছে।'

-'তার জন্যে তোমার মাথাব্যথা কেন?'

-'মোটরবোটের শব্দটা আগে ছিল না, এইমাত্র জাগল, নিশ্চয় বোটখানা ছাড়া হয়েছে কাছাকাছি কোনো জায়গা থেকে। এতরাত্রে বোটে চড়ে গঙ্গায় হাওয়া খাবার শখ হল কোন মহাপুরুষের, সেই কথাই ভাবছি।'

-'সন্দেহজনক বটে।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'জনকয় সেপাইকে গঙ্গার ধারে পাঠাব নাকি?'

-'এখন আর পাঠিয়ে লাভ হবে না। এতক্ষণে বোটখানা অনেক দূরে চলে গিয়েছে, আর তার নাগাল পাওয়া অসম্ভব।'

-'তুমি কি বলতে চাও যে-'

বাধা দিয়ে জয়ন্ত বললে, 'আমি কিছুই বলতে চাই না। আমি খালি আপনাকে একটা ব্যাপার দেখাতে চাই।'

-'কী?'

একটা লণ্ঠন উঁচু করে তুলে ধরে জয়ন্ত বললে, 'যে দেওয়ালে জানলাটা গাঁথা আছে তার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখুন।'

সুন্দরবাবু বিপুল বিস্ময়ে বললেন, 'ওরে বাবা, এত মোটা দেওয়াল তো আমি জীবনে কখনো দেখিনি!'

-'ঘরের অন্য তিন দিকের দেওয়াল দেখুন। কোনো দেওয়ালই তত চওড়া নয়!'

-'তাই তো হে। এর মানে কী?'

-'সেইটেই বিবেচ্য।'

-'হুম, এ যেন চীনের প্রাচীরের নমুনা।'

-'এইবার মেঝের রক্তের দিকে তাকান। কী দেখছেন?'

-'একটু অত্যুক্তি করলে বলা যায়, মেঝের উপর দিয়ে বইছে রক্তের ঢেউ।'

-'আর কিছু দেখছেন না?'

-'রক্তের মাঝে মাঝে অনেকগুলো মানুষের পায়ের দাগ।'

-'আরও কিছু?'

-'উঁহু।'

-'মানিক, তুমি কী বলো?'

-'পশ্চিম দিকে রয়েছে একটা দেওয়াল আলমারি। একটা লম্বা রক্তের রেখা ওই আলমারির তলায় গিয়ে শেষ হয়েছে। যেন কোন আহত রক্তাক্ত লোক ওই আলমারির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।'

-'সে আহত না হয়ে, মৃত হতেও পারে। হয়তো কারা তার রক্তাক্ত মৃতদেহ ওই পর্যন্ত বহন করে নিয়ে গিয়েছিল।'

-'কিন্তু কেন? দেহটাকে আলমারির ভিতরে রেখে দেবে বলে?'

-'হতেও পারে, না হতেও পারে। আলমারিটা খুলেই দেখো না।'

-'কিন্তু আলমারিটা তো বাহির থেকে তালাবন্ধ।'

-'ভারি তো পুঁচকে তালা। ভেঙে ফেলো।'

তালা ভাঙতে দেরি লাগল না। একটা বীভৎস দৃশ্য দেখবার জন্যে প্রস্তুত হলেন সুন্দরবাবু।

কিন্তু আলমারির দরজা খুলে পাওয়া গেল কেবল চারটে তাক। সেগুলোর উপরে রয়েছে কয়েকটা আজেবাজে জিনিস।

জয়ন্ত বললে, 'আর একটা জিনিস লক্ষ করুন সুন্দরবাবু।'

-'ভায়া, বার বার লক্ষ করতে করতে আমি ক্রমেই লক্ষ্যহারা হয়ে পড়ছি যে।'

-'আলমারির ফ্রেমের উপরে রয়েছে একটা পিতলের মোটা হাতল।'

-'তাতে কী হয়েছে?'

-'ওরকম জায়গায় অমন ধারা হাতল থাকার কোনো মানে হয় না।'

-'হুম!'

-'হাতলটা ধরে জোরসে মারুন টান!'

-'মারলুম টান-হেঁইয়ো। আরে একী!'

হড়হড় করে গোটা আলমারিটাই দরজার পাল্লার মতো দেওয়ালের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল বাইরের দিকে। জয়ন্ত ছাড়া আর সকলেরই দৃষ্টি বিস্মিত এবং চমকিত। জয়ন্ত সহজ কণ্ঠেই বললে, 'এসো মানিক, আলমারির ওপাশে কী আছে এইবারে সেটা দেখা যাক।'

আলমারির ওপাশে আছে দুটো দেওয়ালের মাঝখানে হাত দেড়েক চওড়া আর অল্প একটু ফাঁকা জায়গা-সেখানে পাশাপাশি দু-জন মানুষ দাঁড়াতে পারে না। নীচে গাঢ় অন্ধকারের ভিতরে নেমে গিয়েছে একসার ছোটো ছোটো সিঁড়ি।

জয়ন্ত অগ্রসর হল! এক হাতে টর্চ এবং আর এক হাতে রিভলবার নিয়ে সংকীর্ণ সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললে, 'আমার বিশ্বাস শত্রুদের কেউ আর এ মুল্লুকে নেই। আপনারাও নির্ভয়ে আমার পিছনে আসুন।'

মোট ত্রিশটা ধাপ তারপর সিঁড়ির শেষ।

এদিকে-ওদিকে টর্চের আলো ফেলে জমাট অন্ধকার বিদীর্ণ করে জয়ন্ত বললে, 'বাড়িখানা আছে আমাদের মাথার উপরে-এখন আমরা পাতালের গর্ভে। এখানটা দেখছি ছোটোখাটো ঘরের মতো, আর-'

জয়ন্তের কথা ফুরোবার আগেই সেই অন্ধকূপের মধ্যে বিকট একটা ভৌতিক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়ে উঠল-হুঁ-উ-উ-উ। হুঁ-উ-উ-উ। হুঁ-উ-উ-উ।

মস্ত একটা লম্ফ ত্যাগ করে আবার সিঁড়ির উপরে গিয়ে পড়ে সুন্দরবাবু সভয়ে বলে উঠলেন, 'এ কী রে বাবা, এ কী আওয়াজ! পালিয়ে এসো জয়ন্ত, পালিয়ে এসো মানিক।'

পাতাল পুরে

যেদিক থেকে শব্দটা আসছিল, সেইদিকে জয়ন্ত ফিরে দাঁড়াল চোখের পলক পড়বার আগেই।

টর্চের আলোতে দেখা গেল এককোণে মেঝের উপরে পড়ে রয়েছে একটা নিশ্চেষ্ট মনুষ্যমূর্তি-তার মুখে বন্ধন, তার হাতে বন্ধন, তার পায়ে বন্ধন।

মানিক দুই পা এগিয়ে হেঁট হয়ে মূর্তিটাকে দেখে সবিস্ময়ে বলে উঠল, 'নরেনবাবু না?'

নরেন নিঃসহায়ের মতো ঘাড় নেড়ে কেবল বলতে পারলে, 'হুঁ-উ-উ-উ!'

জয়ন্ত ও মানিক তৎক্ষণাৎ তার বন্ধন খুলে দিলে।

সিঁড়ির উপর থেকে আবার নীচে নামতে নামতে সুন্দরবাবু হাঁফ ছেড়ে বললে, 'নরেনবাবু, এভাবে আমাদের ভয় দেখানো আপনার উচিত হয়নি। হুঁ-উ-উ-উ-উ কী রে বাবা!'

নরেন শ্রান্ত স্বরে বললে, 'কী করব বলুন, ও ছাড়া আর কোনো শব্দ উচ্চারণ করবার উপায় আমার ছিল না।'

জয়ন্ত বললে, 'ব্যাপারটা সংক্ষেপে বর্ণনা করতে পারবেন?'

-'পারব। বাড়ির উপরকার ঘরে ওঠবার পর একজন খুব রোগা আর ঢ্যাঙা লোক আমার সঙ্গে অল্পক্ষণ বাজে কথা কইলে। তারপরই অতর্কিতে পিছন থেকে আমাকে আক্রমণ করলে কয়েকজন লোক, কোনোক্রমে এক বার তাদের হাত ছাড়িয়ে আমি উপর-উপরি দুই বার রিভলবার ছুড়লুম-একটা লোক জখম হয়ে মাটির উপরে পড়ে গেল বটে, কিন্তু বাকি লোকগুলো আবার আমার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে বেঁধে ফেললে আমার হাত, পা, মুখ। তারপর তারা আমাকে নিয়ে কী করত জানি না, কিন্তু হঠাৎ বাইরে আপনাদের বাঁশি বেজে উঠল। রোগা আর ঢ্যাঙা লোকটা বললে, 'পালাও, পালাও-পুলিশ এসেছে। তখনি আমার আর সেই আহত লোকটার দেহ মাটির উপর থেকে তুলে নিয়ে তারা দেওয়ালের একটা গুপ্তদ্বার খুলে সিঁড়ি দিয়ে এইখানে নেমে এল। আসবার সময়ে সেই রোগা ঢ্যাঙা লোকটা বোধ হয় আপনাদের লক্ষ্য করে একবার বন্দুকও ছুড়েছিল।'

জয়ন্ত শুধোলে, 'নরেনবাবু, সে লোকটার গলার আওয়াজ কেমন?'

-'স্বাভাবিক।'

-'আধা-নরম আধা-কর্কশ নয়?'

-'না।'

-'মানিক, তাহলে বোধ হচ্ছে বেহালার বাগানবাড়িতে যে আমাদের সঙ্গে কর্তৃত্বের স্বরে কথা কয়েছিল, সে আর এই রোগা ঢ্যাঙা লোকটা একই ব্যক্তি নয়। আচ্ছা নরেনবাবু, আপনাকে এখানে ফেলে রেখে লোকগুলি

কোনদিকে গিয়েছে বলতে পারেন?'

-'হ্যাঁ। তারা ওই দরজাটা খুলে বেরিয়ে গেল।' নরেন অঙ্গুলি নির্দেশ করলে।

দেওয়ালের গায়ে রয়েছে ছোটো একটা দরজা, তার কপাট বন্ধ ছিল না।

জয়ন্ত দরজার ওপাশটা টর্চের সাহায্যে আলোকিত করে বললে, 'এ যে একটা সুড়ঙ্গ!'

সুন্দরবাবু চমৎকৃত হয়ে বললেন, 'বাব্বা, এরা দেখছি জাত শয়তান। আয়োজনের কিছুই বাকি রাখেনি। কেবল স্থলপথে আর জলপথেই ওদের চলাচল নয় হে জয়ন্ত, ওরা হয়তো এরোপ্লেনে উঠেও আমাদের ফাঁকি দিতে পারে।'

জয়ন্ত ভাবতে ভাবতে বললে, 'আমার বোধ হয়, এদের একজন বিচক্ষণ দলপতি আছে। সাধারণত সে নিজে থাকে আড়ালে নিরাপদ ব্যবধানে, আর তার হুকুম তামিল করে দলের অন্য সবাই। ওই রোগা আর ঢ্যাঙা লোকটা বোধ হয় তার ডান হাতের মতো।

সুন্দরবাবু বললেন, 'আমার মনে হয়, এই অদৃশ্য দলপতি কোনোদিনই দৃশ্যমান হবে না। ধরা পড়বে বড়োজোর তার চ্যালাচামুণ্ডারা।'

-'দলপতিকে চোখে না দেখলেও খুব সম্ভব আমরা তারই অর্ধকোমল আর অর্ধকর্কশ কণ্ঠস্বর শুনেছি-সে স্বর আমি কোনোদিনই ভুলব না, কারণ সযত্নে তার রেকর্ড রেখেছি আমার স্মৃতির গ্রামাফোনে। তার স্বর আবার শুনলেই তাকে চিনতে পারব। আর এটাও জেনেছি, আপনার উপরে তার প্রচণ্ড ক্রোধ। নিশ্চয় সে পুরাতন পাপী, কখনো-না-কখনো আপনার পাল্লায় গিয়ে পড়েছিল, আর বোধ হয় আপনি তাকে জামাই আদর করেননি।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'তোমার ওই অর্ধকোমল আর অর্ধকর্কশ কণ্ঠের অধিকারীকে আমি তো স্মৃতিসাগর মন্থন করেও আবিষ্কার করতে পারলুম না।'

-'আপাতত থাক ওকথা। নরেনবাবু, আপনি দুই জন পাহারাওয়ালার সঙ্গে আবার উপরে গিয়ে একটু বিশ্রাম গ্রহণ করুন। ততক্ষণে আমরা সুড়ঙ্গটার ভিতরে দৃষ্টি সঞ্চালন করে আসি।'

সুড়ঙ্গটাও সংকীর্ণ তার ভিতরে পাশাপাশি চলতে পারে না দু-জন মানুষ। বেশ খানিকটা এগিয়ে যেখানে সুড়ঙ্গটা শেষ হয়েছে, সেখানেও রয়েছে আর একটা ছোটো দরজা। টানতেই খুলে গেল তার কপাট।

বাহির থেকে দরজার উপরে ঝুলছে এত লতাপাতা যে সহজে তার অস্তিত্ব আবিষ্কার করা যায় না। তারপর প্রায় কাঠা-চারেক জমি জুড়ে বিরাজ করছে কাঁটা ঝোপের পর কাঁটা ঝোপ আর আগাছার নিবিড় জঙ্গল।

জয়ন্ত স্তব্ধ মুখে সেই দিকে তাকিয়ে রইল যেখানে আঘাটাতেও গঙ্গার জলবাহু ছড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে চাঁদের আলোর হিরের টুকরো।

খানিকক্ষণ পরে সে মুখ তুলে বললে, 'মানিক পুলিশের সাড়া পেয়ে ওরা তাড়াতাড়িতে নরেনবাবুকেও নিয়ে পালাতে পারেনি। আমরা যে গুপ্তপথের সন্ধান পাব, সেটা ওরা আন্দাজ করতে পারবে না। নরেনবাবুর একটা ব্যবস্থা করবার জন্যে ওরা নিশ্চয়ই দু-এক দিনের মধ্যে লুকিয়ে আবার সুড়ঙ্গের ভিতরে প্রবেশ করবে।'

-'তোমার অনুমান অসংগত নয়।'

-'সে সুযোগ আমরা ছাড়ব না। তারা আসবে রাতের অন্ধকারেই। আমরাও কাল থেকে এইখানে রাত জেগে গঙ্গার গান শুনব। এবারে সুড়ঙ্গে ঢুকলে আর তারা বেরোতে পারবে না। আপাতত নরেনবাবুকে আমাদের বাড়িতে লুকিয়ে রাখব। তাঁকে যে আমরা উদ্ধার করেছি, সেটা ওদের জানতে দেওয়া হবে না।'

-'মন্দ ফন্দি নয়। এখন চলো, ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আসছে।'

বিজনবিহারী রায়

তারপর কেটে যায় এক, দুই, তিন দিন। জয়ন্ত সদলবলে রাত জাগে বরাহনগরের গঙ্গার ধারে। কেবল তারা নয়, সে মুল্লুকের মশাও সানন্দে ঐকতান বাজিয়ে রাত জাগে তাদের সঙ্গে। সুন্দরবাবুর অভিযোগের অন্ত নেই।

তিন দিন পরে জয়ন্তও হাল ছেড়ে দিল। সে বুঝল, নরেনবাবুর জন্যে অপরাধীরা আর সুড়ঙ্গের মধ্যে পদার্পণ করবে না।

সুন্দরবাবু বললেন, 'আমি তো গোড়া থেকেই বলে আসছি ওরা আমাদের চেয়ে চালাক। এত সহজে ফাঁদে পা দেবার বান্দা ওরা নয়।'

জয়ন্ত বললে, 'আমার মত আলাদা। ওদের আসল উদ্দেশ্য এইবার বুঝতে পেরেছি।'

-'মানে?'

-'ওদের ইচ্ছা, নরেনবাবু অন্ধকূপে বন্দি হয়ে তিলে তিলে দিনে দিনে মৃত্যুর কবলগত হোন। ওরা নরেনবাবুকে পথ থেকে সরাতে চেয়েছিল। ওরা ভাবছে ওদের সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে, কাজেই অকারণে সুড়ঙ্গের ভিতরে এসে ওরা আর পুলিশের নজরে পড়তে রাজি নয়।'

-'কিন্তু নরেনবাবুকে যমালয়ে পাঠাবার জন্যে ওদের এতটা আগ্রহ কেন?'

-'এখনও এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর খুঁজে পাইনি। তবে যে কারণে বরেনবাবু মারা পড়েছেন, সেই কারণেই ওরা নরেনবাবুকে বধ করতে চায়, সে বিষয়ে আর কোনোই সন্দেহ নেই।'

-'এ আবার তোমার কীরকম হেঁয়ালি। এদিকে বলছ তুমি সঠিক উত্তর জানো না, আবার বলছ ওরা একই কারণে বরেনবাবুকে বধ করবার পরে নরেনবাবুকেও বধ করতে চায়!'

-'সুন্দরবাবু, আপাতত এর বেশি আর কিছু বলতে পারব না। তবে এই মামলাটা হাতে নিয়েই আমার মনে যে সন্দেহ জেগেছিল, অবশেষে সেই সন্দেহ বোধ করি সত্যে পরিণত হবে। আপনি আজ সন্ধ্যার সময়ে আমার বাড়িতে একবার আসবেন?'

-'আসব। কিন্তু কেন বলো দেখি?'

-'আমাদের বরানগর অভিযান তো ব্যর্থ হল, আজ আর একটা নতুন সূত্রের সন্ধানে যাত্রা করব।'

সেদিনের সন্ধ্যা।

জয়ন্ত বৈঠকখানায় বসে বাঁশি বাজাচ্ছে এবং মানিক ধরেছে তবলা।

সুন্দরবাবুর প্রবেশ। দুই বন্ধুর প্রতি বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিপাত। একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে উপবেশন। অধীরভাবে একবার 'হুম' শব্দ উচ্চারণ। কিন্তু জয়ন্ত ও মানিক তাঁর দিকে ফিরেও তাকালে না। সমান তালে বাজাতে লাগল বাঁশি আর তবলা।

সুন্দরবাবু আর পারলেন না, বললেন, 'কী হে জয়ন্ত, বাঁশির প্যানপ্যানানি শোনবার জন্যেই কি আজ আমাকে এখানে আসতে বলেছ?'

উত্তর নেই। বাঁশি আর তবলা বোবা হল না।

আরও মিনিট দুয়েক অপেক্ষা করে সুন্দরবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এসেছিলুম একটা জরুরি খবর দিতে। তা তোমরা যখন শুনবে না আমি আর কী করব বল? চললাম।'

মানিকের তবলায় পড়ল তেহাই, জয়ন্তের বাঁশি হল স্তব্ধ।

জয়ন্ত বললে, 'আপনি জানেন তো সুন্দরবাবু, মাঝে মাঝে বাঁশি বাজাবার জন্যে আমার প্রাণ আনচান করে?'

মানিক বললে, 'আর তবলা বাজাবার জন্যে আমার হাত নিশপিশ করে?'

-'হুম!'

-জয়ন্ত বললে, 'তবে সেতার শুনবেন?'

মানিক বললে, 'কিংবা-'

বাধা দিয়ে সুন্দরবাবু বললেন, 'রক্ষা করো! আবার সেতারের প্রিং প্রিং? ওসব আমি বুঝি না, ভালোও লাগে না।'

মানিক বললে, 'তবে আপনার কী ভালো লাগে সুন্দরবাবু? আমাদের মধু যদি এখন চা আর ফাউলের স্যান্ডউইচ নিয়ে আসে?'

সুন্দরবাবু একগাল হেসে বললেন, 'তাহলে মধুকে আমি একাধিক ধন্যবাদ দেব।'

-'বেশ, সেই ব্যবস্থাই হবে।'

-'তবে আমিও আবার বসলুম।'

জয়ন্ত বললে, 'একটা নতুন সূত্রের সন্ধানে যাত্রা করেছিলুম। কিন্তু বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারিনি!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আমারও বক্তব্য আছে। আগে তোমার কথাই শুনি।'

-'বেহালায় গিয়েছিলুম। আশেপাশের লোকের কাছে খবর নিয়ে জানলুম, দশ নম্বর রামবাবুর লেনের সেই বাগানবাড়ির মালিক হচ্ছেন বিজনবিহারী রায়। কিন্তু তিনি নাকি আর কলকাতায় বাস করেন না।'

-'বটে। তাহলে আমার খবর শুনবে? আমি তোমার চেয়ে অগ্রসর হয়েছি।'

-'সুসংবাদ।'

-'নিমতলার সেই আগুনে পোড়া মৃতদেহটার ছবি কাগজে ছাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, পুরস্কার ঘোষণা করে। আজ একজন লোক তাকে শনাক্ত করে গিয়েছে।'

-'কে শনাক্ত করেছে?'

-'তার নাম হরিয়া। সে বেহালার ওই বাগানবাড়িতে আগে মালীর কাজ করত। হরিয়া বলে, আগুনে পুড়ে যে লোকটা মরেছে সে হচ্ছে বাগানবাড়ির মালিক বিজনবিহারী রায়ের মোটরচালক।'

-'তাহলে আপনি বিজনবাবুরও ঠিকানা পেয়েছেন?'

-'উঁহু। হরিয়াও বলে বিজনবাবু কলকাতার বাসা তুলে দিয়ে কোথায় চলে গিয়েছে।'

-'কিন্তু কে এই বিজনবিহারী রায়?'

-'তাও জেনেছি ভায়া, তাও জেনেছি। সেই জন্যেই তো বলছি আমি তোমার চেয়ে বেশি অগ্রসর হয়েছি।'

জয়ন্ত সাগ্রহে বললে, 'বলুন বলুন, সব কথা খুলে বলুন।'

-'বেহালার বাগানবাড়িতে তুমি একজনের আধাকোমল আধাকর্কশ গলার আওয়াজ শুনেছিলে না?'

-'হ্যাঁ।'

-'বিজনবিহারীও ওইরকম অদ্ভুত কণ্ঠস্বরের অধিকারী।'

-'কেমন করে জানলেন?'

-'শোনো। হরিয়া মালীর মুখে বিজনবিহারী রায়ের নাম শুনেই সজাগ হয়ে উঠেছে আমার ঘুমন্ত স্মৃতি। তুমি বলেছিলে সেই আধা-কোমল আর আধা-কর্কশ কণ্ঠের অধিকারীর নাকি আমার উপরে রাগ আছে। সেই যদি বিজন হয় তাহলে আমার উপরে তার রাগ থাকবার কথা। কারণ বছর পাঁচেক আগে তাকে একটা খুনের মামলায় গ্রেপ্তার করেছিলুম। মামলা অনেকদিন ধরে চলেছিল, তাকেও হাজতে আবদ্ধ থাকতে হয়। শেষটা যথেষ্ট প্রমাণ অভাবে সে খালাস পায় বটে, কিন্তু আসলে বিজনই যে হত্যাকারী, এ বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। জয়ন্ত, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই বরেনবাবুর হত্যাকাণ্ডেও সেই বিজনের হাত আছে।'

-'কিন্তু বিজন এখন কোথায় জানেন না তো?'

-'তার ঠিকানা জানি না বটে, তবে মাস খানেক আগেও সে কলকাতায় ছিল বলেই শুনেছি।'

-'কার মুখে শুনেছেন?'

-'ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের এক ইনস্পেকটরের মুখে। বিজনকে তিনি মোটরে চড়ে পথ দিয়ে যেতে দেখেছিলেন।'

জয়ন্ত খানিকক্ষণ নীরবে থেকে বললে, 'সুন্দরবাবু, আপনি মূল্যবান সংবাদ এনেছেন। আর আমাদের অন্ধকারে হাতড়ে মরতে হবে না। বিজন যখন কলকাতাতেই আত্মগোপন করে আছে, তখন তাকে আবিষ্কার করতে আমাদের আর বিশেষ বেগ পেতে হবে না। তারপরেই বোঝা যাবে বর্তমান মামলার সঙ্গে তার সম্পর্ক আছে কতখানি।'

ভাগনে

চা এবং খাবার এল-সঙ্গেসঙ্গে উৎফুল্ল হয়ে উঠল সুন্দরবাবুর বদনমণ্ডল। তাঁর জীবনের সেই সময়টাই সবচেয়ে উপভোগ্য হয়, যখন তাঁর ডান হাতখানি খাবারের থালার দিকে বার বার আনাগোনা করবার সুযোগ পায়।

খেতে খেতে সুন্দরবাবু বললেন, 'দেখো জয়ন্ত, বিজন কলকাতা ত্যাগ করেনি বলেই তুমি যে তাকে সহজে গ্রেপ্তার করতে পারবে, এটা আশা না করাই ভালো। কলকাতা হচ্ছে জনসমুদ্রের মতো, আর বিজন হচ্ছে তার মধ্যে এক ঘটি জলের মতো। ঘটির জল সমুদ্রে মিশে গেলে কেউ কি তাকে আবিষ্কার করতে পারে হে? বরং কলকাতার বাইরে গেলেই সে সহজে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। এই দেখো না, বিজন আর আমি দু-জনেই কলকাতায় আছি, অথচ আজ পাঁচ বছরের মধ্যে তার চুলের টিকি পর্যন্ত আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি।'

জয়ন্ত বললে, 'খোঁজেননি, তাই তার দেখা পাননি। খুঁজলে ভগবানের দেখা পেতে দেরি লাগে বটে, কিন্তু শয়তান ধরা দেয় খুব সহজেই।'

মানিক বললে, 'কিন্তু জয়ন্ত, বিজন যে বরেনবাবুর হত্যাকারী আর সেই যে নরেনবাবুকেও হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল, এখন পর্যন্ত এমন কোনো প্রমাণই আমরা পাইনি। আমরা বড়োজোর তার অদ্ভুত কণ্ঠস্বর শুনেছি; কিন্তু আদালতে সেটা ঠিক প্রমাণ বলে গ্রাহ্য হবে কি?'

সুন্দরবাবু ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললেন, 'হুম! মানিক প্রায়ই বুদ্ধিমানের মতো কথা বলে না, কিন্তু তার আজকের কথার দাম লাখ টাকা।'

মানিক মুখ টিপে হেসে বললে, 'আমি কেমন করে বুদ্ধিমানের মতো কথা বলব সুন্দরবাবু? ষোলোআনা বুদ্ধিই যে আপনার মগজের ভিতরে বন্দি হয়ে আছে। বলছেন, আমার কথার দাম লাখ টাকা। এমন করে আমায় আর লজ্জা দেবেন না দাদা। আপনার কাছে আমি? শাখামৃগের কাছে নেংটি ইঁদুর।'

সুন্দরবাবু ভুরু কুঁচকে সন্দিগ্ধ স্বরে বললেন, 'শাখামৃগ মানে কী জয়ন্ত?'

-'শুনলে কি খুশি হবেন?'

-'কেন হব না?'

-'মানেটা ভালো নয়।'

-'তবু আমি শুনব। শাখামৃগ মানে কী?'

-'কপি।'

-'কী কপি, ফুলকপি?'

-'ফুলকপিও নয়, বাঁধাকপিও নয়-শুধু কপি। অর্থাৎ বানর।'

সুন্দরবাবু একটিমাত্র বাক্য উচ্চারণ না করে দাঁড়িয়ে উঠলেন। তারপর মানিকের ভাবহীন মুখের দিকে প্রজ্জ্বলিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে হন-হন করে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, 'সুন্দরবাবুকে তাড়ালে মানিক?'

-'উনি তাড়া খেয়ে চলেও যান, আবার তাড়াতাড়ি ফিরেও আসেন।'

-'যাক ওকথা। এখন বাড়ির ভিতর থেকে একবার নরেনবাবুকে ডেকে আনো দেখি। তাঁর সঙ্গে দুটো কথা কইব।'

মানিক চলে গেল এবং মিনিট তিনেক পরে নরেনবাবুকে নিয়ে ফিরে এল।

নরেন বললে, 'আর অজ্ঞাতবাস ভালো লাগছে না জয়ন্তবাবু।'

-'বসুন। আর আপনাকে অজ্ঞাতবাস করতেও হবে না। যে উদ্দেশ্যে আপনাকে লুকিয়ে রেখেছি, আমাদের সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে।'

-'শুনে বাঁচলুম!'

-'আচ্ছা নরেনবাবু, আপনার দাদার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কে?'

-'আমি।'

-'বরেনবাবু উইল করে গেছেন?'

-'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

-'আপনার সন্তান আছে?'

-'না।'

-'স্ত্রী?'

-'বিবাহ করিনি, কখনো করবও না।'

-'আপনার মৃত্যুর পর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে কে?'

-'আমার ভাগনে।'

-'শুনেছি আপনার ভগ্নী বন্ধ্যা।'

-'সে আমার ছোটো বোন। আমার বিধবা দিদির ছেলে আছে।'

-'কয় ছেলে?'

-'একটি মাত্র।'

-'বটে? তার বয়স কত?'

-'সে প্রায় আমারই সমবয়সি।'

-'তিনি কী করেন?'

-'জানি না।'

-'সে কী?'

-'আশ্চর্য হচ্ছেন? আশ্চর্য হবার কথাই বটে। আসল কথা কী জানেন জয়ন্তবাবু? দিদির সঙ্গে আমাদের সদ্ভাব আছে বটে, কিন্তু আমার ভাগনের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক তুলে দিতে বাধ্য হয়েছি।'

-'কেন?'

-'সে মানুষ নয়, একেবারেই লক্ষ্মীছাড়া। তার কথা স্মরণ করতেও লজ্জায় আমার মাথা কাটা যায়।'

-'দুঃখের কথা।'

-'লোক-ঠকানো তার ব্যাবসা। একবার খুনের মামলাতেও পড়েছিল।'

জয়ন্ত চমকে উঠল। একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলে, 'তাঁর নাম কী?'

-'বিজনবিহারী রায়।'

জয়ন্ত ও মানিকের মধ্যে হল দৃষ্টি বিনিময়। জয়ন্ত বললে, 'বিজনবাবুর কণ্ঠস্বর কি অর্ধকোমল অর্ধকর্কশ?'

-'আর একদিনও তার সম্বন্ধে আপনি এই প্রশ্ন করেছিলেন। হ্যাঁ, বিজনের গলার আওয়াজ ওই রকমই বটে কিন্তু আপনি জানলেন কেমন করে?'

-'আমি শুনেছি।'

-'কোথায়?'

-'পরে বলব। বিজনবাবুর চেহারা কেমন?'

-'লোকে বলে নাকি অনেকটা আমার মতনই দেখতে।'

-'তার ঠিকানা কী?'

-'তাও জানি না। সে আমার দিদির সঙ্গে থাকে না। তবে এত দোষের মধ্যেও তার একটি মস্ত গুণ আছে। অত্যন্ত মাতৃভক্ত। রোজ সকালে একবার করে আমার দিদির সঙ্গে দেখা করে যায়।'

-'আপনার দিদির ঠিকানা কী?'

-'পাঁচ নম্বর চন্দ্র বসু স্ট্রিট।'

-'কাল সকালে সেখানে গেলে বিজনবাবুর সঙ্গে দেখা হবে তো?'

-'হওয়াই তো উচিত। কিন্তু তার সঙ্গে আপনার কী দরকার?'

জয়ন্ত রহস্যময় হাসি হেসে বললে, 'তাঁর সঙ্গে দেখা হবার পরে বলব। কিন্তু সাবধান নরেনবাবু, আমি যে কাল বিজনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে যাব, একথা যেন ঘুণাক্ষরেও কারুর কাছে প্রকাশ করবেন না।'

টেলিফোনের কীর্তি

পাঁচ নম্বর চন্দ্র বসু স্ট্রিট। নরেনবাবুর দিদির বাড়ি।

তখনও ভালো করে ফরসা হয়নি কলকাতা। শেষ রাতের আঁধারের সঙ্গে উষার আলোর যুঝাযুঝি চলছে তখনও। শহরের ঘুম ভেঙেছে বটে, কিন্তু তার মুখরতা এখনও স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি।

যথাসম্ভব আত্মগোপনের জন্যে একটা জায়গা বেছে নিয়ে জয়ন্ত বললে, 'মানিক মাতৃভক্ত হত্যাকারীর জন্যে বোধকরি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। তা হোক, একটু আগে আগে আসাই ভালো।'

পাঁচ নম্বর চন্দ্র বসু স্ট্রিট। তার দরজায় এসে দাঁড়াল একখানা ট্যাক্সি। আরোহী নীচে নেমে ভাড়া দিলে। ট্যাক্সি চলে গেল।

জয়ন্ত বললে, 'ওই বিজিনবিহারী? লোকটাকে দেখতে অনেকটা নরেনবাবুর মতোই বটে-এমনকী গায়ের রং পর্যন্ত। দেখলে, বাড়িতে ঢোকবার আগে বিজন চারিদিকে কীরকম সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে গেল?'

মানিক বললে, 'আমাদের দেখতে পায়নি তো?'

-'আশা করি পায়নি।'

আরও মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করে তারা দু-জনে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল বাড়ির দিকে। দরজার কড়া নাড়তেই একজন বেয়ারা বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে, 'কাকে চাই?'

-'বিজনবাবুকে।'

-'তিনি তো এই সবে এলেন।'

-'তাঁকে গিয়ে বলো দু-জন ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান।'

বেয়ারার প্রস্থান।

বেয়ারা ফিরে এসে বললে, 'আপনারা বাইরের ঘরে বসুন। বাবু এখনি আসছেন।'

বেয়ারা বৈঠকখানার দরজা খুলে দিলে। ঘরের ভিতরে ঢুকল জয়ন্ত ও মানিক। পরমুহূর্তেই দরজা বন্ধ হওয়ার ও বাহির থেকে শিকল তোলার শব্দ।

জয়ন্ত চেঁচিয়ে বললে, 'এই! দরজা খুলে দাও! কারুর সাড়া নেই।'

মানিক বললে, 'যা ভেবেছি! বিজন হয় সন্দেহ করেছে, নয় রাস্তায় আমাদের দেখে চিনে ফেলেছে। আমরা বন্দি।'

জয়ন্ত বললে, 'ভারি বোকা বানালে তো! দেখছি ঘর থেকে বেরোবার আর কোনো পথ নেই।' সে দরজা নিয়ে ধস্তাধস্তি করতে লাগল। লাথি ও ধাক্কা মারতে লাগল দরজার উপরে।

মানিক বললে, 'বৃথা চেষ্টা করছ কেন? তোমার গায়ে যত জোরই থাক, ঘরের ভিতর থেকে এই মজবুত দরজা কিছুতেই ভাঙতে পারবে না, অন্য উপায় দেখো।'

-'কী উপায় আছে আর? ঘরটা যদি রাস্তার ধারেও হত চেঁচিয়ে পথের লোক ডাকতে পারতুম।'

ঘরের বাইরে জাগ্রত হল হা-হা-হা-হা করে অট্টহাস্য। তারপরেই সেই পরিচিত অর্ধকোমল ও অর্ধকর্কশ কণ্ঠস্বরে শোনা গেল, 'কী হে, শার্লক হোমস আর ওয়াটসনের বাংলা সংস্করণ! গোয়েন্দাগিরি ভারি সোজা না?'

জয়ন্ত বললে, 'দরজা খুলে দাও বিজন। আমাদের বন্দি করে তুমি কিছুই সুবিধে করতে পারবে না। পুলিশ তোমার নাম জানতে পেরেছে।'

-'পুলিশকে আমি থোড়াই কেয়ার করি। তোদের কী হাল হয় দেখো-সেদিন বড়ো ফাঁকি দিয়েছিলি। এইসঙ্গে সেই ভুঁদো সুন্দর গোয়েন্দাটাকে পেলেই সোনায় সোহাগা হত। যত সব নেড়াবুনে, সব হল কীতুÍনে। সবাই মহা ডিটেকটিভ!'

মানিক চুপিচুপি বলল, 'জয়ন্ত মুক্তির উপায় আবিষ্কার করেছি।'

জয়ন্ত সবিস্ময়ে বললে, 'কীরকম?'

-'ওই দেখো। টেবিলের উপরে টেলিফোন। এবারে সত্য সত্যই সুন্দরবাবু এসে আমাদের উদ্ধার করতে পারবেন।'

জয়ন্ত এক লাফে টেবিলের সামনে গিয়ে পড়ল। টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিয়ে সুন্দরবাবুর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করলে। বললে, 'সুন্দরবাবু, আমরা আবার বিজনের হাতে বন্দি হয়েছি। সদলবলে শীঘ্র পাঁচ নম্বর চন্দ্র বসু স্ট্রিটে এসে আমাদের উদ্ধার আর বিজনকে গ্রেপ্তার করুন।'

বিজন বোধ হয় কান পেতে ছিল। হতাশ কণ্ঠে বলে উঠল, 'হায়রে, আবার আমার ভুল হয়ে গেল। ঘরে যে টেলিফোন আছে, সেটা আমার মনে ছিল না।'

এবারে ঘরের ভিতর থেকে একসঙ্গে অট্টহাস্য করে উঠল জয়ন্ত এবং মানিক। ঘরের বাইরে আর কেউ হাসবার চেষ্টা করলে না।

মিনিট দশের মধ্যে ঘটনাস্থলে সদলবলে সুন্দরবাবুর আবির্ভাব। জয়ন্ত ও মানিকের উদ্ধার লাভ। কিন্তু সারা বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজেও বিজনের কোনো পাত্তা পাওয়া গেল না।

সুন্দরবাবু আফশোস করে বললেন, 'কী ঘ্যাচড়া মাছ রে বাবা! যতবার জাল ফেলি, জাল ছিঁড়ে পালিয়ে যায়।'

জয়ন্ত বললে, 'সুন্দরবাবু, আমার হাতের সব তাস এখনও ফুরোয়নি।'

-'ফুরোয়নি নাকি?'

-'না। বরাহনগরের বাড়িতে বিজনের দলের যে লোকটা ধরা পড়েছিল, সে এখন কোথায়?'

-'হাজতে।'

-'তাকে আজকেই ছেড়ে দিন।'

-'কী বলছ?'

-'ঠিকই বলছি। চুনোপুঁটিকে ছেড়ে দিলে যদি রুই-কাতলা ধরা পড়ে, আপত্তি কী?'

-'তোমার কথার মানে বোঝা যাচ্ছে না।'

-'মানে খুব সহজ। হাজতে সে একলা আছে?'

-'হ্যাঁ।'

-'আরও ভালো। প্রহরী যদি হাজত ঘরের দরজা বন্ধ করতে ভুলে গিয়ে সরে দাঁড়ায় তাহলে নিশ্চয়ই সে চম্পট দেবে।'

-'দেবেই তো।'

-'সেও সন্দেহ করতে পারবে না যে, তাকে আমরা ইচ্ছা করেই ছেড়ে দিচ্ছি।'

-'তারপর?'

-'তারপর তার পিছনে চর মোতায়েন রাখুন। সে কোথায় যায় দেখুন।'

-'তুমি কি ভাবছ, সে সোজা বিজনের কাছে গিয়েই হাজির হবে!'

-'নিশ্চয়ই বিজনের কোনো গুপ্ত আস্তানা আছে। তার পক্ষে কলকাতা যখন বেশি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, তখন সেইখানেই গিয়ে সে গা-ঢাকা দেয়। বিজন এখন বেশ কিছুদিন বাইরে মুখ দেখাতে সাহস করবে বলে মনে হচ্ছে না। দলের লোকজন নিয়ে কোথাও গিয়ে লুকিয়ে থাকবে। আমাদের বন্দি নিশ্চয়ই তার গুপ্ত আস্তানার খবর রাখে। তার পক্ষে সেইখানে যাওয়াই স্বাভাবিক।'

-'হ্যাঁ জয়ন্ত, তোমার অনুমান সংগত।'

-'তাহলে এই উপায় অবলম্বন করুন।'

-'তথাস্তু।'

অপচয়ে ঠ্যাং

পরদিন প্রভাতেই জয়ন্তের ঘরের টেলিফোন যন্ত্র বেজে উঠল টুং টুং টুং।

রিসিভার ধরেই জয়ন্ত শুনলে সুন্দরবাবুর প্রফুল্ল কণ্ঠের সম্বোধন- 'ভো ভো জয়ন্ত!'

-'গলা শুনেই বুঝেছি খবর শুভ।'

-'অত্যন্ত এবং আশাতীত। পরে পরে এই ব্যাপারগুলো ঘটেছে। বিজনের অনুচরের হাজত থেকে পলায়ন। আমাদের চরের তার পিছনে অনুসরণ। হাওড়ায় গিয়ে বিজনের অনুচরের ট্রেনে আরোহণ। পরে তার হরিপুরে অবতরণ। তারপর গ্রাম ছাড়িয়ে মাঠের মধ্যে একখানা বাড়িতে তার গমন।'

-'আপনার চর নিশ্চয়ই বিজনের দর্শন পায়নি?'

-'বিজনকে সে চেনে না। তবে শুনলুম, সে বাড়িতে লোক আছে আট-দশ জন।'

-'হরিহরপুর এখান থেকে কতদূর?'

-'পঁয়ত্রিশ মাইল।'

-'অঃতপর?'

-'তিনখানা সেপাই-ভরতি বড়ো জিপগাড়ি নিয়ে এক ঘণ্টার মধ্যে তোমার ওখানে যাচ্ছি। গাড়িতে তোমার আর মানিকের জন্যেও একটু জায়গা থাকবে। এর মধ্যে প্রস্তুত হতে পারবে তো?'

-'আমি কোনো সময়েই অপ্রস্তুত নই।'

-'সোনার ছেলে, লক্ষ্মী ছেলে।'

হরিহরপুর ছোটো গ্রাম। কিন্তু তার প্রান্তে আছে প্রকাণ্ড এক প্রান্তর এবং প্রান্তরের প্রান্ত গিয়ে মিশেছে দিক চক্রবাল রেখায়।

প্রান্তরের মাঝখানে চারিদিকে কলাইশুঁটি খেত নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একখানা প্রাচীরে ঘেরা নিঃসঙ্গ বাড়ি। তার পিছন দিকে গুটি আষ্টেক নারিকেল গাছ করেছে নিরালা একটি কুঞ্জ রচনা, তা ছাড়া আর কোনো গাছপালা নেই তার আশেপাশে।

তীক্ষ্ণ চক্ষে সমস্ত পর্যবেক্ষণ করে জয়ন্ত বলল, 'সুন্দরবাবু, বিজন আস্তানা নির্বাচন করেছে চমৎকার। পুলিশ যেকোনো দিক দিয়েই অগ্রসর হোক, লুকিয়ে তাকে আক্রমণ করতে পারবে না। সে এখন মরিয়া হয়ে উঠেছে নিশ্চয়ই, দিনের আলোয় আমরা যদি ওদিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করি, তাহলে শেষ পর্যন্ত ওরা ধরা পড়লেও আমাদের লোকক্ষয় অনিবার্য, কারণ, ওরা বাধা দেবেই। আর ওদের সঙ্গেও আগ্নেয়াস্ত্র আছে, ওদের বাড়িটাও প্রায় কেল্লার মতো। রাত্রির অন্ধকারের জন্যে আমাদের অপেক্ষা করাই উচিত।'

সন্ধ্যার ছায়ায় পৃথিবী হয়ে উঠল অস্পষ্ট। তারপর এল রাত্রি। চারিদিকে চাঁদের আলোর নীরব খেলা। ইতিমধ্যে একবার গলা সাধা হয়ে গেল শৃগাল সভ্যদের।

উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম-চারিদিক থেকে অগ্রসর হল সশস্ত্র পুলিশবাহিনী, নিঃশব্দে-প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে। বাড়ির প্রাচীরের কাছে এসেও পাওয়া গেল না কারুর সাড়াশব্দ। বাড়ির ফটকের কাছে গিয়ে দেখা গেল, বাহির থেকে তালাবন্ধ।

কয়েকজন লোক প্রাচীর লঙ্ঘন করে বাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢুকল। অল্পক্ষণ পরে তারা ফিরে এসে বললে, 'বাড়ির ভিতরে কেউ নেই।'

মানিক বললে, 'যা সন্দেহ করেছিলাম, তাই। আমাদের মতো ওরাও নিয়েছে রাত্রির সুযোগ। সবাই লম্বা দিয়েছে। আমাদের হল লাভে ব্যাং, অপচয়ে ঠ্যাং।'

জয়ন্ত হাতঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করে বললে, 'এত সহজে হতাশ হোয়ো না মানিক। ওরা টের পেয়েছে আমাদের অস্তিত্ব। কিন্তু পালিয়ে ওরা যাবে কোথায়? বড়োজোর স্টেশনের দিকে। তিন ঘণ্টার মধ্যে স্টেশনে একখানা মাত্র স্লো প্যাসেঞ্জার আসবে সন্ধ্যার পর, সাড়ে আটটার সময়ে। এখন ঘড়িতে আটটা বেজে পঁচিশ মিনিট হয়েছে। স্টেশনে মোটরে চড়ে পৌঁছোতে আমাদের সাত-আট মিনিটের বেশি দেরি লাগবে না। এসব লোকাল ট্রেন প্রায়ই দেরি করে স্টেশনে আসে। হয়তো এখনও আমরা গিয়ে ট্রেন ধরতে পারব।'

বায়ুবেগে ছুটল তিনখানা জিপ গাড়ি। কিন্তু তারা স্টেশনে গিয়ে পৌঁছেই দেখলে, একখানা ট্রেন ধূম উদ্গার করে দৌড় মারলে সশব্দে। তাদের দুর্ভাগ্যক্রমে ট্রেন এসেছিল আজ প্রায় যথাসময়েই।

জয়ন্ত বললে, 'সুন্দরবাবু, দৌড়ে স্টেশনে যান। পরের স্টেশনে খবর দিন, ট্রেন ওখানে গেলেই যেন আটকে রাখা হয়। ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গেই ছুটবে আমাদের গাড়ি তিনখানা। খুব সম্ভব পরের স্টেশনে আগে গিয়ে পৌঁছোব আমরাই।'

সুন্দরবাবু স্টেশনে ছুটলেন। এবং কাজ সেরে ফিরে এসে আবার গাড়িতে উঠলেন। আকাশের গায়ে চলন্ত ট্রেনের ধোঁয়ার রেখা লক্ষ করে পুলিশের গাড়িগুলো হল ঝড়ের বেগে ধাবমান। তারপর চলল ট্রেনের সঙ্গে মোটরের দৌড় পাল্লা। খানিক পরে মোটরই এগিয়ে গেল ট্রেনকে পিছনে ফেলে।

ধু-ধু মাঠের মধ্যে আচম্বিতে ট্রেনের গতি হয়ে গেল স্তব্ধ।

মানিক বললে, 'ব্যাপার কী?'

জয়ন্ত বললে, 'বিজনের নতুন কীর্তি। অ্যালার্মের শিকল টেনে গাড়ি থামিয়ে ওরা এইখান থেকেই লম্বা দিতে চায়! ওরা বুঝে নিয়েছে পরের স্টেশন ওদের পক্ষে নিরাপদ হবে না। সুন্দরবাবু সবাইকে নিয়ে টপ করে নেমে পড়ুন। ওই দেখুন, অপরাধীরাও ট্রেন থেকে নেমে পড়ে মাঠের উপর দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। ওই সেই রোগা ঢ্যাঙা লোকটা, আর ওই লোকটা বোধ হয় বিজন। ওরা দূরের ওই জঙ্গলটা লক্ষ করে ছুটছে। কিন্তু জঙ্গলে পৌঁছোবার আগেই ওদের গ্রেপ্তার করতে হবে, নইলে আবার ওরা পূর্বেকার মতো আমাদের কলা দেখাতে পারে।'

এবারে গাড়ির সঙ্গে গাড়ির নয়, মানুষের সঙ্গে মানুষের দৌড় প্রতিযোগিতা। হঠাৎ রোগা ঢ্যাঙা লোকটা এবং বিজন দৌড় থামিয়ে ফিরে দাঁড়াল-তাদের দু-জনেরই হাতে বন্দুক।

জয়ন্ত বললে, 'হুঁশিয়ার!'

তারা বন্দুক ছুড়ছে। মানিক অস্ফুট আর্তনাদ করে মাঠের উপরে পড়ে গেল। তার ডান পায়ে লেগেছে বন্দুকের গুলি।

সুন্দরবাবু সক্রোধে বললেন, 'কী! আবার গুলি ছোড়া হচ্ছে। তবে দেখ মজাটা। এই সেপাই, চালাও গুলি-চালাও গুলি।'

পুলিশের এক ডজন বন্দুক সগর্জনে অগ্নি ও ধূম উদ্গারণ করতে লাগল বারংবার। মাঠের মধ্যে এই অকল্পিত খণ্ডযুদ্ধ দেখে চারিদিক থেকে ছুটে আসতে লাগল কাতারে কাতারে লোকজন।

জয়ন্ত বললে, 'বিজন, আত্মসমর্পণ করো।'

একটা মড়া গাছের কাটা গুঁড়ির আড়ালে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে বসে পড়ে বন্দুকে কার্তুজ ভরতে লাগল বিজন। সে কোনো জবাব দিলে না।

জয়ন্ত বলল, 'বিজন, শুনছ?'

বিজন বললে, 'হ্যাঁ শুনেছি। তোমাদের কথার উত্তর হচ্ছে এই-' সে বন্দুক তুলে জয়ন্তের দিকে লক্ষ্য স্থির করতে লাগল।

পাশেই ছিল একটা মস্ত উই ঢিপি। জয়ন্ত একলাফে তার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল।

হা-হা করে হেসে উঠে বিজন বললে, 'কী হে বীরপুঙ্গব, ভয় পেয়ে লুকোলে কেন?'

জয়ন্ত শান্ত স্বরেই বললে, 'বিজনবিহারী তুমিও তো লুকোতে কসুর করনি। আর কেন জাদু, লীলাখেলা বন্ধ করো। এগিয়ে এসো, দুই হাতে লোহার বালা পরো। আমরা তোমাকে গুলি করে মারতে চাই না, ফাঁসিকাঠে দোল খাওয়াতে চাই।'

বিজন বন্দুকের নল ফেরালে সুন্দরবাবুর দিকে।

সুন্দরবাবু বিনা বাক্যব্যয়ে করলেন প্রকাণ্ড একটি লম্ফত্যাগ। তিনি একেবারে সেপাইদের দলের ভিতর গিয়ে পড়লেন। তারপর দারুণ ক্রোধে চিৎকার করে বললেন, 'কী, আবার আমাকে বধ করবার চেষ্টা? মেরে ফেলো, মেরে ফেলো ছোটোলোকটাকে, এখুনি গুলি করে মেরে ফেলো।'

জয়ন্ত বললে, 'বিজন, বন্দুক ছাড়ো।'

-'প্রাণ থাকতে নয়।'

-'তাহলে প্রাণ তোমার যাবেই। দলে আমরা ভারী।'

-'হোক। যতক্ষণ বাঁচব, যুদ্ধ করব।'

-'তবে মরো।'

সেপাইরা গুলি বৃষ্টি বন্ধ করেছিল। তারা আবার বন্দুক ছুড়তে লাগল এবং গর্জন করতে লাগল বিজনেরও বন্দুক।

কিন্তু যুদ্ধ বেশিক্ষণ চলল না। অধিকাংশ অপরাধীই একে একে ভূতলশায়ী হল-কেউ নিহত, কেউ আহত।

সগর্বে মাথা তুলে এবং বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেবল বিজনবিহারী। গুলিহীন বন্দুকটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে হাতে নিলে সে রিভলবার। মুখে তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ভাব।

জয়ন্ত বললে, 'আবার বলছি, এখনও আত্মসমর্পণ করো বিজন।'

দুই চক্ষে অগ্নিবৃষ্টি করে কর্কশ কোমল কণ্ঠে বিজন বললে, 'পুঁচকে গোয়েন্দা, আমি আত্মসমর্পণ করব না, আমি করব জীবন সমর্পণ।' চোখের পলক না পড়তেই রিভলবারের নলটা নিজের কপালের পাশে রেখে সে ঘোড়া টিপে দিলে। আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জন-সঙ্গেসঙ্গে বিজনবিহারীর পতন।

জয়ন্ত বললে, 'ওকে বাধা দিতে পারলুম না। তুচ্ছ সম্পত্তির লোভে যে মাতুল হত্যা করে, তার মরা উচিত ছিল ফাঁসিকাঠেই দোল খেয়ে। যাক মানিক, তোমার কি বেশি লেগেছে ভাই?'

-'না জয়ন্ত। কিন্তু যা বলেছিলাম। আমার হল অপচয়ে ঠ্যাং।'

সুন্দরবাবু সহানুভূতি প্রকাশ করবার জন্যে দুঃখিতভাবে বললেন, 'হুম।'